বর্ণাশ্রম।

প্রথম খণ্ড।

১০৮ পঞ্চানন তলা রোড
হাওড়া
তারিখ ২১শে বৈশাখ ১৩২২ সাল

চতুর্থ খণ্ড—সংন্যাস।

প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখদুঃখে ন বিন্দতি।
তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ।

উদ্বাহতত্ত্বম্ ॥

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥

গীতা ১৮শ অধ্যায় ২ শ্লোক।

নিবেদন।

—✿—

হিন্দুর পবিত্র বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ভাব লইয়া এই "বর্ণাশ্রম" উপন্যাস লিখিত হইয়াছে। সরল ও সহজ ভাষায় চারিটী আশ্রমের মধ্য দিয়া মানুষ কিরূপে সহজে মোক্ষের পথে অগ্রসর হইতে পারে, ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিতে পারিলেই মনুষ্য-জন্ম যে সার্থক হয়, এই পুস্তকে যথাসাধ্য তাহা বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এদেশে ধর্ম্মের কথা যত প্রচার হয়—ততই মঙ্গল, ধর্ম্ম ভিন্ন হিন্দুর আর অন্য উপায় নাই। একদিন এই ধর্ম্মেই হিন্দুর উত্থান হইয়াছিল—আবার এই ধর্ম্মেই তাঁহাদের পতন হইতে আরম্ভ হইয়াছে—ধর্ম্মহীনতাই এই পতনের একমাত্র কারণ। হিন্দুর এমন পবিত্র আশ্রমধর্ম্মের প্রথা এখন আর কোন হিন্দু-সংসারে গৃহীত হয় না- ধর্ম্মের কথা শুনিলেই হিন্দু এখন হাসিয়া উঠেন, ধর্ম্ম-কর্ম্মে আর এখন তাঁহারা তত আস্থাবান নহেন। এই জন্য হিন্দুর এই আশ্রম-ধর্ম্মের মধ্য দিয়া যে হিন্দু জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব তাহাদের সেই সার উদ্দেশ্য মোক্ষ-পথের অধিকারী হইতে পারা যায় এবং আশ্রম-ধর্ম্মের সাহায্যে ভগবৎকরুণা যে সহজে লাভ হয়, ইহাই এই পুস্তকে সরল ও সহজ ভাষায় বিবৃত করা হইয়াছে। ভক্তিই ভগ-বানের কৃপা-লাভের সহজ-সাধ্য উপায়, এই ভক্তিভাবই জীবের মুক্তভাব। ইহা আশ্রম চতুষ্টয়ের সাহায্যে সহজে আয়ত্ত করিতে পারা যায়। আশ্রম চতুষ্টয়ে অবস্থান করিয়া ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ

করিতে হইলে মানবকে ব্রত-পরায়ণ হইতে হয়। কোন নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে, চপলচিত্ত মানব সহজে বিপথ-গামী হইতে পারে না। অশ্বের বল্গা শ্লথ হইলেই, সে যেমন দুর্দ্দমনীয় বেগে ইতস্ততঃ দৌড়িয়া কুপথগামী হইয়া থাকে। মনরূপ অশ্বও সেইরূপ নিয়মের বা শাসনের বাহিরে আসিয়া স্বাধীন হইতে পারিলেই, কুপথে যাইয়া মানবের ইহ পরকাল নষ্ট করিয়া দেয়। মনকে লইয়াই মানবের সকল ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমাহিত হয়। মনের সহিত মাকে না ডাকিলে, তিনি কখনই সাড়া দিবেন না। সমল মুকুরে যেমন প্রতিবিম্ব পতিত হয় না। হৃদয়-মুকুর পবিত্র ও নির্ম্মল না হইলেও সেইরূপ মাতৃমূর্ত্তি তাহাতে প্রতিফলিত হইতে পারে না। দুর্দ্দমনীয় মনকে শাসনে রাখিতে হইলে, তাহার দ্বারা ভগবানকে পাইতে ইচ্ছা করিলে সরল বিশ্বাস ও অকপট ভক্তিতে হৃদয় পরিপূর্ণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। হিন্দুর পবিত্র আশ্রম চতুষ্টয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলে এ সকল সহজেই লাভ করিতে পারা যায়। ধর্ম্মই মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এই আশ্রম চতুষ্টয়ই ধর্ম্ম-শিক্ষার প্রধান ও প্রকৃষ্ট পন্থা। "বর্ণাশ্রমে" সেই চারিটী আশ্রমের নিয়ম প্রণালী এবং সহজ-সাধ্য উপায় সকল বিবৃত করিতে ত্রুটি করি নাই। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা পাঠকগণের বিচারাধীন। তবে ধর্ম্মের কথা সকল সময়েই নাকি মধুময়, সকল সময়েই নাকি ইহা সমান ফলপ্রদ—তাই জ্ঞানানুসারে তাহার বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ভাষার ঝঙ্কার ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই; নামের জন্য এ গ্রন্থ প্রকাশ করি নাই। হিন্দুজাতি,

হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মের অবস্থা দেখিয়া প্রাণ ফাটিয়া যায়। যাহাদের ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম নাই, ধর্ম্মই যাহাদের মূলভিত্তি, ধর্ম্মই যে জাতির প্রাণ স্বরূপ, তাহারা যদি ধর্ম্মে এরূপ মতিহীন হয়, তাহা হইলে জাতি রক্ষা হইবে কিসে! সমাজের নেতা ব্রাহ্মণ-গণ এক সময় এই আশ্রমধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া কত অসাধ্য-সাধন করিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। আজ মুসলমান রাজত্বের একটী সামান্য ঘটনা লইয়া, এই পুস্তকে তাহাই উপন্যাসাকারে বর্ণনা করিয়াছি। ইহার মূল উদ্দেশ্য ধর্ম্মপ্রচার ভিন্ন কিছুই নহে। আমাদের আর্য্যশাস্ত্রে এ সকলের অভাব নাই। তবে সংস্কৃতজ্ঞ শাস্ত্রপাঠী দেশে কয়জন আছেন এবং সেই সকল আশ্রমের মর্ম্মই বা কয়জন বুঝেন। এইজন্য উপন্যাসাকারে সাধারণের বোধগম্য করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত হইল। ইহার দ্বারা কাহারও মনে সামান্য ভাবে ধর্ম্মভাব জাগরিত হইলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

একদিন সাহিত্যসম্রাট, পূজনীয় স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন—"দেখ গ্রন্থকার দেশের ও সমাজের উপদেশক—তাঁহারা যদি যা তা একটা বিষয় লিখিয়া প্রকাশ করেন, তাহাতে যদি কোন প্রকার উপদেশ না থাকে, তাহা হইলে তিনি সমাজদ্রোহী, তাঁহার দ্বারা সমাজের ঘোর অনিষ্টপাত হইতে পারে। অতএব হিন্দু-গ্রন্থকার মাত্রকেই তাঁহার সমাজ ও ধর্ম্মের উপদেশমূলক গ্রন্থরচনা করা উচিত। পুস্তক শিক্ষার যন্ত্রস্বরূপ, ইহা সাধারণে প্রকাশ হইলে আবাল-বৃদ্ধবনিতা তাহা পাঠ করিবে—যদি তাহা কুরুচিপূর্ণ হয়, তাহা হইলে তরলমতি পাঠক পাঠিকা তাহাই শিক্ষা করিয়া অধঃ-

পাতে যাইবে। আমাদের দেশে এখন পাশ্চাত্যধরণে ডিটেক্-টিভ উপন্যাসের বড়ই প্রচলন হইয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশে তাহার এতাদৃশ প্রচলন হওয়া উচিত নহে। প্রাচ্য-স্বভাব প্রতীচ্য-স্বভাবের সহিত সমান নহে। তাহাদের নিকট যে ভাব বড়ই আদরণীয়—আমাদের নিকট তাহার আদর নাই। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসে একটী ষোড়শী যুবতী কাহার প্রাণনাশ উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর হইয়া ছুরিকা হস্তে দড়ির সিঁড়ি অবলম্বন করিয়া দ্বিতলের ছাদে উঠিল। পাশ্চাত্যদেশে এইরূপ চরিত্র চিত্রণের আদর হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুর নিকট কি ইহা বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয় না? এইজন্য তিনি বলিয়াছিলেন—"যাহাই লেখ না কেন ধর্ম্মকথা, ধর্ম্মভাব লোকের মনে উদ্দী-পিত করিতে চেষ্টা করিবে।" এই পুস্তক তাঁহারই উপদেশের ফল।

এক্ষণে ব্রাহ্মণের দ্বারাই দেশের ও সমাজের অবনতি হই-তেছে। তাঁহারা ধর্ম্মে মতিহীন হওয়াতেই সকল দিক নষ্ট হইতেছে। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ যেরূপ অধঃপতিত হইয়াছেন—এরূপ আর কোন জাতিই হয় নাই। মূল অপরিপক্ক হইলে বৃক্ষের স্থায়িত্ব কোথায়! সমাজগুরু ব্রাহ্মণই সমাজ-বৃক্ষের মূলস্বরূপ—তাঁহারা স্বধর্ম্মত্যাগী, অনাচারী হইলে অন্যজাতি আর কাহার অনুসরণ করিবে! এই জন্যই দেশের এত দুর্গতি! ব্রাহ্মণ যদি পুনরায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুগামী হইয়া সাত্ত্বিক ও সংযতভাবে দেশের ও দশের কল্যাণ-সাধন করেন তবেই মঙ্গল, নতুবা আর আমাদের উন্নতির অন্য উপায় নাই।

এই পুস্তকে সেই সকল বিষয়ের যথাসাধ্য আভাস দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু, হিন্দুর চক্ষে—হিন্দুর হৃদয় ও মন লইয়া, ইহা পাঠ করিলে সামান্য পরিমাণেও ধর্ম্মভাব উপলব্ধি করিয়া সুখী হইতে পারিবেন—এরূপ আশা করিতে পারা যায়। কারণ আজ কাল দেশের মতিগতি ফিরিয়াছে বলিয়াই, আমাদের এ আশা অসঙ্গত নহে। নিবেদনমিতি—

---

১০৮ পঞ্চানন তলা রোড
হাওড়া
তারিখ ২১শে বৈশাখ ১৩২২ সাল

বিনীতঃ—
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

প্রথম খণ্ড।

বর্ণাশ্রম

প্রথম পরিচ্ছেদ

সম্পদে বিপদ।

নবাব সিরাজুদ্দৌলা যখন বঙ্গদেশে আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া বিপুল বিক্রমে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারই অধীনে নীলরতন মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কতকগুলি জমিদারী পত্তনী লইয়া নিজ প্রতিভাবলে অতুল ধনের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে তিনি বিশেষ পারদর্শী বলিয়া নবাবের বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কোন স্থানে সুবিচারের আবশ্যক হইলে নবাব নীলরতনকে পাঠাইতেন, এই কার্য্যের সহায়তার জন্য তাঁহার অধীনে কতকগুলি সৈন্যও থাকিত। নবাব সরকারের এই কার্য্য স্বীকার করিয়া অবধি তিনি কখনও স্বদেশে থাকিতে পাইতেন না। কোন স্থানে বিচার কার্য্যের কোনরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলেই সরকার হইতে তাঁহাকে তথায় বদলি হইবার অনুমতি হইত। তাহার জন্য তিনি সরকার হইতে পারিশ্রমিকও পাইতেন।

দাসত্ব এমন জিনীষ নহে, ইহাতে মানবের কিছুমাত্র

স্বাধীনতা নাই। তুমি যত বড় দাসত্বজীবী হও না কেন, প্রভু যখন যাহা করিতে অনুমতি করিবেন, তোমাকে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতেই হইবে। বিশেষতঃ সিরাজুদ্দৌলার ন্যায় ভীষণ প্রকৃতি নবাবের হুকুম অমান্য করিলে তাহার আর নিস্তার আছে কি?

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি—সে সময় হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি লোকে এখনকার মত বীতশ্রদ্ধ হয় নাই। তখন সকলেই ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মে মতিমান থাকিয়া সুখে কাল কাটাইত। যে, যে ধর্ম্মাবলম্বী, যদি সে তাহা ব্যতিক্রম করিত, তাহা হইলে নবাবের নিকট তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলে সে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইত। নবাব এ কথা বেশ বুঝিতেন যে, ধর্ম্মহীন মানব পশু অপেক্ষাও অধম—তাহার দ্বারা রাজত্বের সকল প্রকার অমঙ্গল কার্য্যই সাধিত হইতে পারে। এইজন্য তিনি হিন্দুদিগকেও স্বধর্ম্ম-পালন-নিরত দেখিতে ভালবাসিতেন। যাহাকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাইতেন, তাহাকেও সেই ধর্ম্মে বিশেষ অনুরক্ত না দেখিলে নবাবের রোষ-বহ্নি তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিত। নবাবের রোষে পড়িলে আর তাহার কোনও প্রকারে নিস্তার থাকিত না; নবাব সিরাজুদ্দৌলা এমনি ভীষণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। লঘু পাপে তিনি গুরু দণ্ড করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, তবে তাঁহার হুকুম যথা সময়ে প্রতিপালিত হইলে তিনি প্রজাবর্গের প্রতি কখনই বিরূপ হইতেন না। নীলরতন মুখোপাধ্যায় একান্ত স্বধর্ম্ম-নিরত ব্রাহ্মণ ছিলেন, নবাব অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে নিজের অধীনে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া-

ছিলেন। তখন লোকের এত অভাব ছিল না, এই জন্য ধর্ম্ম-বিগর্হিত দাসত্ব কার্য্যে কেহ সহজে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করিত না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ দাসত্বে লিপ্ত হইলে ধর্ম্মকর্ম্মের লোপ হইবার ভয়ে এ কার্য্য হইতে সম্যক্‌রূপে পৃথক থাকিতেন। তবে যে নীলরতন মুখোপাধ্যায় এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন—তাহার অনেক কারণ ছিল। তাহার প্রধান কারণ, নবাব তাঁহার দ্বারা অনেক বিষয়ে উপকৃত ছিলেন, শাসন-কার্য্যে অনেক সময় নীল-রতন নানা প্রকারে তাঁহার সহায়তা করিতেন। এই জন্য নবাবের অধীনে কার্য্য করিলেও তাঁহাকে স্বাধীনতা দেওয়া হইত, কাজেই ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁহার কোন ব্যাঘাত হইত না।

নীলরতনের দেহে অসীম বল ও হৃদয়ে অত্যন্ত সাহস ছিল। অনেক সময় নবাব তাঁহাকে শরীররক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া শীকারকার্য্যে বাহির হইতেন। যখন যে কোন কার্য্যে লিপ্ত থাকুন না কেন,—ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতে তিনি কখনই ভুলিতেন না। প্রত্যহ ইষ্ট আরাধনা, জপ তপ প্রভৃতিতে দিবসের একচতুর্থাংশ সময় ক্ষেপণ করিতেন। ইহার জন্য নবাব তাঁহাকে কোন কথা বলিতেন না। নীলরতন কখন কোন্ স্থানে বদলী হইতেন—তাহার স্থিরতা ছিল না। যখন যেখানেই বদলী হউন না কেন, তাঁহার অধীনে শতাধিক সৈন্য থাকিত। সময়ে সময়ে নানা প্রকার বিচার-কার্য্যও তাঁহাকে সুসম্পন্ন করিতে হইত। এক কথায় তিনি নবাবের প্রতিনিধিস্বরূপ কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কিছুদিন হইল তিনি নদীয়া জেলায় বদলী হইয়াছেন। এই অঞ্চলের যাবতীয় ভার এখন তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত। এখন প্রায়

দেখিতে পাওয়া যায় লোকে রাজ সরকারে সামান্য ক্ষমতাপন্ন হইলেই অপরের সর্ব্বনাশ করিয়া অর্থ-শোষণ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু নীলরতন বাবুর সে স্বভাব ছিল না। তিনি ক্ষমতানুসারে লোকের উপকার ব্যতীত অপকার করিতেন না। এই গুণেই আপামর সাধারণ তাঁহার বাধ্য হইয়াছিল—এই জন্যই তাঁহার যশঃগৌরব এত শীঘ্র চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি দরিদ্রের সন্তান হইলেও এখন ধনে-মানে-কুলে-শীলে বিশেষরূপ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। অতুল ধনের অধীশ্বর হইলেও তিনি দরিদ্রের প্রতি বড়ই দয়াবান ছিলেন। নিজ বাসস্থান রুদ্রপুর গ্রামে তিনি প্রতি বৎসর হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম উপলক্ষে অনেক অর্থব্যয় করিয়া দরিদ্র সেবা করিতেন। এই জন্য গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা, ইতর ভদ্র সকলেই তাঁহার অশেষ সুখ্যাতি করিত।

নদীয়া জেলার শাসনকর্ত্তারূপে যখন নীলরতন মুখোপাধ্যায় অধিষ্ঠিত, তখন এই জেলা বিদ্বন্মণ্ডলীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত ছিল। শাস্ত্র ও ধর্ম্ম চর্চ্চার ইহাই এক মাত্র স্থান ছিল। নীলরতন বাল্যকালে সামান্য মাত্র সংস্কৃত ও উর্দ্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। উর্দ্দু শিক্ষার প্রভাবে তিনি নবাব সরকারে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে নদীয়া জেলায় আসিয়া তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইল। শাস্ত্র-চর্চ্চা ও ধর্ম্মকর্ম্মে তিনি অধিকাংশ সময় কাটাইতে লাগিলেন।

নীলরতন ত্রিশ বৎসর বয়সে এখানে আসিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর অতীত হইল, এখনও তিনি নদীয়ায় একপ্রকার সংসার

পাতিয়াছেন, কেবল সময়ে সময়ে রুদ্রপুরে যাইতেন মাত্র। নীলরতনের উপর্য্যুপরি অনেকগুলি পুত্র সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু ভগবান একটীকেও জীবিত রাখেন নাই। নিরুপমা নাম্নী এক মাত্র কন্যা, বয়স পাঁচ বৎসর—এক্ষণে তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা, পুত্রের পরিবর্ত্তে কন্যা হইয়াছে বলিয়া সকলেই আশা করিয়াছে, কন্যাটী জীবিত থাকিবে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসারের মধ্যে স্ত্রী ও কন্যা, আর একটী দ্বাদশবর্ষীয় বালককে তাঁহার গৃহে সদা সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যাইত, এই বালকটী নীলরতনের ঠিক দত্তক পুত্র না হইলেও তিনি তাহাকে নিজ পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন, কন্যার সহিত তাহার প্রতিপালনেও কোন পার্থক্য প্রদর্শন করিতেন না, এইজন্য অনেকেই বালককে তাঁহারই পুত্র বলিয়া অনুমান করিত। ভগবান তাঁহাকে রাজা করিয়াছেন, তাই শিশুকাল হইতে আজ অবধি বালক নলিনাক্ষের যত্নের কোন ত্রুটি হয় নাই। সকলেই জানিত—এটি নীলরতনেরই পুত্র; বাস্তবিক নলিনাক্ষ তাঁহার শাস্ত্র-পাঠী কোনও বন্ধুর পুত্র, অতি শৈশবে পিতৃ মাতৃহীন হওয়ায় নীলরতনের নিকট পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইতেছিল। নীলরতন নবম বর্ষের পর উপনয়ন কার্য্য সমাধা করিয়া নলিনাক্ষকে গুরুগৃহে শাস্ত্র শিক্ষা করাইতে ছিলেন—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন না করিলে ব্রাহ্মণকে পতিত হইতে হয়, তাহার ব্রহ্মণ্য বজায় থাকে না—তাহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, আর তখন এরূপ শিক্ষারই প্রচলন ছিল—তখন এদেশের লোক ত এত ধর্ম্মহীন হয় নাই। ধর্ম্মপ্রাণ নীলরতন তাই আশ্রম-ধর্ম্মের নিয়মানুসারে পালক-পুত্র নলিনাক্ষকে গুরুগৃহে লেখাপড়া শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া

দিয়াছিলেন। পত্নী প্রভাবতী পুত্রকে নয়নের অন্তরাল করিতে ইচ্ছা করিতেন না, তবে—গুরুগৃহে যখন তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা হইল, তখন ভয়ের কোন কারণ নাই। দেখিবার ইচ্ছা হইলেই ভৃত্য রূপচাঁদের দ্বারা তাহাকে সময় সময় আনিতে পাঠাইতেন। নীলরতন ও প্রভাবতী কন্যা নিরুপমাকেও হিন্দু ধর্ম্মকর্ম্মের নিয়মানুসারে গৃহস্থালীর বিষয় বিশেষরূপে শিক্ষা প্রদান করিতেন। কন্যার শিক্ষা পিতামাতার নিকটই সুসম্পন্ন হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পত্নী-বিয়োগ।

একদিন বৈশাখ মাসের নব আনন্দ-দুন্দুভি যখন জগতকে মাতাইয়া তুলিতেছিল। জরাজীর্ণ পুরাতন বর্ষকে বিদায় দিয়া মানব যখন প্রকৃতির নব শোভায় বিমোহিত হইয়া আত্মহারা হইতেছিল। কোকিলকুল মনের আনন্দে চ্যূত শাখা হইতে পঞ্চম স্বরে যখন মদনের প্রতাপ চারিদিকে বিঘোষিত করিতেছিল, ঠিক সেই নব বৈশাখের পুণ্যদা পূর্ণিমা তিথি হইতে মুখোপাধ্যায় বাটীতে ঘোর নিরানন্দের অভিনয় হইতে আরম্ভ হইল। নীলরতনবাবুর পত্নী প্রভাবতী হঠাৎ রোগ-শয্যায় শায়িত, বাঁচিবার আশা নাই, তাঁহার জমিদারীর প্রজাবর্গ এবং আত্মীয়স্বজন সকলেই এ সংবাদে দুঃখিত। গত বৎসর অজন্মা হওয়ায় প্রজাকুলের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। সহৃদয় জমীদার নীলরতনবাবু তজ্জন্য তাঁহার অধীনস্থ প্রজাবর্গকে যাবতীয় বাকী-খাজনার দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। তাঁহার এই অমানুষিক বদান্যতার কারণে প্রজাকুল আনন্দে আত্মহারা, চারিদিকে তাঁহার যশোগান করিতেছে। বাস্তবিক নীলরতনের ন্যায় স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ, জমীদার দেশে যত বৃদ্ধি হয়—ততই মঙ্গল, এরূপ জমীদারের অকস্মাৎ বিপদপাতে কোন্ প্রজা না দুঃখ প্রকাশ করিবে?

যে যত ধার্ম্মিক, ভগবানের পরীক্ষাও তাহার উপর

ততোধিক। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পারিতোষিক লাভ করিতে হইলে গৃহীকে ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। শাস্ত্রপাঠী, সংযত-চিত্ত না হইলে কখনই কেহ এ পারিতোষিক লাভের জন্য পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারিবে না।

নীলরতনবাবু পত্নীর পীড়ায় একান্ত কাতর। সংসারে থাকিয়া স্ত্রীপুত্রের পীড়ায় যে উদাস থাকে, সে গৃহী নহে। দুইজন ভাল ভাল হাকিমের চিকিৎসাধীনে পত্নীকে রাখিয়াছেন, নলিনাক্ষও জননীর পীড়ার সংবাদ শুনিয়া গৃহে আসিয়াছে, সেবা শুশ্রূষায় সেও প্রাণপাত করিতেছে। বালকের আহার নিদ্রা নাই, সে শয্যা পার্শ্বে বসিয়া কেবল মায়ের সেবায় নিযুক্ত, কিন্তু প্রভাবতীর চৈতন্য নাই। কন্যা নিরুপমা দাসদাসীর দ্বারা ভালরূপে প্রতিপালিত হয় না বলিয়া—মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠাভগ্নী আসিয়া সংসার দেখিতেছেন, নিরুপমারও রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহারই দ্বারা সংসাধিত হইতেছে। নিরুপমা হাসি খেলায় দিন কাটাইতেছে—অভাগিনী জানে না যে কৃতান্ত চোরে তাহার কি সর্ব্বনাশ করিতেছে। আজ অষ্টাহ হইল--প্রভাবতীর অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছে, নীলরতন বাবু নবাব সরকার হইতে সুবিজ্ঞ কবিরাজ আনাইয়াছেন, তাঁহার চিকিৎসাধীনে থাকিয়াও—রোগ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, কাযেই সকলে প্রভাবতীর জীবনে হতাশ হইলেন। লোকাভাব বশতঃ নীলরতন কার্য্যে অবসর লইয়া পত্নীর তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

জননীর বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া নলিনাক্ষের অস্থিচর্ম্ম সার

হইতেছে, সে ত ইহার তুল্য বিপদ আর কখনও দেখে নাই। পিতামাতা যখন স্বর্গগত হইয়াছেন—তখন সে তিন মাসের শিশু, আর এখন সে দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। নলিনাক্ষের এই অসহায় অবস্থায় দয়াময়ী প্রভাবতী নিজ হৃদয়ের রক্ত দিয়া পরিপোষণ না করিলে আজ নলিনাক্ষের অস্তিত্ব কোথায় থাকিত। প্রথমাবস্থায় প্রভাবতীর কয়েকটী পুত্র হইয়াছিল বটে, কিন্তু সকলকেই একে একে কৃতান্তের করালগ্রাসে অর্পণ করিতে হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামে একবার ভয়ানক বিসূচিকার প্রকোপ বৃদ্ধি হইয়া একটী ব্রাহ্মণ পরিবারের উচ্ছেদ সাধন হইয়া যায়, এই গ্রাম নীলরতন বাবুর জমীদারীভুক্ত ছিল এবং এই ব্রাহ্মণ পরিবারটী তাঁহারই অকপট বন্ধু ছিলেন। বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর পরলোক গমনের পর তাহাদের একটী তিনমাসের শিশু জীবিত ছিল। সংক্রামক রোগ বলিয়া কোন ভদ্রলোকই ঐ বাটীতে প্রবেশ করিয়া শিশুটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করে নাই নীলরতন বাবু ভাগ্যক্রমে সেইদিন জমীদারী পরিদর্শন করিতে তথায় গমন করেন। বন্ধুবরের এবং তদীয় পত্নীর অকস্মাৎ মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং অবশেষে তাঁহাদের শিশু পুত্রটি তখনও জীবিত আছে জানিয়া দয়া-প্রবণ-হৃদয়ে গৃহে আনিলেন এবং লালন পালনের জন্য পত্নীকে প্রদান করিলেন। পুত্রহীনা জননী সেই দুগ্ধপোষা শিশুটিকে পাইয়া হৃদয়ের রক্ত দানে তাহার প্রতিপালন করিয়াছেন। এখন তাহার বয়স দ্বাদশ বৎসর, সে জানে না যে তাহার অন্য জনক জননী ছিল—আর একথা তাহাকে কেহ বলেও নাই! পতিপত্নী শিশুটিকে যেরূপ ভাবে পালন করিয়াছেন, তাহাতে অপরের পক্ষ বলিয়া [illegible]

অনুমানও করিতে পারিবে না। ইহার অধিক যত্নে কেহ নিজ ঔরস-জাত পুত্রকেও প্রতিপালন করে না। নলিনাক্ষ যখন পঞ্চম বৎসরের অধিক; হাসি খেলায় জনক জননীর আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন, তাহার সেই কমনীয় কান্তি, সেই নয়নাভিরাম সুঠাম দৈহিক গঠন প্রণালী যখন এই পুত্রগতপ্রাণা জমীদার গৃহিণীর হৃদয়ে অতুল আনন্দ দান করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার কন্যাটির জন্ম হয়, এখন তাহার বয়স প্রায় পাঁচ বৎসর। পুত্রসম নলিনাক্ষকে এক্ষণে শ্রীগুরুর চতুষ্পাঠীতে ব্রাহ্মণোচিত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, কন্যাটিকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছেন।

নলিনাক্ষের জননী মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত। এ জগতে জননী ভিন্ন যে তাহার আর কেহ নাই। সে অহরহঃ শয্যাপার্শ্বে জননীর মুখের প্রতি চাহিয়া বসিয়া আছে, কখন বা গ্রামান্তরে চিকিৎসক ভবনে গমন করিতেছে—বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে দিনের মধ্যে কতবার যাইতেছে, কতবার আসিতেছে, তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই; হায়! বালকের এত আশা, এত উৎসাহ সমস্তই যেন ভস্মে ঘৃতাহুতি হইতেছে। রোগ কিছুতেই উপশম হইতেছে না। কৃতান্ত যাহাকে উদরস্থ করিবার জন্য সৃক্কণী পরিলেহন করিতেছে; সামান্য মানবের সাধ্য কোথায় যে তাহাকে রক্ষা করিবে? অদ্য প্রাতঃকাল হইতে প্রভাবতীর অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়াছে। পূর্ব্বে দুই একদিন একটু ভাল বলিয়াই বোধ হইতেছিল, কিন্তু আজ নানাপ্রকার উপসর্গ আসিয়া রোগিণীকে বড়ই দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে, পরীক্ষায় আর নাড়ী পাওয়া যাইতেছে না। নলিনাক্ষ পুনরায় কবিরাজ বাটী গিয়াছে।

সতী সীমন্তিনী প্রভাবতী মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিতে পারিয়া আজ আর স্বামীকে স্থানান্তরে যাইতে দেন নাই। চৈতন্যময়ীর বংশ-সম্ভূতা সতীগণের মৃত্যুর প্রাক্কালে এরূপ চৈতন্য-সঞ্চারই হইয়া থাকে। তাহারা স্বামীদেবতার পদসেবা ফলে বিনাকষ্টে হাসিতে হাসিতে মৃত্যুমুখ আলিঙ্গন করে!

মধ্যাহ্নের রৌদ্র পড়িয়া আসিয়াছে। নীলরতন অনিচ্ছা সত্ত্বেও জীবন ধারণের জন্য সামান্য আহারাদি করিয়া রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিয়াছেন। স্বামীকে দেখিয়া প্রভাবতী বলিলেন—"দেখ, আজ আমার প্রাণটা বড়ই ছট্‌ফট্ করিতেছে, তুমি আমাকে ছাড়িয়া আর কোথাও যাইও না।" নীলরতন বাবু ছলছল নেত্রে বলিলেন—"প্রভা! তোমাকে ছাড়িয়া ত আমি কোথাও যাই না, সমস্ত কাযকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছি, তুমি আরোগ্য না হইলে আর কোন কায কর্ম্ম করিব না।"

প্রভাবতী। নলিনাক্ষ কোথায় গিয়াছে?

নীলরতন। সে কবিরাজের বাটী গিয়াছে।

প্রভাবতী। সে ছেলেও যেমন পাগল, আর তুমিও তেমনি, বৃথা টাকা খরচ আর কেন, এ যাত্রা আর আমাকে কেহই ফিরাইতে পারিবে না। টাকা ত অজস্র খরচ হইল, ভাল হইবার হইলে ইহাতেই ভাল হইত। আমার আশা ছাড়িয়া দাও, আমি ত বেশ সুখে মরিতেছি, মরিতে ত আমার কোন কষ্ট নাই। তোমার মত পরম ধার্ম্মিক স্বামীর পদধূলি লইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ত সকলের প্রার্থনীয়। তুমি বেশী ভেবো না, কালে সব সহ্য হইয়া যাইবে।

নীলরতন বাবু নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। নয়নাশ্রু গণ্ড বহিয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। ক্রন্দন নীরব হইলেও অশ্রুর বেগ প্রবল ভাব ধারণ করিল। পুরুষ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে না পারিলেও তাহাদের শোকের ক্রন্দন যে অতীব মর্ম্মভেদী তৎপক্ষে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রভাবতী কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"দেখ, এ কাঁদিবার সময় নহে, তুমি আমার নিকটে এস, নিরুপমা কোথায় ?"

নীলরতন। সে বাহিরে খেলা করিতেছে।

প্রভাবতী। তাহাকে লইয়া তুমি আমার বিছানায় আসিয়া ব'সো।

নীলরতন নিরুপমাকে ডাকিতে গেলেন এবং ক্ষণেকের মধ্যে স্নেহের কন্যাকে সঙ্গে লইয়া প্রভাবতীর নিকটে আসিলেন।

বালিকা পিতার সহিত জননীর নিকট আসিল। প্রভাবতী হস্ত প্রসারণ করিয়া কন্যাকে বুকের মাঝে টানিয়া লইয়া মুখ-চুম্বন করিলেন। কন্যা মায়ের মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"মা! তুমি কেবলই শুয়ে থাক্‌বে, একবারও উঠ্‌বে না বুঝি!" বালিকা কিছুই বুঝে না, মা যে জন্মের মত তাহাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহার সে কিছুই জানে না।

প্রভাবতী কন্যার কচি কচি হাত দুইখানি ধরিয়া নীলরতনের হাতে দিলেন এবং বলিলেন—"মা! তুমি কর্ত্তার কাছে থাক্‌বে, ক্ষুধার সময় খাবার নিবে—ভাবনা কি মা!" এই সময় অপর একটী বালিকা দরজার নিকট উঁকি মারিয়া বলিল—"নিরু! খেল্‌বিনি ?" বালসুলভ চপলতা প্রযুক্ত সঙ্গিনীর সহিত নিরুপমা আবার খেলা করিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

প্রভাবতী স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া মস্তকে দিলেন। দারুণ মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যেও প্রভাবতী কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলেন! সতীর অবসাদ-গ্রস্ত দেহলতা যেন সজীবতা প্রাপ্ত হইল। নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে দীপশিখা যেমন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, প্রভাবতীর অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইল। নীলরতন বাবু একটী উচ্চ উপাধানে—তাঁহার মস্তক স্থাপিত করিয়া দিলেন। প্রভাবতীর কালিমাময় বদনে ক্ষণেকের জন্য কথঞ্চিৎ প্রফুল্লতা দেখা দিল। প্রভাবতী স্বামীর পা দুখানি নিজের বক্ষের নিকট লইয়া তদুপরি হস্ত দিয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন। পাঠক! এই পবিত্র স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিলে কে বলিবে পৃথিবীতে ধর্ম্ম নাই? এ দৃশ্য দেখিলে বাস্তবিক অশ্রুজল সম্বরণ করা যায় না, কিন্তু মানবের করুণ ক্রন্দন কি কৃতান্তের কঠিন হিয়া দ্রবীভূত করিতে পারে? তাহা হইলে শোক-বহ্নি জীব-জগতকে এরূপভাবে দগ্ধীভূত করিতে পারিত না। আজকাল হিন্দুর ঘরে এ দৃশ্যের অভিনয় প্রায় দৃষ্টিগোচর না হইলেও ইহা হিন্দুরই নিজস্ব সম্পত্তি; অন্য জাতি এ দৃশ্যের অভিনয় করিতে অসমর্থ।

গৃহে আর কেহ নাই। প্রভাবতীর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল, একটু জল চাহিলে নীলরতন শশব্যস্তে তাঁহার বদনে শীতলবারি প্রদান করিলেন। সামান্য পরিমাণে দুগ্ধও প্রদান করিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রভাবতী আর তাহা খাইতে চাহিলেন না।

প্রভাবতীর শুষ্ক কণ্ঠ একটু সরস হইলে খুব ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"দেখ, নলিনাক্ষকে যেন কেহ অযত্ন করে না। তার পর নিরুর বিয়ের সময় হইলে, তাহা

সহিত বিবাহ দিও; নলিনাক্ষের সহিত বিবাহ দিলে ঠিক স্বঘরেই হইবে এবং তাহার মত সৎপাত্রও আর পাওয়া যাইবে না।"

নীলরতন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"প্রভা! সে কথা আর তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না—গুরুগৃহে তাহার অধ্যয়ন শেষ হইলে তাহাকে তোমার অনুরোধ মতই সংসারী করিয়া দিব। তোমার বিহনে আর আমি সংসারে কি জন্য থাকিব প্রভা? তবে ঐ কর্ত্তব্য কর্ম্মটী সমাধা করিতে যত দিন বিলম্ব হয়, ততদিন বাধ্য হইয়া থাকিতে হইবে। যাইবার সময় তাহাদের নামে সমস্ত লিখিয়া দিয়া যাইব।" এই বলিয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

প্রভাবতীর ক্রমশঃ কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল; অতি জড়িতস্বরে বলিলেন—"তোমার মত বুদ্ধিমানের বৃথা শোক করা উচিত নয়—জগতের গতিই ত এই, তোমাকে রাখিয়া, তোমার পদধূলি লইয়া যে আমি মরিতে পারিতেছি, ইহার তুল্য স্ত্রীলোকের সুখের বিষয় আর কি আছে? পরজন্মে আবার দেখা হইবে, তবে এ জন্মে যদি কখন কোন অপরাধ ক'রে থাকি—মার্জ্জনা ক'রো। নীলরতনের অশ্রু আর নয়নে থাকিবার স্থান পাইল না—প্রবলবেগে সে গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল।

নীলরতন রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"প্রভা! গুণের প্রভা! তোমার জন্য যে এ জীবনে একটী দিনের জন্য মনোকষ্ট পাইয়াছি—তাহা ত আমার মনে হয় না, তুমি দুঃখের সময়ও যেমন ছিলে, আর এখনও তেমনি, তুমি সতী-সাবিত্রী। তোমার চরিত্রে কখনও অহঙ্কার বা অধর্ম্ম স্থান পায় নাই।"

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে প্রভাবতীর অনর্গল ঘাম হইতে লাগিল। গাত্রবস্ত্র সকল ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা অস্থিরতা বাড়িতে লাগিল। নীলরতন নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—আর নয়, এই শেষ—বুঝিয়া পবিত্র গঙ্গাবারি তাঁহার নয়নে ও গাত্রে প্রদান করিলেন। প্রভাবতীর কোন কষ্ট হইল না—যেন হাসিতে হাসিতে তিনি এ জগৎ হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন। বাটীতে যাহারা ছিল—উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। নিরুপমা এক একবার কাঁদিতে থাকে, পিতা আসিয়া ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেই সে একটু চুপ করে, কিন্তু নলিনাক্ষকে কেহ চুপ করাইতে পারিতেছে না। নীলরতন বলিলেন—"বাবা! আর কাঁদিলে কি হইবে; উপায় ত নাই। তুমি শাস্ত্রপাঠী, মানব-দেহের অনিত্যতা বুঝিয়া মনকে প্রবুদ্ধ কর; হৃদয় সাহসবদ্ধ করিয়া জননীর অন্ত্যেষ্টির চেষ্টা কর।"

নলিনাক্ষের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তথাপি পিতার বিষয় চিন্তা করিয়া সে হৃদয় বাঁধিল। জমীদার নীলরতনের অর্থবল ও লোকবলের অভাব ছিল না, সন্ধ্যার বহু পূর্ব্বে প্রভাবতীর পবিত্র-দেহ শ্মশানে নীত হইল। সর্ব্বভুক অগ্নিদেব সতীর পবিত্র দেহের আস্বাদ পাইয়া যেন দ্বিগুণ উৎসাহে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, দেখিতে দেখিতে প্রভাবতীর দেহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। সকলে পরকালসম্বল হরিধ্বনি করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন। হায়!

যে রত্ন হরিল আজ কাল দুরাচার।
পৃথিবী বদলে তাহা না মিলিবে আর॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পারলৌকিক ক্রিয়া

পতি পত্নী সংযোগই গৃহস্থালীর প্রধান অঙ্গ। গৃহে গৃহিণী না থাকিলে তাহার শোভা নাই। গৃহিণী বিহীন গৃহ চন্দ্রমাশূন্য আকাশের ন্যায় অন্ধকারময়। আজ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহও প্রভাবতী বিহনে প্রভাহীন, যেন সংসারের সকল সৌন্দর্য্য তাঁহার সহিত তিরোহিত হইয়াছে। পতি পত্নী একত্র না হইলে সংসার করা চলে না। একের বিহনে অন্যে যেন উৎসাহ উদ্যম-বিহীন, যেন কোন কাযেই আর তাহার সেরূপ প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায় না। পতিবিয়োগে পত্নীরও যেরূপ অবস্থা, আর পত্নী বিয়োগে পতির অবস্থাও তদ্রূপ।

যত দিন যাইতে লাগিল,—পত্নী-বিয়োগ-জনিত অভাবে নীলরতনও তত ম্রিয়মান হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর কোন কাযে তাঁহার মনস্থির হয় না। নবাব সরকারের কার্য্য-কর্ম্ম তিনি পূর্ব্ব হইতেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বিষয় বৈভবের অভাব নাই। স্বগ্রাম রুদ্রপুরে, নদীয়া জেলায়, চানকে—তিনি অনেক সম্পত্তি করিয়াছেন। তাঁহার এত লোক নাই যে এ বিপুল সম্পত্তি সম্ভোগ করে। এ বিষয় সম্পত্তি সমস্তই নিরুপমার, চানকের সম্পত্তি তিনি নলিনাক্ষকে লিখিয়া দিয়াছেন। নীলরতনের প্রাণ উদাস হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গেলে তিনি দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইবেন—ইহাই

তাঁহার ইচ্ছা। ভগ্নী মহামায়া হিন্দুর ঘরের বিধবা হইয়া এতদিন শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিতেছিল। ভ্রাতৃজায়ার অসুস্থ সংবাদ দানে আজ এক মাস হইল, নীলরতন বাবু তাঁহাকে আনাইয়াছিলেন। নীলরতনের ভাবান্তর দেখিয়া তিনি কত বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু নদী বাঁধ ভাঙ্গিলে কি আর সামান্য বাধায় আবদ্ধ হয়! নীলরতন জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মহামায়াকে সাতিশয় মান্য করিলেও তাঁহার কথায় তীর্থবাসের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

নলিনাক্ষ বহুদিন হইল, পাঠ বন্ধ করিয়া গুরুগৃহ হইতে আসিয়াছে; মনে করিয়াছিল, জননী ভাল হইলেই সত্বর চলিয়া যাইবে, কিন্তু হায়! দুরন্ত কাল তাহার সকল আশা ভরসা, উদ্যম উৎসাহের পথ রুদ্ধ করিয়া অকালে প্রভাবতীকে উদরস্থ করিল। নলিনাক্ষ আনন্দের দুলাল—সে জীবনে কখন এরূপ কষ্ট, এরূপ অভাব সহ্য করে নাই। সে চিরকালই সুখে লালিত পালিত হইয়া আসিয়াছে। নলিনাক্ষের সামান্য জ্বর হইলেই প্রভাবতী আহার নিদ্রা বন্ধ করিয়া শয্যা পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন, অজস্র অর্থব্যয় করিয়া রোগের উপশম জন্য চেষ্টা করিতেন। এ হেন হিতাকাঙ্ক্ষিনী, বাৎসল্যপ্রতিমা, পালনকর্ত্রী অভাবে নলিনাক্ষের হৃদয়ে কিরূপ শেলাঘাত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বিবেচ্য। প্রভাবতীর শোকে আর একজন অতীব মুহ্যমান হইয়াছিল—সে নীলরতনবাবুর পুরাতন ভৃত্য—রূপচাঁদ। রূপচাঁদ অর্থাভাবে ডাকাতি করিত, কিন্তু তাহার স্বভাব অতি কোমল ছিল—ঘোর অভাবে পতিত না হইলে সে ডাকাতি করিত না। প্রভাবতী লোক পরম্পরায় তাহার বিষয়

অবগত হইয়া তাহাকে নিজ আশ্রয়ে আশ্রয় দিলেন এবং নানা প্রকার ধর্ম্মোপদেশদানে তাহাকে সৎপথে আনয়ন করিলেন। বোধ হয়, অন্নপূর্ণাস্বরূপা দয়াময়ী প্রভাবতী না থাকিলে রূপচাঁদের ন্যায় একজন নিরক্ষর হীনবংশজ ব্যক্তি এতদিন যাবতীয় দুষ্কর্ম্মে রত হইয়া জীবন কলুষিত করিত। কেবল প্রভাবতীর পুত্রাধিক স্নেহেই সে পাপ পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ধর্ম্ম-জীবন অতিবাহিত করিতেছে। আজ সেই স্নেহময়ী কর্ত্রী বিহনে রূপচাঁদ সমস্ত অন্ধকারময় দেখিতে লাগিল।

সময় কাহারও অপেক্ষা করে না। শোক হতাশ অবসাদে ক্রমশঃ শ্রাদ্ধের দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। নীলরতন প্রভাবতীর পারত্রিক কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য অর্থব্যয়ের কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। ইতিপূর্ব্বেই তিনি রুদ্রপুরের প্রধান কর্ম্মচারী ত্রিলোচন বিশ্বাসকে সমস্ত বিষয়ের আয়োজন করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি গুরুদেবকে সংবাদ দিয়া বাটী রওনা হইলেন। দেশে আসিতে তাঁহার একদিন মাত্র বিলম্ব হইয়াছিল। আসিয়া দেখিলেন—তাঁহার অনুমতি অনুসারে ত্রিলোচন সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে। আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই একে একে আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শ্রাদ্ধের দিন সমাগত হইল। প্রভাবতীর ত পুত্র নাই। গুরুদেবের অনুমতিক্রমে কন্যা ও নিজের দ্বারা প্রভাবতীর পারত্রিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইল। নলিনাক্ষকেও একটি ভোজ্য উৎসর্গের ব্যবস্থা দিলেন। এই শ্রাদ্ধ ব্যাপারে নীলরতন অকুণ্ঠিত চিত্তে অর্থব্যয় করিতেছেন। আর কাযের ব্যবস্থা করিতেছেন পণ্ডিতপ্রবর বাসুদেব

শাস্ত্রী। সুতরাং এই মহাসমারোহ কার্য্য যে সুশৃঙ্খলায় সমাধা হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? অনবরত তিনদিন ধরিয়া গ্রামসমূহের অধিবাসিবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। আট দশখানি গ্রামের ব্রাহ্মণ, শূদ্র এবং অপরাপর জাতীয় স্ত্রীপুরুষেরও আবাহন হইয়াছিল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল যে, রুদ্রপুর মহকুমায় এরূপ শ্রাদ্ধ কখনও হয় নাই, আর এরূপ সুব্যবস্থাও তাহারা অন্য কোন কায কর্ম্মে দেখে নাই। তাঁহার পর অধ্যাপকমণ্ডলীর বিদায়—বাঙ্গালার নানাস্থান হইতে অধ্যাপকমণ্ডলীর আগমন হইয়াছিল, বাসুদেব শাস্ত্রী মহাশয় সকলের মর্য্যাদানুসারে বিদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যিনি যেরূপ দূর হইতে আসিয়াছেন এবং তাঁহার যেরূপ মান্য, শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট তাহা অবিদিত ছিল না। তাঁহার ব্যবস্থাগুণে সকলে হৃষ্টচিত্তে কর্ম্মীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে কাঙ্গালী বিদায়ের ব্যবস্থা। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুনাম শুনিয়া দেশ দেশান্তর হইতে দীন দরিদ্রগণ সমবেত হইয়াছিল। এক্ষণে কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার অজস্র অর্থব্যয়, সাদর সম্ভাষণ এবং সুব্যবস্থা দেখিয়া সকলেই দুইহাত তুলিয়া প্রভাবতীর অক্ষয়-স্বর্গকামনা করিতে করিতে বাটি প্রস্থান করিল।

এক সপ্তাহব্যাপী সমারোহের পর আত্মীয় স্বজনগণ স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুবৃহৎ অট্টালিকা এতদিন লোকজনে পরিপূর্ণ ছিল, সকলের সহিত মিলিত হইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় একরূপ বেশ সুখে ছিলেন। আজ তাহা লোকজন বিরহে খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। কাযেই নীলরতনের শূন্য প্রাণও আবার প্রভাবতীর অভাবে দারুণ অভ-

বোধ করিতে লাগিল! এ বাটীতে থাকিতে আর তাঁহার প্রাণ চাহে না। এ বাটীর সমস্তই যে প্রভাবতীর স্বহস্তে সুসজ্জিত, যে দিকে চাহিবেন সেই দিকেই যে প্রভাবতীর হস্ত নির্ম্মিত-কার্য্যাবলীর অপূর্ব্ব সমাবেশ, আজ প্রভাবতী ইহলোক হইতে চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছেন - হায়! এ সকল দৃশ্য দেখিয়া নীলরতনের শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিতে লাগিল। সকল বিষয়ে অভাব বোধ হইলে কি আর মন তিষ্ঠিতে পারে? এই জন্য তিনি তীর্থ পর্য্যটনের জন্য গুরুদেবের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন—"বৎস! তীর্থপর্য্যটন শোকচিত্তসান্ত্বনার একটী প্রধান উপাদান বটে, যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে - তুমি অনায়াসে যাইতে পার, লক্ষ্য খুব দৃঢ় করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জনের চেষ্টা কর - জগতের গতিই এরূপ ভাবিয়া পরকালের পথ প্রশস্ত করাই বিধেয়।"

নীলরতন বলিলেন—"গুরো! আমি কয়েক বৎসরের জন্য তীর্থভ্রমণ করিব। আপনি নলিনাক্ষকে দেখিবেন, আর সময়ে সময়ে রুদ্রপুরে আসিয়া কন্যাটীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবেন। সে এখন পিসিমাতার বড়ই অনুরক্ত হইয়াছে, আমি যাইলে তাহার কোন কষ্ট হইবে না। একটু মন স্থির হইলেই তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নলিনাক্ষের সহিত নিরুপমার পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিব। পরে কন্যাদায় হইতে পরিমুক্তি লাভ করিয়া সংসার হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিব।" এই বলিয়া নলিনাক্ষকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। বাসুদেব কয়েক বৎসর শিক্ষাদান করিয়া বালককে ভালরূপ চিনিয়া ছিলেন। তাহার অদ্ভুত বুদ্ধি-শক্তি, ধর্ম্মভাব এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস

দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। নতুবা সংসার-বিরাগী বাসুদেব শাস্ত্রী কখনও তাহার ভার লইতেন না। বালক নলিনাক্ষ তাঁহার আশ্রয়ে আসিবার পূর্ব্বেও তিনি আরও কয়েকটী ছাত্রকে শিক্ষাদান করিতেন বটে, কিন্তু জানি না কি গুণে নলিনাক্ষ এত শীঘ্র গুরুদেবের এরূপ প্রিয়পাত্র হইতে পারিয়াছিল। আরও কয়েকদিন মাত্র অবস্থান করিয়া বাসুদেব শাস্ত্রী নলিনাক্ষকে লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। নলিনাক্ষ যাইবার সময় পিতার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। নীলরতন বলিলেন—"বাবা! চিন্তা কি, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব, ইহার মধ্যেও সময়ে সময়ে আমার সংবাদ পাইবে।" নলিনাক্ষ এখন জানিতে পারিয়াছিলেন, ইনি তাহার পালক-পিতা—আর প্রভাবতী তাহার পালনকর্ত্রী মাতা। পুত্রের প্রতি পিতামাতার বাৎসল্যভাব ত আপনিই আসিয়া থাকে, কিন্তু নিঃসম্পর্কীয়ের প্রতি ইঁহাদের মত বাৎসল্যভাব অনেক জনক, জননীর নিকটও পাওয়া যায় না। এই ভাবিতে ভাবিতে শোক-দগ্ধ নলিনাক্ষ চির-কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গুরুগৃহে গমন করিল। তিনটী পবিত্র হৃদয় কালচক্রে পরস্পর পৃথক হইয়া গেল। জানি না আবার কত দিনে ইঁহাদের পবিত্র মিলন সংঘটিত হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—⊱❦⊰—

কাশী-মৃত্যু।

প্রভাবতীর মৃত্যুর পর প্রায় তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। নীলরতন বাবু এই অল্প সময়ের মধ্যে হিন্দুর প্রায় সকল তীর্থই পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তীর্থভ্রমণের পর জন্মভূমি পরিদর্শনার্থ আসিয়া রুদ্রপুরে তিন চারি মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু পত্নী বিয়োগের পর আর তাঁহার গৃহে মনস্থির হয় না। গৃহের চারিদিক নিরীক্ষণ করিলেই যেন তাঁহার পূর্ব্বকাহিনী সকল স্মৃতিপথে জাগরূক হইয়া অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করে।

নীলরতন বাবু যে সকল জমীদারী ও নগদ অর্থাদি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে প্রায় সমস্ত নিঃশেষ হইয়াছে। তাঁহার জনৈক বিপক্ষ দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ ধর্ম্মকর্ম্ম-বিহীন শ্রীধরপুরের জমীদার তাঁহার অনেক বিষয় আশয় তাঁহার অনুপস্থিতিকালে আত্মসাৎ করিয়াছে। নীলরতন বাবু ফিরিয়া আসিয়া ঐ সকল জমীদারী উদ্ধারের আর কোন চেষ্টা করেন নাই। পত্নী বিয়োগের পর তাঁহার প্রাণ একেবারে উদাস হইয়া গিয়াছে। সংসারের মায়া-শৃঙ্খল কাটিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হন। এরূপ অবস্থায় তিনি যে আবার অনিত্য বিষয়ের জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে, জীবন-নাটকের যবনিকাপাতের প্রাক্কালে পুনরায় কলহে প্রবৃত্ত হইয়া পরকাল নষ্ট করিবেন; এখন সে বিষয়ে আর তাঁহার সেরূপ প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে না। রুদ্রপুরের

রাজপ্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকা ও স্ত্রীর যাবতীয় মহামূল্য অলঙ্কার কন্যার বিবাহের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। আর স্থানে স্থানে যে যৎসামান্য জমীদারী আছে- তাহাতে তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের অনাটন হইবে না; তবে আর কিসের জন্য সামান্য মানবের মত সংসার-কারায় আবদ্ধ থাকিয়া অশেষবিধ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করা; জগতের যখন সমস্তই ভোজের বাজী, ধন-জন-যৌবন যখন নিশার-স্বপন তখন আর কেন?

যাহার প্রতি যত ভালবাসা—তাহার বিচ্ছেদে তত কষ্ট। পত্নী বিয়োগের পর হইতে নীলরতন বাবু নানা প্রকার মানসিক কষ্ট সহ্য করিতেছেন; কিন্তু তথাপি সে দুঃখ, সে কষ্ট কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই। কষ্ট অসহ্য হইলে কেবল গুরু-দেবকে জানাইতেন, তিনি নানা প্রকার ধর্ম্ম উপদেশ দানে তাঁহার চঞ্চল চিত্তকে সুস্থির করিয়া দিতেন। অশেষ শাস্ত্রপাঠী শ্রীগুরুর এই অমানুষিক ক্ষমতা গুণেই তিনি তাঁহার পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরুদেব নীলরতনকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, কেবল নীলরতনের জন্য তিনি সংসার-ত্যাগী হইয়াও তাঁহার পালক-পুত্র নলিনাক্ষকে লইয়া সংসারে এখনও অবস্থান করিতেছেন। নতুবা চতুষ্পাঠীতে ছাত্র লইয়া অধ্যয়ন করাইতে আর তাঁহার ইচ্ছা নাই। এই জন্য বলিতে হয়—নীলরতনের ন্যায় শিষ্য লাভ করাও অনেক গুরুর ভাগ্যে ঘটে না। গুরুও, অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বানু-সন্ধিৎসু,ধর্ম্মপরায়ণ শিষ্য পাওয়া অতীব কঠিন।

নীলরতন তীর্থবাসের পর চারি মাস রুদ্রপুরে বাস করিয়া এক্ষণে কাশীধামে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যহ ভাগীরথীর

পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া, বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার-চরণ বন্দনা করিয়া ধন্য হইতেছেন। প্রতিদিন আরতির সময় সেই পবিত্র বেদগান শ্রবণ করিয়া, তিনি যেন তন্ময় হইয়া যাইতেন। সংসার তাঁহার নিকট মরুভূমির ন্যায় বোধ হইত। এতদিন তীর্থভ্রমণে তাঁহার শরীর বড়ই অপটু হইয়াছিল, কারণ এখনকার মত তখন তীর্থ ভ্রমণের তাদৃশ সুবিধা ছিল না। নানাপ্রকার মনঃকষ্ট ও পথশ্রমে নীলরতন কাশীধামে কিয়দ্দিন অবস্থানের পর পীড়িত হইয়া পড়িলেন। পীড়া সামান্য দিনের মধ্যে নীলরতনকে মৃত্যুর কবলে টানিয়া আনিতে লাগিল। শারীরিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় দেখিয়া নীলরতন গুরুদেবকে সংবাদ দিলেন। নলিনাক্ষকে এ সংবাদ না জানাইয়া গুরুদেবকে কাশীধামে আসিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার এই নিদান সময়ে শ্রীগুরুর চরণ দর্শনই একমাত্র প্রার্থনীয়। "কন্যা ও ভৃত্য রূপচাঁদ নিকটেই আছে। মায়ার আধার পুত্র কন্যা এবং অনিত্য ধনজনের আকাঙ্ক্ষায় আর জীবন কলুষিত করি কেন? যথাসময়ে গুরুদেবের নিকট সংবাদ আসিলে, বাসুদেব শাস্ত্রী নলিনাক্ষের নিকট কোন কথা না বলিয়া তাহার উপর চতুষ্পাঠীর সমস্ত ভারার্পণ করতঃ কাশী গমন করিলেন। নলিনাক্ষ চতুষ্পাঠীর তত্ত্বাবধান করিয়া সময় পাইলে নিজের পাঠাভ্যাস করিতেন। এখন সাধন ভজনেও তাঁহার অনেক বাধা পড়িতেছে। সময় যতই অল্প হউক না কেন, নলিনাক্ষ প্রত্যহ অন্ততঃ একবার নির্জ্জনে প্রেমাশ্রু বিগলিত-নেত্রে মাকে ডাকিতে ছাড়িতেন না।

গুরুদেব কাশীধামে নীলরতনের বাসায় উপস্থিত হইলেন।

রোগজীর্ণ নীলরতন গুরুদেবের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া হৃদয়ে বল সঞ্চার করিলেন। মৃত্যুভয়ে তখন আর তিনি কাতর হইলেন না। যে ভগবদ্ভক্ত নীলরতনের চিত্ত-চকোর ভগবানের নাম-সুধা পান করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, এক্ষণে গুরুদেবের নিকট তাহার সেইরূপ ঐহিক, পারত্রিক কোন বিষয়ের কিছুমাত্র ত্রুটি লক্ষিত হইল না। ভক্তপ্রধান মহারাজ পরীক্ষিতের মৃত্যু সময়ে পরম-ভাগবত বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাঁহাকে হরিনামামৃত পান করাইয়া যেমন ভবাব্ধি পার করিয়া দিয়াছিলেন। বাসুদেব শাস্ত্রীও নীলরতনের জন্য সেইরূপ করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রের অমোঘ উপদেশ সকল অহরহঃ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। মরণ-বারণ শ্রীকৃষ্ণ নামামৃত তাঁহার কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ কয়েকদিবস যেন নীলরতন কথঞ্চিৎ আরোগ্য হইয়া উঠিলেন। সকলেই মনে করিল—কর্ত্তা, গুরুদেবের কৃপায় এ যাত্রা রোগমুক্ত হইলেন। কিন্তু যাহার কালের ভেরী বাজিয়াছে, তাহার আর নিস্তার কোথায়? দীপ নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে যেরূপ ভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, নীলরতনের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। কয়েক দিন মাত্র সুস্থ থাকিবার পর নীলরতন দ্বিগুণ পরিমাণে রোগাক্রান্ত হইলেন, নানাপ্রকার ভীষণ উপসর্গ আসিয়া তাঁহাকে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। বাসুদেব সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি প্রিয়তম শিষ্যের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া নলিনাক্ষকে সংবাদ দিলেন। যথাসময়ে নলিনাক্ষ আসিয়া তার অবস্থা দর্শন করতঃ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। নীলরতন তখনও চৈতন্যহীন হন নাই, তিনি পুত্রসম নলিনাক্ষকে

নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা নলি! পিতামাতা কাহারও চিরদিন জীবিত থাকে না। গুরুদেব রহিলেন, তিনি সমস্তই জানেন, তিন মাসের অপগণ্ড তোমাকে আমি মানুষ করিয়াছি। এক্ষণে গুরুদেবের পদাশ্রয়ে তোমাকে রাখিয়া চলিলাম, তিনি তোমাকে ধীরে ধীরে এ সংসার-সাগর পার হইবার উপায় বলিয়া দিবেন। তুমি ধর্ম্মশিক্ষা ও সাধনায় যেরূপ অগ্রসর হইতেছ, তাহা আমি গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি; আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘায়ুঃ হও। আমার শেষ অনুরোধ—ব্রহ্মচর্য্যের পর গুরুদেবের অনুমতি অনুসারে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিও, প্রকৃত গৃহী হইবার জন্য নিরুপমার পাণিগ্রহণ করিও, নিরুপমা তোমার অনুপযুক্তা নহে। এই জন্য পরস্পর পৃথক করতঃ কন্যার শিক্ষাদান নিজহস্তে লইয়া, তোমার শিক্ষার ভার গুরু-দেবের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছিলাম। ব্রহ্মচর্য্য-সাধনায় মতি স্থির ও শাস্ত্রশিক্ষায় তোমার অনুরক্তি পরিবর্দ্ধিত হউক, তুমি দীর্ঘজীবি ও সুখী হও, ধর্ম্মকর্ম্মে তুমি ক্রমোন্নতি লাভ কর—এই আশীর্ব্বাদ করি।"

হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য্য, তাহা নলিনাক্ষের বিশেষ অভ্যস্ত হইয়াছে। তিনি যৎপরোনাস্তি কষ্টসহিষ্ণু হইয়াছেন, সামান্য শোক তাপে আর তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না সত্য, কিন্তু অদ্যকার এই ঘটনা দেখিয়া তিনি আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"জগতের আরাধ্য দেবদেবী জনকজননীকে ত তি মাসের সময় হারাইয়াছি, তাঁহাদের আকৃতি-প্রকৃতি ত স্মরণ পথে সমুদিত হয় না। পালকরূপে যাঁহাদিগকে ভগবান প্রেরণ

করিয়াছিলেন, একে একে তাঁহাদের দুই জনকেইত পৃথিবী হইতে সরাইয়া লইলেন। কই, আমি ত ইঁহাদের তিলমাত্র উপকার করিতে পারিলাম না! জগতে আমার জীবনধারণ বৃথা ব্যতীত আর কি বলিব।" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাসুদেব শাস্ত্রী ও নীলরতন তাঁহাকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিয়া নিকটে বসাইলেন। নীলরতন পুত্রকে একটু গঙ্গাবারি প্রদান করিতে বলিলেন। নলিনাক্ষ শশব্যস্তে তাঁহার বিশুষ্ক বদনে শীতল গঙ্গাবারি প্রদান করিয়া ধন্য হইলেন এবং পদতলে বসিয়া তাঁহার জরাজীর্ণ পা দুখানিতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। এ জীবনে নলিনাক্ষের ইহাই পরম লাভ।

ক্রমশঃ রজনী সমাগত হইল। বাসুদেব শাস্ত্রী কাশীধামে থাকায় অনেক ভক্ত তাঁহার চরণদর্শন করিতে তথায় আগমন করিতেন। নীলরতনের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে, কিন্তু জ্ঞানের বিলোপ হয় নাই, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইতেছে। তিনি ভক্তমণ্ডলীকে তাঁহার বাসগৃহে সমবেত হইতে দেখিয়া গুরুদেবকে পরকাল সম্বল কাশী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। বাসুদেব এইবার তানলয়-বিমিশ্রিতকণ্ঠে, ভক্তিগদগদচিত্তে ভগবতীর গুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শাক্ত-ভক্ত নীলরতন মৃত্যুর প্রাক্কালে অশ্রুবিগলিত নেত্রে, উৎকর্ণ হইয়া সেই অমৃতধারা পান করিতে করিতে ৺কাশীধামে শ্রীগুরুর চরণতলে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। পাঠক! নীলরতনের ন্যায় সৌভাগ্যবান আর কাহাকেও দেখিয়াছেন কি? কোন কষ্ট হইল না, মৃত্যুর ভীষণ দংষ্ট্রে চর্ব্বিত হইয়া কোনপ্রকার বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইল না; হাসিতে হাসিতে নীলরতন পার্থিবদেহ পরি-

বর্ত্তন করিলেন। ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? নিরুপমা ও নলিনাক্ষ কাঁদিয়া আকুল হইলেন। প্রভুভক্ত রূপচাঁদও কাঁদিতে লাগিল। বাসুদেব সকলকে সান্ত্বনা করিয়া প্রিয়-শিষ্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিতে লাগিলেন। নীলরতনের ন্যায় পরোপকারী ধর্ম্মাত্মার সজ্ঞানে কাশী-মৃত্যু হইল। পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশাইল। প্রকৃত ধর্ম্মাত্মা না হইলে এরূপ সৌভাগ্য কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, পাঠক! তাহার বিচার করুন। কাশীতে মরিলে জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ পরকালে তাহার শিবলোকে অবস্থিতি হইয়া থাকে। নীলরতনের কাশী মৃত্যুজনিত ফলে শিবলোক প্রাপ্তি ত অনিবার্য্য। তাঁহার ন্যায় আদর্শ চরিত্র, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের তদপেক্ষা উচ্চগতি লাভ, তদীয় গুরুদেব ও আত্মীয়বর্গের অভিপ্রেত। মহামায়া তাঁহার কৃতী পুত্রকে উপযুক্ত আশ্রয় প্রদান করিয়া ভক্তবৎসল নামের মহিমা প্রদর্শন করুন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

যতদিন জীবন ততদিনই জগতের সহিত সম্বন্ধ। দারা, পুত্র, পরিজন, বিষয়বৈভব যতদিন তুমি আছ, যতদিন জগদ্‌বক্ষে তোমার অস্তিত্ব আছে, ততদিনই এ সকল তোমার; তোমার অধীনস্থ থাকিয়া তাহারা নানা প্রকারে তোমার তোষামোদ করিবে। তুমি চক্ষু মুদিলে, ইহজগত হইতে অপসৃত হইলে, আর কেহই তোমার নহে, এ জগতের কিছুই আর তোমার কাযে আসিবে না। জগতের সহিত তোমার এইটুকু সম্বন্ধ, এইটুকু শেষ হইলে আর কিছুরই সহিত তোমার সম্বন্ধ নাই। এই ত জগত, এই ত জগতের সহিত মানবের সম্বন্ধ, ইহার জন্য মানুষ জীবিতাবস্থায় অবাধে কত পাপ সঞ্চয় করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে!

নীলরতন চলিয়া গিয়াছেন। ধার্ম্মিকপ্রবর ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল আলোকে জীবনের অন্ধকারময় পন্থা হাসিতে হাসিতে অতিক্রম করিয়াছেন। ভীষণ তরঙ্গ-সঙ্কুল ভবসমুদ্রে শ্রীগুরু কাণ্ডারী হইয়া নীলরতনকে পার করিয়া দিয়াছেন। মায়াময় সংসারের সমস্ত পড়িয়া রহিয়াছে, নাই কেবল নীলরতন। পিতৃশোকে তদীয় পুত্রী নিরুপমা ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছে, নলিনাক্ষ শোকে মুহ্যমান, মহামায়া ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া বক্ষে করাঘাত করিতেছেন, প্রভুভক্ত রূপচাঁদ শোকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে। দুই দিনের জন্য সকলেই হা হতোস্মি করিতেছে, কিন্তু

যে যায় সে কি আর ফিরিয়া আসে ? ঠিক তেমনটি কি আর নয়ন-গোচর হয় ? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে জগতে কি আর লোকের সঙ্কুলান হইত ? জন্মাইলে মৃত্যু—ইহা বিধাতার অকাট্য নিয়ম, কখনও তাহার ব্যতিক্রম হয় না।

কাশীধাম হইতে সকলেই চলিয়া আসিয়াছেন। বাসুদেব সকলকে লইয়া কিয়দ্দিন রুদ্রপুরে ছিলেন ; তারপর মাসান্তে নলিনাক্ষের সহিত নিজ আশ্রম নদীয়ায় চলিয়া আসিয়াছেন। নীলরতনের মৃত্যুরূপ শোক-শেল অশেষ শাস্ত্রপাঠী সংসার-বিরাগী বাসুদেবকে বিষম বাজিয়াছে। তিনি এতদিন যাহার জন্য সংসারী হইয়াছিলেন, যে প্রিয় শিষ্যের ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া বাসুদেব চতুষ্পাঠী খুলিয়া জীবন যাপন করিতেছিলেন। সে চলিয়া গিয়াছে ; চিরদিনের মত গিয়াছে—আর ফিরিবে না। তবে আর কেন এ মায়াময় সংসারে থাকিয়া জীবন কলুষিত করি। বাসুদেব মনে মনে এ সকল পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন ! পাঠক আপনারা বোধ হয়, বাসুদেব শাস্ত্রীর পরিচয় জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন ? এক্ষণে তাঁহার কথঞ্চিৎ পরিচয় গ্রহণ করুন।

বাল্যকাল হইতে বাসুদেবের জ্ঞানার্জ্জনের লালসা অত্যন্ত বলবতী ছিল। সংস্কৃত ভাষার প্রগাঢ় অনুশীলনে তিনি উক্ত ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বেদ, পুরাণ, কাব্য, অলঙ্কার, তন্ত্র, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র সকল তাঁহার তুণ্ডাগ্রে বিরাজ করিত। নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও তাঁহার অধ্যয়ন পিপাসার শান্তি হয় নাই। তিনি অহরহঃ অগাধ-শাস্ত্র-সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিতেই ভালবাসিতেন।

বাসুদেব শাস্ত্রী নদীয়ার আশ্রমে নলিনাক্ষকে শাস্ত্রোপদেশ দিতেছেন। [৩০ পৃঃ

নানা শাস্ত্র আলোচনার মধ্যে থাকিয়াও যে ব্রাহ্মণ ঈশ্বর-চিন্তায় বিরত থাকিতেন তাহা নহে, ঈশ্বর চিন্তাই তাঁহার জীবনের সার ব্রত ছিল, ঈশ্বর চিন্তাই তাঁহার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য। তাঁহার পাঠ্য শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ মধ্যে যে সকল শাস্ত্রে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় সংবাদ অধিক দেখিতে পাইতেন, সেই সকল শাস্ত্রের অনুশীলনেই তিনি অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত শাস্ত্রাধ্যয়নেও তাঁহার মনে কিছুমাত্র আত্মপ্রসাদ জন্মাইত না। নানাশাস্ত্রের জটিল মত বাদ, ঈশ্বর তত্ত্বের মীমাংসায় তাঁহার মনে নানারূপ সংশয় আনিয়া দিত—নানা শাস্ত্রের নানা কূটতর্কে, ইশ্বরের স্বরূপ তত্ত্ব নির্দ্ধারণ তাঁহার পক্ষে প্রবল পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইত। কোন শাস্ত্রে লিখিত আছে ঈশ্বর সাকার, কোন শাস্ত্রে লিখিত আছে ঈশ্বর নিরাকার; কোন শাস্ত্রে মীমাংসিত হইয়াছে ঈশ্বর অদ্বৈত; কোন শাস্ত্রে মীমাংসিত হইয়াছে ঈশ্বর দ্বৈত; কোন্ শাস্ত্রকার বলিতেছেন ঈশ্বরকে প্রকৃতিরূপে ভজনা কর; কোন শাস্ত্রকার বলিতেছেন ঈশ্বরকে পুরুষরূপে ভজনা কর; কোন শাস্ত্রে বর্ণিত আছে,—ঈশ্বরের রূপ অসীম অনন্ত; প্রকৃতি পুরুষ এ দুইটী তাঁহার সেই অনন্ত রূপের অভেদ মূর্ত্তিমাত্র, অতএব সাধক ইচ্ছা করিলে রূপ বৈষম্য বা দ্বৈতভাব পরিবর্জ্জন করিয়া, প্রকৃতি ও পুরুষ রূপের ব্যষ্টিভাবে কিম্বা উভয় রূপের সমষ্টির একত্রে উপাসনা করিতে পারেন। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে আপনাপন মতের পোষকতা করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। কিন্তু নানাশাস্ত্ররূপ কূট-জালে নিপতিত হইয়া তিনি ইষ্টমন্ত্রে স্থির বিশ্বাস স্থাপন

করিতে পারেন নাই। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্রোতোন্নিক্ষিপ্ত তৃণখণ্ডের ন্যায় কেবল নিরুদ্দেশ্য নানামতের অনুবর্ত্তন করিতেন; এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ক্রমশঃ বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইতে লাগিলেন,—মহাকালের করাল-মূর্ত্তি ক্রমশঃ পুরোবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে অন্তিমের ভাবনায় আকুল করিয়া তুলিল। অতঃপর এই ভীষণ ভবার্ণব কিরূপে উত্তীর্ণ হইবেন, এই চিন্তা প্রবলা হইয়া শাস্ত্রাধ্যাপনেও তাঁহাকে বীতরাগ করিয়া তুলিল। ব্রাহ্মণ দারুণ দুর্ভাবনায় কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হায়! আজীবন জ্ঞানানুশীলন ও শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া আমার কি ফলোদয় হইল? কাহার উপাসনা করিলাম? তত্ত্বজ্ঞান কই? কোথায় জ্ঞানের অস্তিত্ব? জ্ঞানকে কি আমি দেখিতে পাইয়াছি? ভ্রম,—মহাভ্রম; জ্ঞানকে কে কবে দেখিতে পাইয়াছে? জ্ঞানের আরাধনায় কে কবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে? কোন্ মূর্খ দর্প করিয়া বলিতে পারে,- আমি জ্ঞানী? জ্ঞান-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া, তন্মধ্য হইতে রত্ন আহরণ করা সুদূরপরাহত। আমি জ্ঞানসিন্ধু তীরস্থ সামান্য উপলখণ্ড সংগ্রহেও সমর্থ হই নাই। হায়! আমি কি করিলাম! আমি এখন পরম পবিত্র পণ্ডিতের অথবা সাধক-বংশে জন্মগ্রহণ করতঃ জ্ঞানচর্চ্চার মরীচিকায় প্রলুব্ধ হইয়া এতদিন দুর্লভ মানব জীবন, বৃথায় যাপন করিয়াছি; "জ্ঞান জ্ঞান" করিয়া সারা জীবনটা বৃথায় ক্ষেপণ করিয়া দুকূল হারাইয়াছি। এক্ষণে অন্তিমে, এই অকূল ভব-জলধি কিরূপে অতিক্রম করিব, ভাবিয়া যে কূল পাইতেছি না। শাস্ত্রের বিষয় লইয়া কূট তর্ক করিবার আর এখন সময় কই? হায় হায়! জ্ঞানমদে অন্ধ হইয়া, ভ্রমেও ভাল করিয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করি নাই। বুঝিলাম এখন,—শাস্ত্রের

বিতর্ক সব ভুয়াবাজীমাত্র,—কিছুতেই কিছু নাই,—বিশ্বাসই পরম পদার্থ,—বিশ্বাসই মূলমন্ত্র,—আপনাপন ইষ্টমন্ত্রে নির্ভর করাই সুবিজ্ঞের কার্য্য। মা দয়াময়ি! দীনতারিণী! জ্ঞান-গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারিণী কালিকে! এই অধম জ্ঞানান্ধের মনের ধন্ধ অপনোদিত কর মা! বুঝিলাম! তুমি জ্ঞানের অগোচরা,—শাস্ত্র ঘাটিয়া তোমার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে যাওয়া বাতুলের কার্য্য। হে অজ্ঞান-নাশিনি! আমার জ্ঞানের গর্ব্ব, পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব সব চূর্ণীকৃত হইয়াছে, এক্ষণে অবোধ সন্তান—অজ্ঞান তনয়, কি উপায়ে তোমার অভয় চরণ সরোজে স্থান পাইবে বলিয়া দাও।"

বাসুদেব বুঝিয়াছেন, এতদিন যে কেবল শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন—তাহা বৃথা, ভগবানকে পাইতে হইলে কেবল শাস্ত্রপাঠ করিলে চলিবে না। বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল করা চাই। বেশী লেখাপড়া শিখিলে অনেক সময় ঈশ্বর বিষয়ে নানা সন্দেহ উপস্থিত হয়। বাসুদেব শাস্ত্রীর তাহাই হইয়াছে। একথা বাসুদেব এখন নিজেই স্বীকার করেন। তদীয় শিষ্যগণ অনেকেই সংসারের ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। কিন্তু হায়! তাঁহার পরিণাম কি হইবে ভাবিয়া বাসুদেব আকুল হইলেন।

"হায়! ব্রহ্মচর্য্য লাভের পর সংসারী হইলাম, কিন্তু সে সংসার আমার বেশী দিন সহ্য হইল না। একটী মাত্র কন্যা-রত্ন প্রসবের পর গৃহিণী ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। নিজে মাতৃস্থানীয়া হইয়া কন্যাটীকে ছয় বৎসরের করিলাম, কিন্তু কোন্ দুরাত্মা তাহাকে ফাঁকি দিয়া লইয়া গেল।"

যতদিন কন্যাটী অপহৃত হয় নাই, ততদিন বাসুদেব সংসারে ছিলেন, তারপর তিনি অরণ্যবাসী হইয়াছিলেন,কেবল নীলরতনের

গুণে মুগ্ধ হইয়া এতদিন নদীয়ায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার আদিম বাসস্থান কোথায়—তাহা কেহ জানে না। বাসুদেব বিবাহের পূর্ব্বেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, পরে পত্নীর মৃত্যু ও কন্যার অদর্শনে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেন, নানাবিধ শাস্ত্রপাঠে দিন কাটাইতেন। নীলরতন সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া নিকটে রাখিয়াছিলেন। গুরু শিষ্যে ঠিক পিতা পুত্রের মত সদ্ভাব ছিল। তজ্জন্য সংসার-বিরাগী বাসুদেবও মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে নীলরতনের অভাবে আর তাঁহার কিছু ভাল লাগিতেছে না। এইজন্য যত শীঘ্র পারেন, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া স্বকার্য্যে ব্রতী হইবেন, ইহাই স্থির করিয়া শুভ দিনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যাহাতে মায়ার হস্ত হইতে একেবারে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন, প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চৈতন্য সঞ্চার।

ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, বাঙ্গালার শেষ নবাব সিরাজুদ্দৌলা বড় দুর্দ্দান্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি যতই দুর্দ্দান্ত থাকুন না কেন, কোন ধর্ম্মকেই তিনি হতাদর করিতেন না, কোন ধর্ম্মের অমর্য্যাদা করিয়া তিনি কায করিতেন না। ইহা তাঁহার একটী মহৎ গুণ ছিল। তিনি জানিতেন এবং মানিতেন যে, যে রাজত্বে সাধক এবং পণ্ডিত ব্যক্তির অধিষ্ঠান না থাকে, সে রাজার রাজত্ব শ্মশান অপেক্ষাও কঠিন। এই জন্য নবাব বাহাদুর তদানীন্তন শাক্ত-ভক্ত শ্রীরামপ্রসাদ ও বৈষ্ণবচূড়ামণি আজব গোঁসাইয়ের বিশেষ সম্মান করিতেন এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য পণ্ডিতপ্রবর বাসুদেব শাস্ত্রীকে তিনি একমাত্র প্রধান পণ্ডিত বলিয়া জানিতেন। এইজন্য তিনি অনেক সময়েই এই সকল মহাত্মাগণের সঙ্গলাভ করিতে ইচ্ছা করিতেন। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ অনেক সময়েই তরণী আরোহণ করতঃ দীনতারিণীর নাম করিয়া গঙ্গাবক্ষ মুখরিত করিয়া তুলিতেন! নবাব যদি সেই সময় সলিল-শীকরবাহী সুশীতল বায়ু সেবনে নদীবক্ষে বজরারোহণে বাহির হইতেন, তবে প্রসাদের সেই প্রাণমাতান, ভক্তিবিমিশ্রিত রাগিণী শ্রুতিগোচর হইলে তখনই বজরা ফিরাইয়া প্রসাদের অনুধাবন করিতেন বা তাঁহাকে নিজের বজরায় তুলিয়া লইতেন।

বাসুদেব শাস্ত্রী প্রথমতঃ আজয় গোস্বামীর শিষত্ব গ্রহণ করিয়া যদিও গোস্বামী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন—কিন্তু তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না, তিনি শক্তিমন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তারপর তিনি নীলরতনকে প্রধান শিষ্যপদে বরিত করিয়া নদীয়ায় আসিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপনের পর হইতে "বামদেব" শাস্ত্রী বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। পাঠক! এখন হইতে আমরা তাঁহাকে বামদেব বলিয়াই অভিহিত করিব।

সাধনমার্গে উত্তীর্ণ হইয়া ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করিতে ইচ্ছা হইলে, হৃদয়ে অকপট সরল বিশ্বাস থাকা আবশ্যক, বিশ্বাস ব্যতীত ভগবানের দর্শনলাভ হওয়া অসম্ভব। আজীবন নানা শাস্ত্রপাঠ করিয়া কেবল যুক্তিতর্কের অধীন সাধক কখনই ইষ্ট সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। অতিরিক্ত শাস্ত্রপাঠী হইলে তাঁহার মনে অহঙ্কার আসিয়া উপস্থিত হইবে, কোন বিষয়েই তিনি সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন না। বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দৃঢ়ব্রত হইতে না পারিলে, সেই প্রাণের দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করাও সুদূর পরাহত। এই জন্য কথায় বলে—"বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।" উত্তানপাদনন্দন পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুবের কি শাস্ত্র জ্ঞান ছিল? যদি সে মাতৃবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস না করিত, তাহা হইলে কি সেই তপস্যার ধন পদ্মপলাশলোচনের দর্শনলাভ করিয়া চরিতার্থ হইতে পারিত? এই জন্য বলি সাধনমার্গে সমুত্তীর্ণ হইতে হইলে বিশ্বাসই মূলাধার, অজস্র শাস্ত্রপাঠে সে দুর্লভ ধন লাভ করিতে পারা যায় না। ইহাতে কেবল অহঙ্কার, মাৎসর্য্য বর্দ্ধিত হয় মাত্র, কাযে কিছুই অগ্রসর হওয়া যায় না।

বামদেব শাস্ত্রী আজীবন নানা শাস্ত্র পাঠে সকল বিষয়েই অবিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঈশ্বর বিষয়ে তিনি কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না। পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ তিনি সমস্তই করিতেন, কিন্তু প্রকৃত বিষয়ে অভ্যস্ত না থাকায় তিনি লাভ-মূলে সমস্ত নষ্ট করিয়াছিলেন। সাধকপ্রবর আজব গোস্বামীর নিকট হইতে চলিয়া আসার পর হইতে তিনি নানা তীর্থে, নানা সাধুর নিকট উপদেশ লইয়াছিলেন, কিন্তু আসল বিষয়ে তিনি কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন অনেক সময়ে তাঁহার আশ্রমে পদার্পণ করিয়া মাতৃনামামৃত তাঁহার কর্ণে প্রদান করিতেন; সে গানে বালক নলিনাক্ষের হৃদয় গলিয়া যাইত, কিন্তু শাস্ত্রীর শাস্ত্রজ্ঞান তাহাকে কূটতর্কজালে আবদ্ধ করিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দিত। তর্ক উপস্থিত হইত—"ব্রাহ্মণ সন্তান বৈদ্যের দ্বারা দীক্ষিত হইবে কি - বৈদ্য কি ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারে? বিশেষতঃ রামপ্রসাদ শাস্ত্রের কি জানে।" হায়! ব্রাহ্মণ জানে না যে, প্রসাদের হৃদয়ে যে জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রদীপ প্রজ্বলিত রহিয়াছে, শাস্ত্রপাঠে তাহার বিন্দুমাত্র লাভ হইতে পারে না। সরল-বিশ্বাসী নলিনাক্ষ কিন্তু সে নামে গলিয়া যাইত, বিরলে প্রেমাশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিত।

অহঙ্কারী বামদেবের উপদেশ শিষ্যগণের যথেষ্ট উন্নতি হইত। তাঁহার উপদেশে শিষ্যগণের যারপর নাই আত্মোন্নতির সম্ভাবনা হইয়াছিল, কিন্তু নিজের কিছুই হইল না, আজীবন কাদা ঘাটাই সার হইল, মাছ ধরা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। প্রিয় শিষ্য নীলরতনের মৃত্যু সময়ের অবস্থা দেখিয়া, মৃত্যুর

প্রাক্কালে তাঁহার সেই প্রাণ-মাতান নামগান শ্রবণ করিয়া সাশ্রুনয়নে ভগবানের প্রতি আত্মনিবেদন, অমিয়-মধুর প্রার্থনা গীতি শ্রবণ করিয়া বামদেব কিন্তু দ্রবীভূত হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার মনে যেন কেমন এক বিবেক ভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই তিনি যেন সদা সর্ব্বদা কেমন বিমনা হইয়া থাকিতেন।

এইরূপে আরও কিছুদিন গত হইলে, একদিন তাঁহার গুরু আজব গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে সংবাদ আসিল, যে তিনি সাংঘাতিকরূপে পীড়িত। তাঁহার দেহ রাখিবার ইচ্ছা হইয়াছে। এই সময় একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করেন। বামদেব শ্রবণ মাত্রেই তাঁহার পাদপদ্ম দর্শনার্থ গমন করিলেন। গোস্বামী মহাশয় পতিতপাবনী ভাগীরথী তীরে দেহ রক্ষার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। যাইবা মাত্রই বামদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মৃত্যু সময়ে তিনি শিষ্যকে বিশ্বাস দৃঢ় করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন "বামদেব! তুমি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বটে, কিন্তু হৃদয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলে মানব জীবনের উদ্দেশ্য কিছুতেই সিদ্ধি করিতে পারিবে না বিশ্বাসই জীবগণের ভবকারা মোচনের একমাত্র উপায়; বিশ্বাস ব্যতীত যাতায়াত নিবারণের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তুমি বিশ্বাসী হইয়াছ শুনিলে, আমি সুখে মরিব।" বামদেব একাগ্র চিত্তে সমস্ত শ্রবণ করিলেন এবং গোস্বামীর পদস্পর্শ করিয়া বলিলেন—"গুরো! আজ হইতে আমার সমস্ত ভ্রম অপনয়ন হইল, পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করিলাম, আজ হইতে আপনার বামদেব প্রগাঢ় বিশ্বাসের সহিত পরকালের পথ মুক্ত করিতে প্রস্তুত হইল।"

আজব গোস্বামী "শান্তি, শান্তি" রবে আনন্দে মত্ত হইলেন এবং কয়েকদিন মাত্র গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়া বৈষ্ণবচূড়ামণি ধরাধাম হইতে মহাপ্রস্থান করিলেন।

বামদেবের যেন অকস্মাৎ হৃদয়পঞ্জর ভাঙ্গিয়া গেল। প্রিয় শিষ্য নীলরতনের মৃত্যুতে তিনি পৃথিবীর নশ্বরত্ব কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে গুরুদেবের মৃত্যুতে তাহা সুদৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। গুরুদেবের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বামদেব নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এখন বামদেব আর সে বামদেব নাই। তাঁহাকে দেখিলেই তাঁহার যে দৈহিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার অকস্মাৎ এই ঘোর পরিবর্ত্তন দেখিয়া শিষ্য-মণ্ডলী স্তম্ভিত ও ভীত হইল। গুরুদেবের সে উগ্রভাব আর নাই! সে অহঙ্কার, সে অভিমান যেন বামদেবকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে। গুরুর এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলেই নানা জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাগমন।

আজ কয়েক দিন হইল, বামদেব চতুষ্পাঠীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। অনেকগুলি ছাত্র তাঁহার এই চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিত। পাঠার্থী ছাত্রবৃন্দের মধ্যে নলিনাক্ষই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল। নলিনাক্ষের বুদ্ধিবৃত্তি এবং প্রতিভা যেরূপ অসামান্য ছিল, প্রকৃতিও সেইরূপ নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিল। একাধারে মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইলে যেরূপ প্রীতিকর দেখায়, বিদ্যা ও গুণের একত্র সন্নিবেশে ভগবান তাঁহাকেও সেইরূপ প্রিয়দর্শন করিয়াছিলেন। বালক শিক্ষাগুরুকে সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত, গুরুও তাহাকে হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ দেখিলেন, এক্ষণে আর বৃথাকাযে জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করা আত্মবঞ্চকের কার্য্য। বহুদিন হইতে তিনি চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আর এরূপে কালহরণ করা কর্ত্তব্য নহে, সমস্ত জঞ্জাল মিটাইয়া এখন ঈশ্বরের চিন্তা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, তিনি একে একে সকল ছাত্রকেই বিদায় দিতে লাগিলেন। নলিনাক্ষকে তিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিতেন, সুতরাং তাহার নিকট হইতে বিদায় লইতে তাঁহার

বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু কি করিবেন, সে নিকটে থাকিলে পাছে তাঁহার বাঞ্ছিত বিষয়ে কোন প্রকারে বাধা পড়ে, এই ভয়ে অবশেষে তাঁহাকেও বিদায় দেওয়া শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ নলিনাক্ষকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ বৎস! আমি ক্রমশঃ বার্দ্ধক্য সীমায় উপনীত হইতেছি, চিরদিন পার্থিব বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকা অবিবেচকের কার্য্য; অনিত্য জগত, অনিত্য দেহ! অনিত্য ভবসাগরে আমরা এক একটি অনিত্য জলবিম্ব,—কখন আছি—কখন নাই—কে বলিতে পারে? বৎস! আমার অনিত্য জীবনের অসার লীলা খেলা ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিতেছে, এই সময়ে পরকালের পথ দেখা শাস্ত্রানুমোদিত; এজন্য আমি ইচ্ছা করিতেছি, এখন ইহাতে যথাসম্ভব পার্থিব সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া, অবহিত চিত্তে ঈশ্বর চিন্তায় জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিব। বৎস! সত্য কথা বলিলে পক্ষপাত দোষে দূষিত হইতে হয়, নচেৎ আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, সকল ছাত্র অপেক্ষা তোমাকে আমি অধিক স্নেহ করি। আমি একে একে সকল ছাত্রের নিকটেই অবসর গ্রহণ করিয়াছি, অতঃপর তোমার নিকটেও অবসর চাহিতেছি। ভগবানের কৃপায় তুমি আমার নিকট যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছ, তদ্দ্বারা অবলীলাক্রমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। আশীর্ব্বাদ করি—তুমি চিরজীবী হও, এবং ধর্ম্মপথে লক্ষ্য রাখিয়া পরম সুখে কালযাপন কর।"

একে একে সকলে বিদায় হইবার সময়ে নলিনাক্ষ মনে করিয়াছিলেন, গুরু আমাকে ত্যাগ করিবেন না। এক্ষণে

বামদেবের মুখে এই নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"গুরো! আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাই আজ আপনার কাছে এই হৃদয়-ভেদী কথা শুনিতে হইল। শিশুকাল হইতে ভগবান আমাকে পিতৃ মাতৃ-স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, পূজনীয় স্বর্গীয় পিতৃতুল্য মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও তদীয় দেবীরূপিণী পত্নীর কৃপায় অপগণ্ড অবস্থা হইতে মানুষ হইয়াছি, তাঁহারাও চিরদিনের জন্য এ অধমকে ছাড়িয়া স্বর্গগত হইয়াছেন। তারপর আপনার নিকটে আসিয়া অবধি একদিনও আমার তাঁহাদিগকে মনে পড়ে নাই। আমি যে পিতৃমাতৃহীন, আপনার অকৃত্রিম স্নেহে তাহা মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিবার অবকাশ পাই নাই। হায়! আজ হইতে আমাকে যথার্থই পিতৃ-মাতৃহীন হইতে হইল। যাহা হউক গুরো! সে জন্য আর পরিতাপ করিয়া ফল নাই। আমি আত্মসুখের জন্য আপনার অভীপ্সিত পথে কণ্টক প্রদান করিতে চাহি না। কর্ম্মফল ভোগ অনিবার্য্য,—জগদীশ্বর আমার অদৃষ্টলিপি যেরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন;—তাহা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু অধম আমি, আশৈশব আপনার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া,—আশৈশব আপনার নিকটে অশেষ উপদেশরত্ন লাভ করিয়া, সামান্য পরিমাণেও আপনার উপকার করিতে পারিলাম না, এই দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। গুরো! আপনার ত কিছুই অজ্ঞাত নাই,—আপনি ত সকলই জানেন, আমার ন্যায় নিরাশ্রয়, অনাথ এ মহীমণ্ডলে দুর্লক্ষ্য। গুরো! এ দীন হীনের দ্বারা যে আপনার কোন বিশিষ্ট উপকার হইবে, সে সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র নাই। আমি জানি অনন্ত জীবনেও

গুরুর ঋণ অপরিশোধ্য; কে কবে গুরুর ঋণ পরিশোধ করিতে পারিয়াছে? তথাপি গুরো! আমার একান্ত অভিলাষ অধমের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া আমার কায়িক শ্রমলব্ধ কিঞ্চিৎ দক্ষিণা গ্রহণে আমার জীবন সার্থক করুন। ছাত্র নলিনাক্ষের অগাধ গুরুভক্তি, ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাপরই বিদিত ছিলেন। এক্ষণে তাহার ভক্তির অটলতা, লোকাতীত কৃতজ্ঞতা এবং অপূর্ব্ব সরলহৃদয়তা দর্শনে মোহিত হইয়া গেলেন,—জানি না, তাঁহার মনে কি এক অভিনব ভাবের আবির্ভাব হইল। অভ্রাপসৃত শশধরবৎ তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট বদনমণ্ডলে সহসা হর্ষের বিমল বিভা বিকীর্ণ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—বুঝিবা এই বালকের দ্বারাই জগদম্বা তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। যাহা হউক, অতঃপর, তিনি মনোভিপ্রায় কিছুমাত্র পরিস্ফুট না করিয়া বলিলেন,—"বৎস নলিনাক্ষ! তোমার ন্যায় পূত-চরিত্র বালক এ সংসারে দুষ্প্রাপ্য, তোমার সদিচ্ছা প্রণোদিত বাক্যে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, জগদীশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। যদি গুরুদক্ষিণা দানে তোমার একান্তই অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে তুমি আমার একটী কার্য্য করিতে পার। সেই কার্য্যটি তোমার দ্বারা সম্পন্ন হইলে, আমি বড়ই উপকৃত হইব।"

নলিনাক্ষ। বলুন গুরো! এ দাসকে কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে? আদেশ প্রাপ্ত হইলে এ দাস কৃতার্থ হয়।

ব্রাহ্মণ। বৎস! আমার কার্য্যটী বড়ই গুরুতর, বড়ই শ্রমসাধ্য,—বালক তুমি, তোমার দ্বারা তাহা সম্পন্ন হওয়া দুরূহ বিবেচনায় প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছি।

নলিনাক্ষ। অকুণ্ঠিতচিত্তে বলুন গুরো! সাধ্যের অতীত হইলেও তৎসাধনকল্পে কখনই পরাঙ্মুখ হইব না। অথবা যদি সেই কার্য্য-সাধনে আমার জীবন প্রদানেরও আবশ্যক থাকে, তাহাও অম্লান বদনে দিতে প্রস্তুত আছি, এই কৃমি-কীট-ভোজ্য নশ্বরজীবন গুরুর চরণে উৎসর্গীকৃত করিয়া জন্ম সফল করি।

ব্রাহ্মণ। বৎস! ধৈর্য্যাবলম্বন কর, জীবন পণ করিবার আবশ্যকতা নাই। তবে সেই কার্য্যটি সাধন করিতে, একটু কঠোরতা, একটু একাগ্রতা, একটু ক্লেশ সহিষ্ণুতা এবং একটু ধৈর্য্যশীলতার প্রয়োজন দেখিতেছি, এ সকল গুণ তোমার প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, সুতরাং তোমার দ্বারা সে কার্য্যটি সম্পন্ন হইলেও হইতে পারে।

ব্রাহ্মণ নিরুত্তর হইলেন। তাঁহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া নলিনাক্ষ বলিল, "গুরুদেব! মৌন হইয়া রহিলেন কেন? দয়া করিয়া অভিলষিত বিষয় ব্যক্ত করুন।"

ব্রাহ্মণ। বৎস! বলিব কি, সে বড় কঠিন বিষয়। কোন মহাপুরুষের কৃপায় আমি, একটী কন্যারত্ন লাভ করিয়াছিলাম, বহুদিন গত হইল আমি সেই কন্যারত্নটি, সেই একমাত্র প্রাণের তনয়টি কপালদোষে হারাইয়াছি। আমার সেই প্রাণাধিকা নন্দিনী অদৃশ্য হওয়ার পর,—কতদিন, কত বৎসর গত হইল আর তাহার কোন সন্ধানই পাই নাই। বৎস! তাহার অনুসন্ধান জন্য, এই প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করি নাই, কত গ্রহ পূজা, শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়াছি, তাহার সন্ধানের আশা প্রদান করিয়া যে যাহা বলিয়াছে,

তাহাই করিয়াছি, কিন্তু হায়! আমার এম্নি দুরদৃষ্ট কিছুতেই কিছু হয় নাই। বৎস! আশা করিয়াছিলাম, হয়ত কোন না কোন সময়ে তাহার সাক্ষাৎ পাইব, কিন্তু এক্ষণে ক্রমশঃ সে আশায় নৈরাশ হইয়া পড়িতেছি। প্রাচীনদেহ, ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সমূহ দিন দিন অল্পে অল্পে শিথিল ও অবসন্ন হইয়া আসিতেছে,—জানি না কোন্ দিন প্রাণ-পক্ষী দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে। তাই বলিতেছি, বৎস! বুঝি এ জীবনে আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

নলিনাক্ষ। গুরুদেব! আমাকে কি আপনার সেই নিরুদ্দিষ্টা কন্যাটীর উদ্দেশ করিতে হইবে? গুরো! এ ত আমার পরম সৌভাগ্যের কথা,- এ কথা প্রকাশে এত ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন? দাসকে অনুমতি প্রদান করুন, যদি আপনার শ্রীপাদ-পদ্মে আমার যথার্থ ভক্তি থাকে, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার উদ্দেশ পাইব।

ব্রাহ্মণ। হাঁ বৎস! তোমার অনুমান যথার্থ হইয়াছে, আমার সেই নিরুদ্দিষ্টা কন্যাটির অনুসন্ধানের ভার তোমাকে অর্পণ করিবার মানস করিয়াছি। তুমি প্রথমে নীলরতনের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞতা পাশ হইতে মুক্ত হও, তার পর আমার কার্য্যে মনোনিবেশ করিও।

নলিনাক্ষ। গুরুদেব! আপনার আদেশে দাস আজ ধন্য হইল! নিশ্চয়ই আমি আপনার কন্যার অনুসন্ধানে বহির্গত হইব,—যতদিন জীবিত থাকিব প্রাণপণে অনুসন্ধান করিব, কিন্তু আমার অনুসন্ধান সৌকর্য্যার্থে আপনার কাছে তিনটি বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে।

ব্রাহ্মণ। বৎস! তোমার যে যে বিষয় জিজ্ঞাস্য থাকে, অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রকাশ কর।

নলিনাক্ষ। আপনার কন্যার নাম, রূপ এবং বয়সের পরিমাণ, জানিতে ইচ্ছা করি।

ব্রাহ্মণ। যথার্থ কথা বলিয়াছ। বৎস! আমার কন্যার অনেকগুলি নাম আছে, তন্মধ্যে প্রধানতঃ আমি তাহাকে "শ্যামা" নামে ডাকিতাম, অতএব তুমিও ঐ নামে তাহার অনুসন্ধান করিও। তোমার প্রশ্নের উত্তর একটু চিন্তাসাপেক্ষ,—বহুদিনের কথা। বৎস! রূপটি যেন ঠিক মনে পড়িতেছে না, নিতান্ত শৈশবের দেখা; তবে শুনিয়াছি, তাহার রূপের নাকি সীমা নাই। ইদানীং যে সকল লোক তাহাকে দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহারা বলেন, মেয়েটি নানারূপ ধারণ করিয়া কোন সাধকের সহিত চারিদিক ভ্রমণ করিতেছে। বৎস! তাহার স্বরূপ রূপ কিরূপ আজ পর্য্যন্ত কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। লোকে বলে মেয়েটি বহু-রূপিণী।

নলি। তবে ত বড় বিষম সমস্যা দেখিতেছি। আপনার কন্যার প্রকৃত রূপ না জানিতে পারিলে কিরূপে অনুসন্ধান করিব, তাঁহার কি একটা স্বাভাবিক রূপ নাই।

ব্রা। আছে বই কি বৎস! অবশ্যই আছে! একটু অপেক্ষা কর আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিতেছি, -হাঁ হাঁ। বৎস! এইবার ঠিক মনে পড়িয়াছে,—এইবার আমি তাহার প্রকৃত রূপটি বলিয়া দিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। বৎস! আমার কন্যার রূপ স্বভাবতঃই কৃষ্ণবর্ণ; শারদ পৌর্ণমাসী রজনীতে নভোমণ্ডলের সুদূরপ্রান্ত হইতে যেরূপ মধুরোজ্জ্বল কমনীয়

কৃষ্ণাভ বিচ্ছুরিত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ অথবা ঘোরান্ধকারময়ী রজনীতে বিদ্যুদ্দামবিলসিত বর্ষণোন্মুখ বারিদবক্ষ হইতে যেরূপ অনির্ব্বচনীয়প্রভা উদ্গীর্ণ হয় সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ। নিবিড় কৃষ্ণ কাদম্বিনী কোলে যুগপৎ কোটী কোটী বিদ্যুদ্বিচ্ছুরিত হইলে তাহার রমণীয়তা যেমন অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করে, আমার মেয়ের কাল অঙ্গে যেন সেইরূপ রূপরাশি অনুক্ষণ বিরাজমান রহিয়াছে। তাহার নীল-নীরদ-নির্ম্মিত নিবিড় কুন্তলকলাপ আলুলায়িত অবস্থায় সতত ধরণীতল স্পর্শ করিয়া থাকে। সুবর্ণাদি রত্নালঙ্কারে তাহার কখনই স্পৃহা নাই, সর্ব্বদা নরকর শির-নিকর-নির্ম্মিত আভরণ সর্ব্বাঙ্গে পরিধান করিয়া থাকে। শৈশব হইতে সে কখনও বস্ত্র পরিধান করে নাই, সর্ব্বদা নগ্নাবস্থায় থাকিত, এজন্য কেহ কেহ তাহাকে দিগম্বরী বলিয়াও সম্বোধন করিত। ভূমিষ্ঠ হইবার সময়, তাহার চারিটি হস্ত এবং তিনটী নয়ন দেখা গিয়াছিল, শুনিতে পাই এখনও তাহার সেইরূপ আকৃতি আছে, কেহ কেহ বলেন, সে নাকি সেই চতুর্হস্তের দক্ষিণের দুইটিতে বরাভয় এবং বামদিকের দুইটিতে উলঙ্গ কৃপাণ ও ছিন্নশির ধারণ করিয়া থাকে। বৎস! এই আমার কন্যার রূপ; তুমি অনন্যচিত্ত হইয়া এইরূপ আকৃতি-বিশিষ্টা কামিনীর অনুসন্ধান করিও।

গুরুদেবের শ্রীমুখাৎ তদীয় কন্যার রূপ বর্ণনা শুনিতে শুনিতে নলিনাক্ষের দেহ কণ্টকিত, নেত্রযুগল প্রেমধারা পরিপূর্ণ হইল। গুরুদেবের মুখ্য উদ্দেশ্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। বামদেব তাহার প্রতি বাম হইয়া যে প্রকৃত কাম্যবস্তু লাভের আশা করিতেছেন। প্রকারান্তরে সাধনপথে অগ্রসর হইবার

জন্য যে তাহার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিতেছেন, নলিনাক্ষের তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। তথাপি তিনি যেমন গোপন করিয়া বালকের ন্যায় শিক্ষা দিতেছেন, নলিনাক্ষও ঠিক সেইরূপ ভাবেই বলিলেন—"আহা গুরুদেব! আপনার কন্যার রূপ বড়ই অদ্ভুত, বড়ই বিচিত্র। মরি মরি! এ রূপের কি আর তুলনা আছে। গুরো! এক্ষণে তাঁহার বয়সের কথা বলিয়া ঔৎসুক্য দূর করুন। মধুচক্রে যতই লগুড়াঘাত করা যায় তাহা হইতে ততই রসনা তৃপ্তিকর মধু বিনির্গত হইয়া থাকে। নলিনাক্ষ তাই ব্যাপার বুঝিতে গুরুদেবকে ঘাটাইতে লাগিলেন।

ব্রা। বৎস! তাহার বয়সের পরিমাণটা ঠিক করিয়া বলা কঠিন দেখিতেছি, বহুদিনের কথা কিছু স্মৃতিপথে আসিতেছে না। যাহা হউক, ইহার জন্য তোমার চিন্তার কোনই কারণ নাই, বয়সের পরিমাণ জানা না থাকিলেও তোমার আসল কার্য্যের কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটিবে না, আমার কন্যার রূপের এম্নি একটা অদ্ভুত লালিত্য আছে যে দেখিলেই বোধ হয়, যেন তাহার বয়স ষোড়শ বর্ষের উর্দ্ধগত হয় নাই। এইত বৎস! তোমার তিনটি প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ করিলে; এক্ষণে আর কোনও বিষয় জানিবার প্রয়োজন থাকিলে বলিতে পার।

নলি। না গুরুদেব! আর আমার কিছুই জ্ঞাতব্য নাই, এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন বাসনা পূর্ণ হয়।

ব্রাহ্মণ কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন। নলিনাক্ষ আচার্য্য চরণে প্রণত হইয়া সেদিনকার মত পুষ্পচয়নের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গা-তীরে।

দারুণ গ্রীষ্মে প্রকৃতি সুন্দরী মুহ্যমান হইয়াছেন। গ্রীষ্মের প্রকোপে সমস্ত রজনী জীবকুল কেহই সুস্থভাবে নিদ্রা যাইতে পারে নাই। রজনী চন্দ্রমাশালিনী হইলেও সমীর সঞ্চালন একে-বারে বন্ধ হইয়াছিল, কাযেই বহুকষ্টে রাত্রি শেষ করিল। উষা-কালে ধীরে ধীরে শীতল বাতাস বহিতে লাগিল। চন্দ্রদেব যেন অবকাশ গ্রহণ মানসে হীনপ্রভ হইতে লাগিলেন। ভাগীরথী তীর এখনও জন-মানব শূন্য। উপরে উদার অনন্ত আকাশ একবার করিয়া মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে, আবার বায়ু সঞ্চালনে তাহা অপসারিত হইয়া জাহ্নবী শ্বেত সলিল চন্দ্র-কিরণ-ধৌত হইয়া আরও শ্বেত বর্ণ ধারণ করিতেছে। সেই অসীম বিস্তৃতা জাহ্নবী সাদা বসনে আবৃতা হইয়া, সাদা জল বুকে করিয়া কল কল নাদে সাগরো-দ্দেশে ছুটিয়াছেন। দুই পার্শ্বে ঘন বৃক্ষরাজী শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায় মিশিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান, তাহারাও যেন সাদা বসন পরিয়া হাস্য-আস্যে জাহ্নবীর লীলা খেলা পরিদর্শন করি-তেছে। চন্দ্রদেব আর থাকিতে পারিলেন না, সমস্ত রাত্রির অনিদ্রাজনিত অবসাদে অবসন্ন হইয়া লোকলোচনের বহির্ভুক্ত হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বদিক রক্তিম রাগে রঞ্জিত হইল।

ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে অবগাহন করিবার এই প্রকৃত

সময় বুঝিয়া গঙ্গাতীরে লোক সমাগম হইতে লাগিল। নদীয়ার বাঁধাঘাটে এখন কাহারও সাড়া শব্দ নাই, কেবল জনৈক সাধু কমণ্ডলু হস্তে দেবীর স্তবপাঠ করিতে করিতে তীরে আসিয়া উপবেশন করিলেন। ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে, সাশ্রু-নয়নে ভক্তের মুখে সেই ভক্তি-মাখা গঙ্গার মহিমা শ্রবণ করিলে অতি বড় পাষণ্ডও তন্ময় হইয়া যায়। সমীরণ সাধুর সেই পবিত্র স্বরলহরী দিগন্তে বহন করিয়া চারিদিক পবিত্র করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী এইবার প্রাতঃস্নান করিতে পতিতোদ্ধারিণীর পবিত্র সলিলে অবগাহন করিলেন। একটী তাপস-যুবক নানাবিধ পুষ্পপূর্ণ সাজি লইয়া আসিয়া গুরুর অপেক্ষা করিতে লাগিল, তখন বালার্ক-কিরণ পূর্ব্ব গগনে প্রকাশমান হইয়াছে। তরুণ অরুণ কিরণে যেমন জ্যোতিঃ আছে, কঠোরতা নাই, সৌন্দর্য্যে প্রাণ মোহিত হয় অথচ তীব্রতা নাই, যুবকের রূপও তদ্রূপ, বালার্ক কিরণে যেন রূপের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিল— তাহাতে কোন কঠোরতা, কোন তীব্রতা নাই। উজ্জল জ্যোতিঃবিশিষ্ট কমনীয়তার আধার। ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে দেহের পরিপুষ্টি ও সৌন্দর্য্য যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। যুবকের পরিধানে একখানি গৈরিক বসন, তদুপযোগী একখানি উত্তরীয় স্কন্ধে ন্যস্ত; ঘনকৃষ্ণ কেশগুলি এখনও জটাযুক্ত হয় নাই; তবে স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিলম্বিত হইয়া রূপের জ্যোতিঃ দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত করিয়াছে। সেই কমনীয় কান্তিবিশিষ্ট যুবককে দেখিলে স্বতঃই ভালবাসিতে, তাঁহার সহিত একত্র থাকিয়া সদালাপ করিতে ইচ্ছা হয়।

বৃদ্ধ স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া গঙ্গাদেবীর পূজা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে যুবকও স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া লই-

লেন। গঙ্গাতীরে প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া উভয়ে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পাঠক!, আপনারা কি এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ও তাপস যুবককে চিনিতে পারিয়াছেন? ইঁহারা আমাদেরই চির পরিচিত বামদেব ও নলিনাক্ষ। গুরুদেবের মৃত্যুর পর হইতে বামদেব ধর্ম্মে অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। সাধক-শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদকে তিনি পূর্ব্বে তাদৃশ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন না, কিন্তু এক্ষণে রামপ্রসাদই তাঁহার সাধন-মার্গের পথপ্রদর্শক হইয়াছেন। প্রায়ই তিনি শাক্ত-কবি রামপ্রসাদের নিকট হালিসহরে যাইতেন। বামদেব সংসারাশ্রমের প্রতি বড়ই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, সংসারে থাকিয়া যে সাধন-মার্গে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় না—ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু রামপ্রসাদের ক্রিয়া কলাপ দেখিয়া তাঁহার সে ভ্রম দূর হইয়াছে। এখন তিনি বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন সংসারাশ্রমই ধর্ম্ম শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র; এখানে থাকিয়া যিনি ধর্ম্মে মতিমান হইতে পারেন, অসংযতচিত্তে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিলে, তাঁহার কি ফলোদয় হইবে?

বামদেব চতুষ্পাঠীর কার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছেন কেবল নলিনাক্ষকে তিনি এখনও ছাড়িতে পারেন নাই। নলিনাক্ষকে যে তিনি বাল্যকাল হইতে পুত্রাধিক স্নেহে মানুষ করিয়াছেন, তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিয়া ধর্ম্মের সরল পথ প্রদর্শন করিয়া দিয়াছেন। নলিনাক্ষের প্রতি বামদেবের মায়া মমতার যে অবধি নাই, কেমন করিয়া তিনি তাঁহাকে এত শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। এই জন্য তিনি নলিনাক্ষকে সংসারী করিবার চেষ্টা করিতেছেন; নীলরতনের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়া

একেবারে এ স্থান পরিত্যাগ করিবেন—ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। কেবল মহামায়া এ বিষয়ে বাদ সাধিতেছেন—তাঁহার ইচ্ছা, ভ্রাতৃ-পুত্রীকে তাপসের হস্তে প্রদান না করিয়া কোন ধনীর পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে রাজরাণী করিয়া দিবেন। মহামায়া রমণী, তাঁহার ত তাদৃশ বুদ্ধি নাই; তিনি জানেন না যে—এ সকল কার্য্য কাহারও ইচ্ছায় হয় না - ইহা নিতান্তই অদৃষ্টাধীন। তিনি এখনও নানাস্থানে সম্বন্ধ করিয়া পাত্রের চেষ্টা করিতেছেন। ধনীর পুত্র পাইলে তিনি নীলরতনের প্রদত্ত বিষয় দিবেন এবং নিজের স্ত্রীধন হইতেও বহু অর্থ যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিবেন — কারণ তিনি নিরুপমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। যাহাতে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন সুখময় হয় মহামায়া নিজের সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াও তাহা করিতে ক্রুটী করিবেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে নলিনাক্ষকেই জামাতারূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই যে তিনি গুরু বামদেবকে তাহার শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন - ইহা তিনি জানিতেন না এবং এখন কেহ তাঁহাকে একথা বলিলেও বিশ্বাস করিতেন না; সে কথা যেন তাঁহার প্রাণে ভাল লাগিত না।

আজ কয়েকদিবস হইল গুরুদেব কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, দুইদিন বিলম্ব হইবে বলিয়া প্রায় সপ্তাহ অতীত হইল, তথাপি দেখা নাই। নলিনাক্ষ একাকী রহিয়াছেন। বামদেব গৃহে না থাকিলে নলিনাক্ষ অহোরাত্র ইষ্ট আরাধনায় কাটাইতেন। গুরুদেব গৃহে থাকিলে তাঁহার সেবাতেই সমস্ত দিবারাত্রি অতিবাহিত করিতেন। নলিনাক্ষ এত অল্প বয়সেই সাধনমার্গে এরূপ অগ্রসর হইয়াছিলেন, যে ভগবতীর নাম গান করিলে বা নামগান শ্রবণ

করিলে—অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইত। তাঁহার এইরূপ অমানুষিক শক্তি দেখিয়া সময়ে সময়ে সকলেই মোহিত হইত। নলিনাক্ষ বয়সে ছোট হইলেও তিনি এই সকল পবিত্র গুণে জন সাধারণের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন।

নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর ধার্ম্মিকপ্রবর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ায় একাধিপত্য বিস্তার করিলেন। নবাবের নিকট হইতে তিনি জমীদারী পত্তনী লইলেন। তাঁহার রাজত্বে প্রজাগণ অতীব সুখে কালযাপন করিতে লাগিল, কোন-রূপ পীড়ন বা অত্যাচার তাঁহার রাজত্বে ছিল না। মহারাজা গুণের আদর করিতে জানিতেন, গুণী ব্যক্তি তাঁহার নিকট দুঃখ জানাইলে মহারাজ প্রাণপণে তাহার প্রতিকার করিতেন। সাহিত্যসেবী, কবি, বা ধার্ম্মিকের আদর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ করিতেন, সেরূপ আর কেহ করিতে পারিবে না। ভারতের শ্রেষ্ঠ-কবি ভারতচন্দ্র ও সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কৃপালাভ করিতে না পারিলে, বোধ হয়—তাঁহাদের সৌভাগ্য এতদূর অগ্রসর হইতে পারিত না। তিনি শাস্ত্রপাঠী ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণকে অকাতরে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতঃ রাজ্যের শোভাবর্দ্ধন করিতেন। এই জন্য তিনি নবাব সরকারে রাজস্ব প্রদানের সময় অর্থের অনাটন প্রযুক্ত বড়ই নির্যাতন ভোগ করিতেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বামদেবকে ও তদীয় শিষ্য নলিনাক্ষকে বড়ই ভক্তি করিতেন। প্রত্যহই তাঁহা-দের তত্ত্বাবধারণ করিতে মহারাজা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অভাব অভিযোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন। প্রত্যহ রাজ-সরকার হইতে তাঁহাদের আহার্য্য প্রেরিত হইত।

মহারাজা রাজস্ব প্রদানের জন্য কয়েকদিন মুর্শিদাবাদ যাই-বেন। এইজন্য অদ্য তিনি সন্ধ্যাকালে বামদেবের তত্ত্ব লইতে আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে আশ্রমে দেখিতে না পাইয়া বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন। নলিনাক্ষকে তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না। নলিনাক্ষ মহারাজকে আসন প্রদান করিয়া বলিলেন,—"তিনি দুই দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিব বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু আজ অষ্টাহ হইল, তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।" কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন— "আপনাদের কি কোনরূপ কষ্ট হইতেছে; তাই প্রভু, সময়ে সময়ে স্থানান্তরে গমন করেন?"

নলিনাক্ষ। না মহারাজ! আমরা এখানে যার পর নাই সুখে আছি; তবে তিনি যে সময়ে সময়ে নিরুদ্দেশ হন, সে কেবল ধর্ম্মপিপাসা মিটাইবার জন্য। তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সাধুসঙ্গে কালাতিপাত করিতে তাঁহার বড়ই বাসনা হইয়াছে।

মহারাজ। তিনি সাধুগণকে সময়ে সময়ে এখানে আনিয়া আমার রাজত্ব পবিত্র করেন না কেন? তাহা হইলে ত আমি ধন্য হইতে পারি।

নলিনাক্ষ। মহারাজ! গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান কালে তাঁহার কন্যাটী কোন সন্ন্যাসী কোথায় লইয়া গিয়াছেন, তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। এই জন্যও তিনি সময়ে সময়ে নিজে তাহার সন্ধানে গমন করেন। আমাকেও তাঁহার সন্ধান করিতে বলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র। তবে তাঁহাকে এখানে রাখিয়া আপনি তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন না কেন?

নলিনাক্ষ। তিনি বলেন,—"বৎস! তোমাকে সংসারী করিয়া তবে এ কার্য্যের সম্পূর্ণ ভারার্পণ করিব। এখন আমি ত চেষ্টা করিতেছি, আমার কন্যা নিশ্চয়ই জীবিতা আছে। তাহার মৃত্যু যে হয় নাই ইহা সুনিশ্চয়, কারণ ব্রাহ্মণের পুত্র-কন্যা কখনই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে না।"

মহারাজ। অজ্ঞাতকুলশীল সন্ন্যাসী কেন তাঁহার কন্যাটীকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন, তাহার কারণ কিছু আপনার জানা আছে কি?

নলিনাক্ষ। স্ত্রীবিয়োগের পর গুরুদেব ঐ সন্ন্যাসীর হস্তে কন্যাটীকে অর্পণ করিয়া কিছু দিনের জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। যে সময়ের মধ্যে তাঁহার ফিরিয়া আসিবার কথা ছিল, তাহার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত না হওয়ায় সন্ন্যাসী কন্যাটীকে লইয়াই চলিয়া গিয়াছেন। তিনি গুরুদেবের গুরু-ভ্রাতা, এইজন্য অন্য কোন প্রকার ভয়ের কারণ নাই। তার পর গুরুদেব গৃহত্যাগ করিয়াছেন, কাযেই কন্যাটীর আর কোন প্রকারে সন্ধান হইতেছে না।

কৃষ্ণচন্দ্র। আচ্ছা আমিও এবার হইতে তাঁহার সন্ধানে থাকিব। দেখি যদি তাঁহার কিছু উপকার করিতে পারি।

নলিনাক্ষ। আপনি কবে প্রবাসে যাইবেন?

কৃষ্ণচন্দ্র। কল্য প্রাতঃকালেই রাজস্ব প্রদানের জন্য প্রবাসে যাইব। আমার অনুপস্থিতিতে আপনি অবসরক্রমে এক একবার রাজসভায় পদার্পণ করিয়া রাজ্যের তত্ত্বাবধারণ করিলে বাধিত হইব।

নলিনাক্ষ। মহারাজ! সেজন্য আর এত অনুনয় বিনয়

কেন, রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষা করা, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা ত ব্রাহ্মণেরই উচিত। আপনি আমাদের রক্ষা কর্ত্তা; আপনার সময়াসময়ে অবশ্য দেখিব—যেরূপে আপনার মঙ্গল হয়, তাহা অবশ্যই করিব। তজ্জন্য চিন্তা করিবেন না।

উভয়ে কথোপকথন করিতে করিতে রাত্রি অনেক হইল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আর কাল বিলম্ব না করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আশ্রম নির্জ্জন হইয়াছে দেখিয়া নলিনাক্ষও ইষ্ট-সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। রজনী যোগে দুই ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যাওয়া এবং একাহারী হওয়াই ব্রহ্মচারীর লক্ষণ, নলিনাক্ষ এ সকল নিয়ম প্রাণপণে প্রতিপালন করিতেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিপদে বন্ধু।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি। তখন ভারতে মুসলমান রাজত্বের প্রায় শেষ হইয়াছে। অনেক বৈদেশিক রাজাগণ ভারতে আসিয়া বাণিজ্য করিয়াছেন। ইংরাজ বণিকগণও তখন বাণিজ্য প্রভাবে ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। ভাগ্য-লক্ষ্মী চঞ্চলা হইলে মানবের যেমন দুর্ম্মতি উপস্থিত হয়, নবাবের মতিগতিও সেইরূপ হইয়াছিল। বিশেষতঃ সিরাজুদ্দৌলার ন্যায় অশিক্ষিত নবাবের অত্যাচারে এবং হটকারিতায় সকলেই বিরক্ত হইয়া ইংরাজের সহিত তাঁহার উচ্ছেদের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও ইংরাজের পক্ষ ছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে কোন প্রকারে তাঁহাদের সহিত যোগদান করিতেন না। তিনি সচেষ্টায় যতদূর পারেন—প্রজাগণের সুখশান্তি বৃদ্ধির জন্য প্রাণপণ করিতে লাগিলেন। যাহাতে রাজ্যে অশান্তি বৃদ্ধি হয়—ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ পায়, ইহা মহারাজের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। ধার্ম্মিক মহারাজা চিরশান্তিতে অবস্থান করিতেই ভালবাসিতেন। পাছে নবাব তাঁহার উপর সন্দেহ করেন, এই জন্য তিনি সময় থাকিতে অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে নবাব সরকারে খাজনা দাখিল করিয়া দিতেন, ইহাতে নবাব আর তাঁহার উপর কোন প্রকার অবিশ্বাসজনিত সন্দেহ করিতে পারিতেন না।

রাজস্ব প্রদানের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অদ্যই তাঁহাকে রওনা হইতে হইবে, কিন্তু কিছু টাকার অভাব হইয়াছে। কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। সকলে বলিল—"মহারাজ! কয়েকদিন অপেক্ষা করুন, এখনও ত সময় আছে?" কৃষ্ণচন্দ্র মনে করিলেন অপেক্ষা করিয়াই বা কি হইবে; এই কয় দিনের মধ্যে ত আর টাকা সংগ্রহ হইবে না; বরং নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বে যাইয়া নবাবকে অনুনয় বিনয় করিলে, যদি তিনি দয়া করেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি সেই দিনই দুর্গানাম স্মরণ করিয়া লোকজন সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন।

যথা সময়ে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া, তিনি নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যথোপযুক্ত অভিবাদন করিলেন। নবাব কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিয়া বলিলেন—"কেয়া কিষণচাঁদ! আচ্ছা হ্যায়?"

কৃষ্ণচন্দ্র পুনরপি সেলাম করিয়া বলিলেন—"হাঁ জাঁহাপনা! আপ্‌কা মেজাজ সরিপ?"

সিরাজুদ্দৌলা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"হাঁ আবি তক তো সব ঠিক হ্যায়।"

তাহার পর আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিষণ-চাঁদ রূপেয়া সব ঠিক লায়া ত?"

কৃষ্ণচন্দ্রের রাজস্ব দিবার সময় প্রতিবারই একটা না একটা গোলমাল হইত, প্রায়ই টাকার অনাটন হইত, এবারেও তাহাই হইয়াছে। মহারাজা বিষণ্ণ বদনে দণ্ডায়মান রহিলেন; কোনও কথা কহিলেন না—নবাব বুঝিতে পারিলেন এবং

কথঞ্চিৎ রাগান্বিত হইয়া বলিলেন—"হরঘড়ি হাম, এসা বাত নেই শুনেগা; কাহে তুমেরা রূপেয়াকা ঘাট্‌তি হোতা হায়? তুমারা জমিদারী বহুৎ বড়িয়া!"

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছল ছল নেত্রে বলিলেন-"হুজুর! আমার জমীদারী বড় হইলেও টাকা সমস্ত আদায় হয় না।"

নবাব। কাহে, আদায় সব নেহি হোতা, প্রজালোক কো ভাগায় দেও।

কৃষ্ণচন্দ্র। হুজুর! সে সকল ভাগিয়ে দিবার প্রজা নহে, আমি অনেক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছি; তাহাদের নিকট ত খাজনা আদায় হয় না।

নবাব। কাহে, ওসা মুফাৎসে দিয়া হায়।

কৃষ্ণচন্দ্র। খোদাবন্দ! ঐ সকল ব্রাহ্মণ বড়ই ধার্ম্মিক এবং ঈশ্বর-জানিত লোক; তাঁহারা সদাসর্ব্বদা হুজুরকে এবং আমাকে আশীর্ব্বাদ করেন।

অশিক্ষিত অহঙ্কারী সিরাজ এইবার রোষকষায়িত লোচনে বলিলেন—"কেয়া! হাম্‌কো আশীষ করনেকা আদমী কই হায়, হাম ত সের বরাবর আদমী! হাম্‌কো যো আশীষ করনে সেক্তা ও আদমী হামারা সেরকো ভি আশীষ করনে সেক্তা। বহুৎ আচ্ছা! ঐ আদমী কো বোলাও, হামারা সেরকো আশীষ করনে হোগা।"

নবাবের এই কথা শুনিয়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রমাদ গণিলেন। তিনি নবাবের মনস্তুষ্টির জন্য কি কথা বলিতে যাইয়া কি বিপদ ডাকিয়া আনিলেন। সিরাজুদ্দৌলার ন্যায় খেয়ালী নবাব বাঙ্গালার সিংহাসনে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও উপবিষ্ট হয়

নাই। তাঁহার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই, তিনি অম্লানবদনে বলিয়া বসিলেন—"আমাকে যে আশীর্ব্বাদ করিতে পারে, বন্য ব্যাঘ্র-কেও সে আশীর্ব্বাদ করিতে সক্ষম। অতএব কৃষ্ণচন্দ্র! তোমার সেই লোককে এখনি আনিবার জন্য দূত প্রেরণ কর—আমার চিড়িয়াখানার একটী বৃহৎ ব্যাঘ্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে হইবে।"

এই অছিলায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে কয়েদ করা হইল এবং পত্র লিখিয়া তাঁহার রাজধানীতে একটী দূত প্রেরিত হইল। তাহাতে লিখিত হইল;—"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দী হইয়াছেন। তাঁহার রাজধানীতে যিনি ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ আছেন, অচিরে আসিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ তাঁহার চিড়িয়াখানার একটী সুবৃহৎ ব্যাঘ্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারিলেই মহারাজকে মুক্তি দেওয়া হইবে। নতুবা, মহারাজ ত কারাগারের অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবেনই, অধিকন্তু তথাকার ব্রহ্মোত্তরভোগী ব্রাহ্মণগণকেও ধরিয়া আনিয়া কারাগারে আবদ্ধ করা হইবে। ব্রাহ্মণগণ বড়ই লোভী এবং অপদার্থ, তাহারা পুরুষানুক্রমে নিস্কর ব্রহ্মোত্তর কেবল ফাঁকি দিয়া ভোগ দখল করিতে পারিবে না।"

যথাসময়ে দূত পত্র লইয়া রাজধানীতে পৌঁছিল এবং মন্ত্রীর নিকট নবাবপ্রদত্ত পত্র প্রদান করিল। মন্ত্রী মহাশয় দূতকে যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ করিয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। মহারাজের রাজধানীতে আসিতে বিলম্ব দেখিয়া এবং কোন সংবাদ না পাইয়া সে দিন প্রাতঃকালে বহু-ধর্ম্মাত্মা মহানুভব ব্যক্তি রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। নলি-নাক্ষও সে দিন রাজসভায় আসিয়া সকলের সহিত যোগদান

করিয়াছিলেন। মন্ত্রী যখন পত্র পাঠ শেষ করিয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলীর নিকট এই অকস্মাৎ বিপদের প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন, তখন সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল। নবাবের এই কঠোর আদেশে সকলেই ভীত হইলেন। কেহই এ বিষয়ে ইতি-কর্ত্তব্যতা স্থির করিতে পারিলেন না। মন্ত্রী যখন পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—"প্রভুগণ! এই বিপদের সময় আপনারা একটু সদয় হইয়া ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করুন। ধার্ম্মিক মহারাজার অযথা কারাক্লেশ নিবারণ করুন। আপনাদের সংকীর্ত্তি চারিদিকে বিঘোষিত হইবে—আপনারা জয়যুক্ত হইবেন।" কাহারও মুখে কোন কথা নাই, কেহই সাহস করিয়া ব্যাঘ্র আশীর্ব্বাদে মহারাজের কারা-ক্লেশ নিবারণে অগ্রসর হইলেন না। বরং সকলেই একবাক্যে বলিলেন—"নবাবের এ যে অসম্ভব আব্দার। আমরা না হয় স্ত্রী পুত্র লইয়া স্থানান্তরে যাইয়া ইংরাজের শরণাপন্ন হইব; তথাপি এ খাম-খেয়ালী নবাবের রাজত্বে আর বাস করিব না।"

মন্ত্রী ছল ছল নেত্রে বলিলেন—"প্রভুগণ! ইহাই কি ন্যায়-সঙ্গত? এতদিন যাঁহার অন্নজলে সপরিবারে পরিপুষ্ট হইলেন, এক্ষণে তাঁহার বিপদ দেখিয়া ভয়ে এরূপ পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করা কি আপনাদের ন্যায় শাস্ত্রপাঠী স্বধর্ম্ম-নিরত তেজস্বী ব্রাহ্মণের উচিত?" মন্ত্রীর এই কথা শুনিয়া জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"মন্ত্রী মহাশয়! তবে কি আপনি আমাদিগকে ব্যাঘ্রের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া অপঘাতে মরিতে বলেন? আমরা না হয় মহারাজের অন্নজল আর গ্রহণ করিব না অদ্যই না হয়,

আমরা নদীয়া পরিত্যাগ করিব।” এরূপে সভামধ্যে মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল, সকলেই হা হুতাশ করিতে লাগিলেন। অন্দরমহলে এ সংবাদ পৌঁছিবামাত্র রমণীকণ্ঠে রোদনধ্বনি সমুত্থিত হইল। চিরানন্দময় রাজভবন আজ শোকপরিচ্ছদে সমাবৃত হইল। ইহার প্রতিকার কল্পে কেহ কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। সকলেই অবনত মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন তেজঃপুঞ্জ কলেবর যুবক উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নির্ভীক হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন,—“মন্ত্রী মহাশয়! চিন্তা দূর করুন, ধার্ম্মিকের রক্ষাকর্ত্তা ভগবান আছেন। আমি নবাবের সহিত দেখা করিতে যাইতে প্রস্তুত আছি। কবে যাইতে হইবে, আদেশ করুন। পরোপকারে জীবনপণ করাই ত ব্রাহ্মণের লক্ষণ! বেদজ্ঞ বিপ্রগণ যদি এই মহৎ বিষয়ে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিবেন— তবে আর কাহার দ্বারা এ সকল মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। যদি ব্যাঘ্রকেই আশীর্ব্বাদ করিতে হয়, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ তপঃনিরত ব্রাহ্মণ-সন্তান কেন উদ্বিগ্ন হইবেন! যিনি যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তাঁহার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইতে পারে না। ভয় তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইবে। মৃত্যুকে তাঁহারা আদৌ গ্রাহ্য করিবেন না। দেহের অবস্থান্তরের নাম মৃত্যু। দেহে বাল্য, যৌবন রক্ষিত, যেমন পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়, মৃত্যুও তদ্রূপ দেহের নূতনত্ব সম্পাদন করে মাত্র। ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ইহার জন্য কখন ভীতচিত্তে ধর্ম্মকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিবেন না। ব্যাঘ্রকে আশীর্ব্বাদ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে বেশী কঠিন বিষয় নহে।” এই বলিয়া যুবক নীরব হইলেন।

সভাস্থ সকলেই যুবকের তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া এবং তাঁহার সারগর্ভ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা বাতুল বলিয়াই মনে মনে হাস্য করিয়া উঠিলেন।

মন্ত্রী যুবকের মুখে এমন সৎসাহসের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ভক্তিসহকারে বলিলেন—"ব্রাহ্মণ! আপনার ইচ্ছানুসারেই কার্য্য হইবে। দূতও উপস্থিত আছে, কবে অনুমতি হয় বলুন?"

"কল্য প্রাতঃকালেই যাত্রা করিব। আপনারা প্রস্তুত থাকিবেন।" এই বলিয়া যুবক সেদিনকার মত প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণমণ্ডলী যুবকের ধর্ম্মভাব, সৎসাহসের পরিচয় পাইয়া যুগপৎ স্তম্ভিত ও মোহিত হইলেন; যুবক প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিলেন। পাঠক! এই যুবককে কি আপনারা চিনিতে পারিয়াছেন? ইনিই আমাদের চিরপরিচিত নলিনাক্ষ! ব্রহ্মতেজ যাঁহার শরীরে বর্ত্তমান, যিনি ভক্তিবলে বলীয়ান, যিনি শাস্ত্রপাঠী ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচর্য্য যাঁহার বিশেষরূপে অভ্যস্ত, তাঁহার পক্ষে কোন কার্য্যই অসম্ভব নহে।

পরদিন প্রত্যুষে নলিনাক্ষ ইষ্ট নাম স্মরণ করতঃ জনৈক সহচর লইয়া দূতের সহিত মুর্শীদাবাদ অভিমুখে শুভযাত্রা করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

-•••••••••••-

অসাধ্য-সাধন।

ব্রহ্মচর্য্যই মনুষ্যত্বলাভের প্রধান উপায়। এখন না হউক, পূর্ব্বে ইহা ব্রাহ্মণগণের চিরাভ্যস্ত ছিল বলিয়া তাঁহারা কোন বিষয়েই দৃক্‌পাত করিতেন না। যাবতীয় অসাধ্য-সাধনেই তাঁহারা অগ্রসর হইয়া বিজয় লাভ করিতেন। আর্য্যশাস্ত্রে ইহার প্রমাণের অভাব নাই। নলিনাক্ষ যথা সময়ে মুর্শীদাবাদে উপস্থিত হইয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নলিনাক্ষের বাহ্যিক কোন আড়ম্বর নাই। সামান্য একখানি কাপড় ও স্কন্ধে উত্তরীয়। তাহাও গৈরিক রঞ্জিত নহে। আশ্রমে তিনি গৈরিক বাস পরিধান করিতেন। কোথাও যাইতে হইলে—পাছে কেহ ভেকধারী মনে করে, এইজন্য তিনি ব্রাহ্মণের প্রকৃত বেশ সাদা ধুতি-চাদরে দেহ আবৃত করিতেন, যাহাতে কেহ তাঁহাকে চিনিতে না পারে। কিন্তু অগ্নি—ভস্মে আচ্ছাদিত হইলেও কি চিনিতে পারা যায় না? নবাব যুবকের রূপের জ্যোতিঃ দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং বলিলেন,—"তোমার আবশ্যক কি?"

যুবক বলিলেন—"আমি আপনার অনুমতি অনুসারে নদীয়া হইতে আসিয়াছি। আমি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ব্রহ্মোত্তর ভোগী ব্রাহ্মণ।"

নবাব। হাঁ হাঁ বুঝিয়াছি, তুমি বাঘকে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তে পার্‌বে?

যুবক বলিলেন—"ভগবানের ইচ্ছায় সব হইতে পারে। অবশ্য চেষ্টা করিব।"

"আচ্ছা! একদিন একটী মজলিস করা যাইবে। এখন তুমি মহারাজের নিকট যাও।" এই বলিয়া নবাব যুবককে কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র নলিনাক্ষকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন—"বৎস! তোমার হৃদয়ে কি ভয়ের লেশমাত্র নাই? তুমি নবাবের আদেশ শুনিয়াছ ত—তবে শেষ দশায় ব্রহ্মহত্যাটা আমাকে দেখাইবার জন্য কেন এখানে আসিলে, নবাবের ঐ অন্যায় আব্দার কি রক্ষা করিতে পারিবে?"

যুবক। মহারাজ! চিন্তা করেন কেন? ব্রাহ্মণ কি ত্রিসন্ধ্যা করে না, তাহারা কি ভগবতীর সাধনা করিয়া শক্তিশালী নহে? ব্রাহ্মণ যদি এই সকল কার্য্যে ভীত হইবে, তবে আর কাহার দ্বারা এ কার্য্য সাধিত হইবে? ব্রাহ্মণের পক্ষে ত এ কার্য্য অতি তুচ্ছ, আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন। যে বিশ্বেশ্বরীর বিশ্বরাজ্যে আমরা ও ব্যাঘ্র সৃষ্ট হইয়াছি, তাঁহাকে স্মরণ করুন। বিপদে তিনিই একমাত্র ভরসা। মনুষ্য উপলক্ষ মাত্র। হৃদয়ে এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধমুল থাকিলে, আর মানুষকে পদে পদে বিপদে পড়িয়া এত কষ্টভোগ করিতে হয় না। কৃষ্ণচন্দ্র আর কোন কথা কহিলেন না। ধর্ম্মের মহিমায় মোহিত হইয়া উভয়ে সে রাত্রি যাপন করিলেন।

আজ প্রাতঃকালেই হিন্দুধর্ম্মের পরীক্ষার দিন। নবাব হিন্দু ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিককে আজ পরীক্ষা করিবেন। সনাতন আর্য্যধর্ম্ম যে সকলের শ্রেষ্ঠ, তাহা দেখাইবার জন্যই বুঝি

ভগবান এই কৌশলজাল বিস্তার করিলেন, কিম্বা মুসলমানের নিকট হিন্দুধর্ম্মের মহিমা প্রচারই বা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের নায়ক, বুঝি আমাদের তাপস-যুবক নলিনাক্ষ!

এই অল্প বয়সেই নলিনাক্ষ সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ এবং ভক্তসাধক হইয়াছেন, আজ তাঁহার যশোভাতি দিগন্ত বিস্তৃত হইয়া হিন্দু ধর্ম্মদ্বেষী মুসলমানগণকে স্তম্ভিত করিবে বলিয়াই বুঝি মহামায়ার এই লীলা-খেলা। নলিনাক্ষ গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি এরূপ সুন্দর-ভাবে পাঠ করিতে পারিতেন যে তাহা শুনিলে সকলকেই মোহিত হইতে হইত। এই অল্প বয়সে তিনি সাধনমার্গেও সমুত্তীর্ণ হইয়া মায়ের সুসন্তান হইয়াছেন। অচিরেই জগজ্জননীর কোমল-ক্রোড় লাভ, তাঁহার সাধন ভজনের পুরস্কার প্রাপ্তি হইবে।

নলিনাক্ষ যেদিন নদীয়া হইতে মুর্শীদাবাদ রওনা হন, সেই দিন প্রাতঃকালেই বামদেব আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত। আসিবার সময় আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বিস্তৃত করিয়া তাঁহার পদধুলি গ্রহণ করিলেন। নলিনাক্ষকে রাজার বিপদুদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইতে দেখিয়া, বামদেব তাহাকে প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"বৎস! কোনও চিন্তা নাই, মায়ের কৃপায় তুমি জয়যুক্ত হইয়া, হিন্দু-ধর্ম্মের এবং হিন্দুজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়া ফিরিয়া আসিবে, মা ভগবতী তোমার মঙ্গল করিবেন।" নলিনাক্ষ গুরুর আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে অসীম শক্তি সমাহিত হইয়াছে। ধর্ম্মবলে যাহার হৃদয় দৃঢ় সংবদ্ধ—এ জগতে তাহার অসাধ্য কি আছে?

অতি প্রত্যুষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলেন এবং স্নান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করতঃ নবাব-মজলিসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"এক্ষণে আমাদের আর কোন কার্য্য সমাধা করিতে হইবে কি?"

নলিনাক্ষ বলিলেন—"মহারাজ এ যবন ভবনে হিন্দুর অন্যবিধ আচার পদ্ধতির অনুষ্ঠান ত কিছুই হইবে না, তবে আপনি অনুগ্রহ করিয়া কিছু পুষ্পচয়ন ও একটী ঘটে গঙ্গাজল পূর্ণ করিয়া লইয়া চলুন। আমি পশ্চাৎ যাইতেছি। উহাতেই ঘটস্থাপন করিয়া মানসোপচারে চণ্ডীর পূজা করতঃ চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিতে হইবে।"

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাহার সংগ্রহে যত্নবান হইলেন। মনে কেবল করুণাময়ীর করুণা ভিক্ষা করিতেছেন, আর বলিতেছেন—"মা! এ জগৎ-প্রপঞ্চে তোমার লীলাখেলার অবধি নাই, তুমি কখন যে কিরূপ ভাবে লীলাবিস্তার করিয়া ধর্ম্মের মহিমা প্রচার কর—তাহা হীনবুদ্ধি মানব কেমন করিয়া বুঝিবে? জননি! আজ যে খেলা খেলিতেছ, যেন তাহাতে হিন্দুর মান রক্ষা হয় মা! নতুবা নবাবের রোষানলে হিন্দু জাতির আর রক্ষা থাকিবে না। মা রক্ষাকালি! তোমার আজন্ম সেবক নলিনাক্ষকে রক্ষা ক'রো, আমার এ তুচ্ছ জীবনের জন্য যেন একটী পবিত্র ধর্ম্মময় জীবন দুরন্ত ব্যাঘ্র কবলে ডালি দিতে না হয়। মা বহুবলধারিণি, সিংহবাহিনি! ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ ক'রো" এই বলিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পুষ্পচয়নে বহির্গত হইলেন।

তখন পূর্ব্বগগনে বালারুণের লোহিত বর্ণ বিকীর্ণ হইয়া

চারিদিক শোভাময় করিয়া তুলিয়াছে। খেয়ালী নবাব সিরাজুদ্দৌলা প্রাতঃকালেই এক সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে বহু জনাকীর্ণ মজলিসের আয়োজন করিয়াছেন। বহু গণ্যমান্য আমীর, ওমরাহ, ভদ্রলোক সেই সভায় সমুপস্থিত হইয়াছেন। আজ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণ কিরূপে জীবিত ব্যাঘ্রকে আশীর্ব্বাদ করে—তাহাই দেখিবার জন্য বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে নবাব সশরীরে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন, সমাগত জনবৃন্দ তাঁহাকে যথোচিত অভিবাদন করিল ও তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া স্ব স্ব আসন পরিগ্রহ করিল। সভার চারিদিকেই অসংখ্য জনস্রোত, কেবলই উষ্ণীষ পরিহিত নরশির উচ্চ নীচ ভাবে স্তরে স্তরে সুসজ্জিত হইয়া কাষ্ঠাসন পরিপূর্ণ করিয়াছে; একধারে একটী সুবৃহৎ তোরণ দ্বার, সভার মধ্যস্থলে একটী সুবৃহৎ পিঞ্জরাবদ্ধ নরশোণিত-লোলুপ ব্যাঘ্র, এই অসংখ্য জনমণ্ডলীর মধ্যে অবস্থিত হইয়া কেবল আশার আশ্বাসে সৃক্কণী পরিলেহন করিতেছে। আশা, একবার অব্যাহতি পাইলে, একবার ছাড়িয়া দিলে, তাহার বহু দিনের শোণিত পিপাসার শান্তি করিয়া লইবে। এই জন্য হিংসার পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি ব্যাঘ্র সুদৃঢ় লৌহ পিঞ্জরকেও আপন প্রতাপে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করিতেছে। লৌহ পিঞ্জরের মধ্যে দুইটী কক্ষ, একটীতে ব্যাঘ্র আবদ্ধ রহিয়াছে; আর একটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় অবস্থিত, আশীর্ব্বাদক তাহাতে আসিয়া অবস্থান বা তাঁহার ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিবেন। মধ্যস্থলে একটী রেলিংযুক্ত ব্যবধান, পিঞ্জরটীকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পুষ্পাদি চয়ন করিয়া সেই শূন্য-পিঞ্জর মধ্যে রক্ষা করিলেন। একটী ঘট পবিত্র গঙ্গাবারি পূর্ণ করিয়া আনিলেন ; সম্মুখে একখানি কুশাসন বিস্তৃত করিয়া রাখিয়া পিঞ্জরের সোপানে সেই অদ্ভুত তপঃপ্রভাবসম্পন্ন যুবক নলিনাক্ষের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

বেলা প্রায় প্রহর অতীত, এমন সময় সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর ব্রাহ্মণযুবক সভায় সমাসীন হইলেন। সভাস্থ জনমণ্ডলী বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে সেই লোক-ললাম-ভূত, তেজদৃপ্ত যুবকের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। যুবক নির্ব্বাক্ হইয়া সিংহ-বাহিনী ভগবতীর স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে সোপানাবলী আরোহণ করিয়া পিঞ্জর-গৃহে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্ব হইতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার পূজার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন, যুবক পদ-প্রক্ষালন করিয়া আসনোপবিষ্ট হইয়া প্রথমে দেবী চণ্ডিকার মানসোপচারে পূজা সমাপন করিলেন। ভক্তের মান বাড়াইবার জন্য, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য, স্বয়ং দেবী চণ্ডিকা যেন তথায় আবির্ভূত হইলেন। সে স্থান যেন কি এক অলৌকিক দৈবভাবে পরিপূরিত হইল। যুবক দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া যেন অত্যধিক জ্যোতিঃবিশিষ্ট হইলেন। তাঁহার তখনকার সে মূর্ত্তি যে দেখিয়াছে সেই ধন্য হইয়াছে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র! তুমিই ধন্য, আর হে মুসলমান-কুল-পঙ্কজ নবাব! তুমিও আজ ধন্য হইলে।

এইবার চণ্ডীপাঠ আরম্ভ হইল। যে চণ্ডীপাঠে জীবের সকল আপদ বিপদ বিদূরিত হয়—চণ্ডীপাঠে ভক্ত অসাধ্য সাধন

করিতে পারে ; চণ্ডীপাঠ প্রকৃতরূপে করিতে পারিলে, মানব এই দুস্তর ভব-জলধি গোষ্পদের ন্যায় অবহেলায় পার হইতে পারে, যুবক সেই মহিমাময়ী, দনুজদলনী, বিপদ-বিনাশিনী জগদম্বার অপার মহিমা সুমধুর স্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মরি মরি! মধুর স্বর-লহরী, প্রাণের ভিতর দিয়া মরম স্পর্শ করিলে কি আর এই ভবকারাগারে মানবের কোন ভাবনা থাকে? তন্ময় হইয়া যুবক মধুর স্বরে চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন। সেই জলদ গম্ভীর স্বর, কড়ি-মধ্যমের সেই সুমিষ্ট আওয়াজে ধ্বনিত হইল। যেন সমস্ত সুস্বর, সমস্ত শব্দ, রাগিণী মূর্ত্তিমতি হইয়া তাঁহার কম্বকণ্ঠে বিরাজ করিতে লাগিল। সকলেই স্পন্দনরহিত হইয়া উৎকর্ণে স্বর-সুধা পান করিতে লাগিল। চণ্ডীর সুর অতি মধুর—যে শুনিয়াছে, সেই জীবন্ত হইয়াছে—তাহার মোহ-ঘুম কাটিয়া গিয়াছে, সে প্রাণের তারে সেই সুর বাঁধিয়া তন্ময় হইয়াছে। সিরাজুদ্দৌলার মত দর্পী নবাবও তাহাতে মোহিত হইয়া যুবককে শত শত ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

হায়! ভারতে আর কি সে দিন আছে। আর কি সামগানে, আর কি হিন্দুর পরম পবিত্র বেদমন্ত্রের প্রাণ-স্পর্শী সুস্বরে ভারতবাসীর কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইবে? হায় রে সে দিন নাহিক আর! যাহা গিয়াছে—ভারতের যে শুভদিন চলিয়া গিয়াছে—তাহা কি আর ফিরিয়া আসিবে না? আর কি আমরা মানুষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিব না, জগদীশ!

জীবমাত্রেই সুরের বশীভূত। ব্যাঘ্র এতক্ষণ এই বিশাল জনস্রোত দেখিয়া নানাবিধ লম্ফ ঝম্প করিতেছিল। সুর শ্রবণে
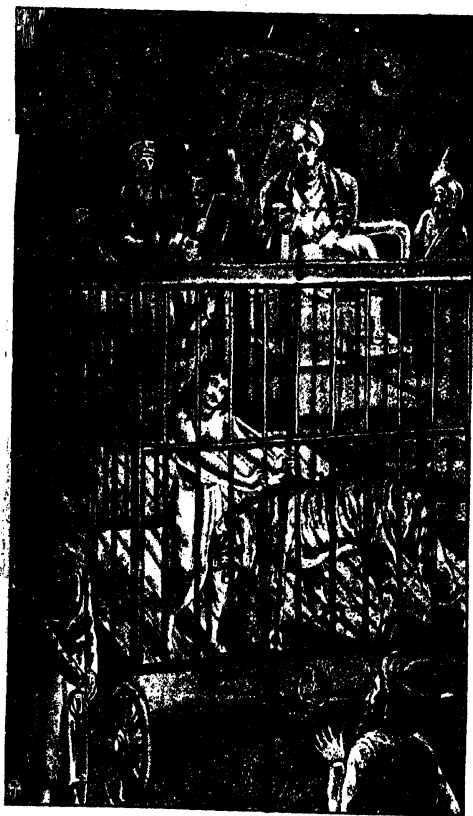
মুর্শিদাবাদে নবাব সিরাজুদ্দৌলার সভাস্থলে পিঞ্জর মধ্যে ভীষণ ব্যাঘ্রকে ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ যুবক নলিনাক্ষের আশীর্ব্বাদ।

[৭১ পৃঃ।

সেও নত হইল। নিস্তব্ধভাবে সম্মুখের পদদ্বয়ের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করিল—সেও বিমোহিত হইয়াছে। পিঞ্জর মধ্য হইতে তাহার আর গভীর গর্জ্জন শুনা যাইতেছেনা—সেও কাঁদিতেছে; সেই বিশাল অর্দ্ধনিমিলিত-নেত্র হইতে অশ্রু বিনির্গত হইয়া ধরাতল প্লাবিত করিতেছে। সাধকের মোহিনী শক্তি এইপরূই অসীম, সে জীবজগতকে এইরূপেই মোহিত করিতে পারে। ভারতে এ দৃশ্য কখনও বিরল ছিল না, এখনও নহে। এখনও বিজন বনে, দুরারোহ পর্ব্বত-গুহায় এ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও ভারতের তপঃ প্রভাবসম্পন্ন ঋষি, সন্ন্যাসীগণ হিংসা-দ্বেষ বর্জ্জিত হইয়া হিংস্র-জন্তুসঙ্কুল অরণ্যে বাস করিতেছেন।

নবাব স্তম্ভিত হইলেন, তাঁহার মুগ্ধকারী শক্তির পরিচয় পাইয়া কৌতুহলাক্রান্ত হৃদয়ে পিঞ্জর রক্ষকগণকে মধ্যস্থিত ব্যবধান সরাইয়া লইতে অনুমতি করিলেন। ভৃত্যগণ হুকুম প্রতিপালন করিল। এইবার তাপস-যুবক ও ব্যাঘ্র একত্রেই অবস্থান করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবক চণ্ডীপাঠ সমাপন করিয়া সুস্বরে দেবীর স্তব পাঠ করিতে করিতে বাঘের মস্তকে পুষ্প, দূর্ব্বা এবং চন্দনের লেপন প্রদান করিয়া পুঁথি বন্ধ করিতে করিতে নীচে নামিয়া আসিলেন। পুনরায় পিঞ্জরের দ্বার রুদ্ধ হইল। সকলেই মোহিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুজাতির জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। উপস্থিত জনমণ্ডলী হিন্দুধর্ম্মের মহিমা, ব্রহ্মতেজ ঘোষণা করিয়া চারিদিক পরিপূরিত করিল। এইবার ব্রহ্মচারী, তাপস-যুবক নাজিমের নিকট দর্পী মহারাজ অশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন। মহারাজের মৃত্যুদেহ

একাদশ পরিচ্ছেদ

গুরু-শিষ্য।

পরোপকারের তুল্য ধর্ম্ম আর নাই! হিন্দু ইহা ভালরূপ বুঝিতে পারে বলিয়াই সে পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিতে পারে—পৃথিবীতে আর কোন জাতিই এরূপ পারে না। কত লোক কত কথা বলিয়াছিল, কত নিষেধ করিয়াছিল; কিন্তু কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া নলিনাক্ষ মহারাজ কৃষ্ণ-চন্দ্রের বিপদ উদ্ধারে আপনার প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া হিংস্র জন্তু ব্যাঘ্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়াছিলেন। যিনি এতদূর ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন, ভগবান যে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন—ইহাতে আর বিচিত্র কি? নলিনাক্ষের যশঃসৌরভে চারিদিক পরিপূরিত হইল।

পাছে মনোমধ্যে কোন প্রকার অহংভাব প্রকাশ পায়, এই জন্য নলিনাক্ষ আসিবার সময় মহারাজকে এ কথা অপ্রকাশ রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মহারাজ এ কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া কেবল বামদেবের নিকট বলিয়াছিলেন। বামদেব নলিনাক্ষের আত্মোন্নতির বিষয় পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন বলিয়াই মহারাজের কথায় কোন প্রকার বিস্ময় ভাব প্রকাশ করিলেন না। তিনি মনে মনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া নলিনাক্ষকে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ন্যায় আদর্শ ব্রাহ্মণ তনয়কে

প্রতিপালন ও শিক্ষা দান করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

নলিনাক্ষ যে কালে আরও অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে, তাহার বিষয় বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়া তিনি কিরূপ গুরু-দক্ষিণা চাহিয়াছেন, আপনার কন্যা অন্বেষণের ভাণ করিয়া তাহাকে কিরূপে ভগবল্লাভের পন্থা অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন, তাহা পাঠক অবগত আছেন। কিন্তু এত শীঘ্র তাহাকে এ বিষয়ের উপদেশ প্রদান করা উচিত হয় নাই; কারণ নলিনাক্ষের ন্যায় আদর্শ ব্রাহ্মণকে সংসার-ধর্ম্মে প্রেরণ করিলে, জগতের যে কত হিতসাধন হইবে—তাহার আর ইয়ত্তা নাই। নলিনাক্ষ যাহাতে আশু সংসার-ধর্ম্মে মনোনিবেশ করেন সেজন্য বামদেব ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নলিনাক্ষ সংসার-ধর্ম্ম না করিলে স্বর্গীয় নীলরতনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা হইবে না, নলিনাক্ষকেও প্রতিজ্ঞাভঙ্গজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। নীলরতনের কন্যা নিরুপমা সকল অংশে নলিনাক্ষের সহধর্ম্মিণী হইবার উপযুক্তা। সেরূপ রমণীরত্ন জগতে দুর্লভ; সে মাধবীলতা নলিনাক্ষ-সহকারে বিজড়িত হইলে যে, তাহার সুশীতল ছায়ায় সংসার-অরণ্যে অনেক দুঃখ-দারিদ্র্যতপ্ত জীব সুখে আশ্রয়লাভ করিবে—তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আহারাদি সমাপন করিয়া নলিনাক্ষ গুরুদেবের নিকট আসিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। বহুদিনের পর শ্রীগুরুর চরণ দর্শন পাইয়া নলিনাক্ষ আনন্দে অধীর হইলেন

এবং তাঁহার পাদপদ্ম অঙ্কে ধারণ করিয়া, হস্তাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যখন কোন উপদেশ গ্রহণ বা ধর্ম্ম প্রসঙ্গ উত্থাপনের ইচ্ছা হইত, নলিনাক্ষ সেই সময় গুরুদেবের পদ-সেবায় রত হইতেন। বামদেবও জানিতে পারিয়া সৎ-কথামৃত দানে ধর্ম্মপিপাসাতুর নলিনাক্ষের প্রাণের পিপাসা নিবৃত্তি করিয়া দিতেন।

নলিনাক্ষের তেজঃপ্রভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিলে বাস্তবিকই আপামর সাধারণ সকলের প্রাণে একটা সার্ব্বজনীন ভক্তিভাবের উদ্রেক হয়; যেন তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। নলিনাক্ষ নিকটে উপবিষ্ট হইলে বামদেব বলিলেন—"বৎস! তোমার কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে সংসারী হইয়া এইরূপে সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে দেখিলে, ততোধিক সুখী হইব। বৎস! তুমি এইবার হইতে সংসার-ধর্ম্মে মন দাও।"

নলিনাক্ষ আত্মপ্রশংসা শুনিলে বড়ই লজ্জিত হইতেন। তিনি লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন—"গুরুদেব! ইহাতে আমার নিজের কোন ক্ষমতা নাই। যাহা হয় এবং আমি যাহা করিতে সমর্থ হই, তাহা কেবল আপনার শ্রীচরণা-শীর্ব্বাদে জানিবেন। আপনার ন্যায় জীবন্মুক্ত পুরুষের আশ্রয়ে থাকিয়া কৃপালাভ করিতে পারিলে, মানবের পক্ষে সকল কার্য্যই সম্ভব হইতে পারে। প্রভো! সংসার বড় ভয়ানক স্থান, ইহার ভীষণ পরীক্ষায় কি আমার ন্যায় হীনমতি মানব উত্তীর্ণ হইতে পারিবে? পাছে পতন হয়, পাছে পাপ-সাগরে

নিমগ্ন হইতে হয়, এই ভয়েই আমি সংসারে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না।"

বামদেব। বৎস! সাধারণ কলুষিত-চিত্ত মানবের পক্ষে সংসার ভয়ানক স্থান বটে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ব্রাহ্মণের পক্ষে সংসারের তুল্য শান্তিপ্রদ স্থান আর নাই। তুমি ত সকল শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছ। যদি সংসার-আশ্রম, পবিত্র এবং সুখকর না হইবে, তবে আমাদের যাবতীয় আর্য্যঋষিগণ কেন সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া স্ত্রী-পুত্র পরিবেষ্টিত হইয়া সংসারী হইতেন—তাঁহারা সকলেই ত সংসারী ছিলেন। সংসারী হইয়া সংসার-ধর্ম্ম সম্যক্ প্রতিপালন করতঃ বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলে শ্রেয়োলাভ হয়।

নলিনাক্ষ। গুরুদেব! সংসারে প্রবেশ করিয়া কি কি করিতে হইবে, আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। যখন আপনি অনুমতি করিতেছেন—তখন আপনার আদেশ প্রতি-পালন করা আমার মহাধর্ম্ম; আপনার উপদেশানুসারে কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই সংসার-সাগরে উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

বামদেব। বৎস! উপকারীর প্রত্যুপকার করা সংসারীর পক্ষে কেন, সকলের পক্ষে একটী মহাধর্ম্ম। একবার স্বর্গীয় নীলরতনের কথা মনে করিয়া দেখ। তিনি তোমার কিরূপ উপকারী ছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল, তদীয় একমাত্র লক্ষ্মী-স্বরূপিণী কন্যা নিরুপমাকে তোমার করে সমর্পণ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিবেন, কিন্তু তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। মৃত্যু সময়ে তিনি এ বিষয়ে বার বার কত অনুরোধ

করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় পরম ধার্ম্মিকের অনুরোধ রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সেই নিরাশ্রয় অবস্থায় তাঁহারা তোমাকে হৃদয়ের রক্ত দিয়া প্রতিপালন না করিলে তোমার দুর্দ্দশা কি হইত, একবার ভাব দেখি।

নলিনাক্ষ পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে স্থান দান করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, ছল ছল নেত্রে বলিলেন—"গুরো! আমি এ সমস্ত বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আর আমাকে কোন কথা বলিতে হইবে না। আমাকে আজীবন যদি নির্যাতন সহ্য করিতে হয়, তাহা হইলেও আমি এখন সংসারী হইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাঁহারা এখন কোথায় কি অবস্থায় আছেন, তাহার ত কিছুই অবগত নহি?"

রামদেব। বৎস! আমি সত্বরই রুদ্রপুরে পত্র প্রেরণ করিয়া সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিব। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করা উচিত নহে জানিয়া, এতদিন কোন চেষ্টা করি নাই এবং তজ্জন্যই বার বার তোমাকে সংসারী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি।

নলিনাক্ষ। প্রভো! যদি আমাকে সংসারী হইতে হয়, তাহা হইলে ত আপনার দক্ষিণা প্রদান করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে?

রামদেব। না বৎস! সংসার শান্তিময় হইলে, তুমি আমার কন্যার অন্বেষণ করিতে অনেক সময় পাইবে। অনেক লোক বল পাইবে. আর আমি ত এখন নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতেছি, তাহাতেও সন্ধান হইতে পারে।

নলিনাক্ষ। প্রভো! সংসারে যদি কোন বিভীষিকা দেখি,

কোন প্রকার পতনের সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে কি করিব? আমাকে উপদেশ দিন।

বামদেব। বৎস! সংসারের তুল্য ধর্ম্ম উপার্জ্জনের স্থান আর নাই। সংসার-আশ্রম সম্যকৃরূপে প্রতিপালন করিতে পারিলে যে তাহা সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ, সে বিষয় তোমাকে আর কি উপদেশ দিব. তুমি শাস্ত্রপাঠী, সকলই ত অবগত আছ। সংসারে সংযমী হইতে পারিলে আর পতনের সম্ভাবনা নাই। এ কলিযুগে সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম। সংসারে সত্যের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। সদা সত্য কথা কহিবে। তাহা হইলেই বাক্যের সংযম শিক্ষা হইবে। বেশী কথা কহিলেই মিথ্যা কথা কহিতে হইবে। বেশী উপার্জ্জনের চেষ্টা করিলেই অধর্ম্ম করিতে হইবে—ইহা সুনিশ্চয়।

নলিনাক্ষ। বেশী আকাঙ্ক্ষা করিব না, বিবেক বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিলে আমার শ্রেয়োলাভ হইবে ত? আপনি সংসারাশ্রমের বিষয় প্রতিদিন উপদেশ দিয়া দাসকে চরিতার্থ করুন!

বামদেব। বৎস! ব্রহ্মচর্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই সংসারে জয়লাভ করিতে পারা যায়। সকল আশ্রমেই সংযমের আবশ্যক, সংযমী না হইলে আশ্রমী হইতে পারে না। এইজন্য আর্য্য-শাস্ত্রকারগণ প্রথমেই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার নিয়ম প্রচলন করিয়া গিয়াছেন।

নলিনাক্ষ। গুরুদেব! তবে কেন মানব ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা না করিয়া সংসারী হইয়া থাকে?

বামদেব। বৎস! এই জন্যই ত মানব সংসারে প্রবেশ

করিয়া নানাপ্রকার দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে—নানাপ্রকার আধি-ব্যাধি প্রপীড়িত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। ভিত্তি পাকা না হইলে যেমন গৃহ সুদৃঢ় হয় না, সেইরূপ দেহ-গৃহ সুদৃঢ় করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য একান্ত আবশ্যক, নতুবা অকালে ইহার পতন অনিবার্য্য। সংসারে প্রবেশ করতঃ নানা প্রলোভনে আবদ্ধ হইয়া মানব সমস্ত ভুলিয়া যায়, এইজন্য সংসার অসুখের কারণ হইয়া উঠে, নতুবা সংসার অসুখের নহে— শান্তির আগার, সুখ-সম্ভোগের অতুলনীয় স্থান। বৎস! তুমি সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না।

নলিনাক্ষ। প্রভো! আমাকে সংসারী করিয়া আপনি কোথায় যাইবেন? আপনার পাদপদ্ম ত আর দেখিতে পাইব না?

বামদেব। বৎস! আমি অধুনা প্রয়াগে কুম্ভ-মেলায় যাইব, এখন হইতে তীর্থভ্রমণ আমার কার্য্য হইবে। ইহাতে আমার কন্যার অনুসন্ধান, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি ঐহিক, পারত্রিক উভয় কার্য্যই সংসাধিত হইবে। যখন একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া মনপ্রাণ বিচলিত হইবে, তখন সময়ে সময়ে তোমাদের শান্তিময় আশ্রমে আসিয়া সকল যন্ত্রণার লাঘব করিব।

নলিনাক্ষ। প্রভো! তবে আর আমার সংসারে প্রবেশ করিতে ভয়ের কোন কারণ নাই। আপনার পাদপদ্ম দেখিতে পাইলে, আমি সকল বিপদ তুচ্ছ করিতে পারিব।

বামদেব। বৎস! সংসারে বশবর্ত্তিনী সহধর্ম্মিণী পাইলে তাঁহার সহিত পবিত্র প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইলে সংসারের তুল্য স্থান আর নাই। তখন এই দাম্পত্য-প্রণয়ই জীবকে

ভগবৎ-প্রেমে উন্নীত করিতে পারে। নিরুপমার সৌন্দর্য্য, তাহার দৈহিক গঠন প্রণালী এবং এই বাল্যকালেই তাহার হাব-ভাব দেখিলে তাহাকে রমণীরত্ন বলিয়াই মনে হয়, তবে যদি তাহাতে কোন প্রকার ত্রুটী পরিলক্ষিত হয়, তাহার সংশোধনের ভার স্বামীর উপরই নির্ভর করিতেছে।

এইবার নিরুপমার সেই অতুলনীয় মুখখানি নলিনাক্ষের স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া যেন তাঁহাকে নূতন করিয়া তুলিল। যেন সেই ইন্দিবর-নিন্দিত মুখখানি তাঁহার নয়ন-পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নলিনাক্ষ প্রণয়ের আস্বাদন কিছুমাত্র জানেন না। তথাপি যেন তিনি নিরুপমার সৌন্দর্য্য মানস-নয়নে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন। স্বর্গীয় নীলরতন ও তদীয় স্বর্গীয়া পত্নীর প্রতি মনে মনে সভক্তি প্রণিপাত করিতে লাগিলেন।

এই সময় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বামদেব মহারাজকে অভ্যর্থনা করিয়া নিকটে বসাইলেন। বামদেব নলিনাক্ষের মতি পরিবর্ত্তনের কথা মহারাজকে জ্ঞাপন করিলেন। নলিনাক্ষ যেন ঈষৎ লজ্জিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সংসারাশ্রমে নলিনাক্ষের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া বামদেব ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিশেষ সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়ের প্রাক্কালে।

বসন্তের রজনী প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত। ইন্দুকর-বেষ্টনে প্রকৃতি সোহাগ-বিহ্বলা। ধীর পবন সঞ্চারে সুধাকর-সুধাধারা-পান-পরিতৃপ্তা চকোরীর কণ্ঠ-বিনিঃসৃত আনন্দোচ্ছ্বাস, কোকিল কোকিলার সম্মিলিত প্রেম-গাথা, পাপিয়ার আকাশভেদী উদাস স্বর-লহরী, আর সদ্য বিকশিত বন কুসুমের মধুর পরিমল, নিশিথিনীর অঙ্গ শোভা-সৌন্দর্য্য এবং একটা মদিরাময় অলস স্বপনের সৃষ্টি করিতেছিল। এ হেন মধুর সময়েও বামদেব-আশ্রমের প্রত্যেক তৃণটী পর্য্যন্ত যেন বিমর্ষভাবে অবস্থিত। বৃক্ষলতা এমন কি নীড়াশ্রিত পক্ষীকুল যেন আজ অনিদ্রায় রজনী যাপন করিতেছে। তাহারা আজ যেন কাহার বিয়োগজনিত ভাবী শোকে নিতান্ত অধীর হইয়া সময়ে সময়ে কাতরভাবে পক্ষধ্বনি করিতেছে। আজ বামদেব-আশ্রমে এত রাত্রেও তিনটী মানব নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন!

বামদেব কিয়দ্দিনের জন্য আশ্রম ত্যাগ করিবেন। তাই নলিনাক্ষ ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার শ্রীমুখের উপদেশবাণী শ্রবণ এবং বিদায়ের কালে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে ঠিক কৃতদাসের ন্যায় উপস্থিত আছেন। অদ্য তাঁহার বিদায়ের দিন, এই রজনীযোগেই তিনি সাধের নদীয়া পরিত্যাগ করিয়া

যাইবেন। প্রিয় শিষ্যেরা কি এ সময় নীরবে ঘুমাইতে পারেন?

ভগবানের করুণা লাভ করিতে হইলে বিশেষ তপস্যার আবশ্যক, একাগ্র ভক্তি ও সরল বিশ্বাসের প্রাবল্য না হইলে ভগবানের করুণা লাভ করা যায় না।

শাস্ত্রী মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান এতদিন তাঁহাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, এখন চক্ষু ফুটিয়াছে। যে রামপ্রসাদের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা ছিল, কিয়দ্দিন পূর্ব্বে যাঁহাকে তিনি অশিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা করিতেন, সেই সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ হইতেই আজ তিনি চক্ষুষ্মান হইয়াছেন। তাই আজকাল রামদেব আর আশ্রমে থাকেন না; অহরহঃ প্রসাদের প্রসঙ্গ, প্রসাদের আশ্রয় লইতেই ব্যস্ত থাকেন। প্রসাদের ভক্তিডোরে আবদ্ধ হইয়া ভগবতী কন্যারূপে তাঁহার বেড়া বাঁধিয়াছিলেন। প্রসাদের ভক্তিমাখা সঙ্গীত শ্রবণ-মানসে ভগবতীও সময়ে সময়ে তাঁহার আশ্রমে আগমন করিতেন। রামপ্রসাদ বুঝিতে পারিয়া সময়ে সময়ে কাশীতে গিয়া মা অন্নপূর্ণাকে সঙ্গীত শুনাইয়া আসিতেন। মানবের এ শক্তি—শিক্ষায় হয় না, অশেষ শাস্ত্র-পাঠ করিলেও এ সৌভাগ্যোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা কেবল হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাসের সুধাময় ফল। প্রসাদ দেবীকে কখন কন্যাভাবে, কখন জননীভাবে, কখন পুরুষভাবে, কখন প্রকৃতিভাবে ভাবিয়া তন্ময় হইতেন। তাঁহার তন্ময়তা এক অসাধারণ ভাবের ছিল, সে একাগ্রতা, সে ভাব-প্রবণতা কি সহজ-লভ্য? তাই ত প্রসাদ সকল সময়ে বলিতেন —"সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে?"

সাধক ভক্তিভাব ভিন্ন কখন সাধন-মার্গে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

বামদেব শাস্ত্রী এতাবৎকাল অশেষবিধ শাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়াও জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হইতে পারেন নাই। ইষ্ট-দেব তাঁহার প্রতি প্রতিকুল হইয়াছিলেন, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়া নিজেকে বাসুদেব গোস্বামীর পরিবর্ত্তে বামদেব শাস্ত্রী বলিয়া নদীয়ায় প্রচার করিয়াছিলেন। এতদিন তাঁহার গুরুর প্রতিও তাদৃশ বিশ্বাস ছিল না। গুরুদত্ত উপাধীও তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাই তিনি বাসুদেব গোস্বামীর পরিবর্ত্তে আজ বামদেব শাস্ত্রী।

সংসারে অবস্থান সময়ে স্ত্রীবিয়োগের পর তাঁহার কন্যাটীর প্রতি বড়ই মায়ামমতার আধিক্য হইয়াছিল। একবার তিনি কোন আত্মীয়ের নিকট কন্যাটীকে রাখিয়া কিয়দ্দিনের জন্য তীর্থ গমন করেন, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই আত্মীয়টীর কত সন্ধান করিলেন, তথাপি তাহার দেখা পাইলেন না, উহার সহিত কন্যাটীরও দর্শন না পাইয়া সংসার অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। বহু অন্বেষণে তাহার দর্শন বিষয়ে হতাশ হইয়া অবশেষে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। জগতে আপন প্রিয় বস্তুর জন্য মানব কত প্রাণপণ করে স্নেহ মমতা দেখায়; কিন্তু সেই স্নেহ মমতা লইয়া ভগবানে ভক্তি ভালবাসা স্থাপন করিতে পারিলে নাকি সত্বর মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়-প্রসাদের মুখে এই অভয়বাণী শুনিয়াই, এখন বামদেব কন্যাস্থানীয় করিয়া ভগবতীর আরাধনা করিতেছেন। এতদিনের পর ইহাতে তিনি কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধকামও হইয়াছেন, তাঁহার প্রাণের ভক্তি ও

বিশ্বাস কতকটা যেন দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, তাই নলিনাক্ষ গুরু-দক্ষিণা দিবার প্রস্তাব করিলে, তিনি কন্যাভাবে ভগবতীর অন্বেষণ করিতে বলিয়াছেন। প্রাণের সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া তিনি প্রিয়-শিষ্যকে উপদেশ দিয়াছেন এবং সংসারী হইলে যে ধর্ম্মভাব প্রবল হয়, সকল আশা আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া ভোগ-মোক্ষ করতল-গত করিতে পারা যায়; রামপ্রসাদের দৃষ্টান্তে তিনি বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়া নলিনাক্ষকেও সংসারী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। এখন তাঁহার হৃদয়ের গভীরতা ও ধর্ম্ম বিশ্বাস এতদুর বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, আর তাঁহার মন-মহিষ অসার সংসার-পঙ্কে অবগাহন করিতে চাহে না। তাই এখন বামদেব আর একস্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। যত দিন যাইতেছে, তাঁহার প্রাণের আকুল পিপাসা তত বর্দ্ধিত হইতেছে; তাঁহার মনমধুকর সদাই সেই অম্লান-কুসুমের মধু অন্বেষণে তৎপর হইতেছে।

রাত্রি আর অধিক নাই। বামদেব নলিনাক্ষ ও কৃষ্ণচন্দ্রকে আহ্বান করিয়া নিকটে বসাইলেন। কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিলেন— "কৃষ্ণচন্দ্র! তুমি যে গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছ, সেই মুক্ত-পুরুষ, আগমবাগীশের দ্বারাই সংসার-কারায় মুক্তিলাভ করিবে। সংসার ধর্ম্ম-উপার্জ্জনের প্রধান স্থান, এখানে থাকিয়া যিনি ধর্ম্ম ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে না পারেন, তিনি নিতান্তই দুর্ভাগা—তাহাতে কোন সংশয় নাই। এখানে থাকিয়া নির্লিপ্তভাবে সমস্ত কার্য্যই করিতে হইবে। গৃহী হইতে হইলে গৃহিণীর সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহাকে নিজের মত করিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে হইবে। স্ত্রীকে সামান্য ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সামগ্রী

না ভাবিয়া সহধর্ম্মিণী জ্ঞানে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবে। সংসারে দাম্পত্য-প্রেম পবিত্রভাবে শিক্ষা করিলেই ক্রমশঃ তাহা মানবকে ঈশ্বর-প্রেমে উন্নীত করিতে পারে। নতুবা যে প্রেমের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে না, সামান্য প্রেম যাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় নাই, সে কেমন করিয়া স্বর্গীয় প্রেমের অধিকারী হইতে পারিবে? অন্ধ কি কখন সৎপন্থার অনুসরণ করিতে পারে? পাপীকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়া ধর্ম্ম পথে আনিবার চেষ্টা করিবে। পরের উপকার করিতে যত্নবান হইবে। শত্রুকে স্ববশে আনিবার চেষ্টা করিবে, তাহার অনিষ্ট করিবে না। ভয় ও মৈত্র দেখাইলে জগতের কার্য্য সহজ-সাধ্য হয়।

"শত্রুকে চির-শত্রু মনে করিয়া ঘৃণা করিও না, তাহা হইলে সে প্রবল হইয়া তোমার অনিষ্ট সাধন করিবে। সংসারে থাকিয়া কেবল আপনাকে বড় বলিয়া মনে করিও না। যে আপনাকে হীনভাবে ভাবিতে পারে সেই মহৎ, জগতে তাহার অধঃপতন কখন হইবে না। অর্থ জগতের সার সামগ্রী নহে, লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থ সংগ্রহ করিও না, যাহা সহজে এবং ধর্ম্মে উপার্জ্জন হইবে, তাহা কখন ত্যাগ করিবে না—ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া শিরোধার্য্য করিবে। বৎস! আমার জন্য তোমরা চিন্তা করিও না, আমি যে তোমাদের নিকট হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিতেছি তাহা নহে। আমি নিশ্চয়ই সময়ে সময়ে আমার এই চিরপ্রিয় আশ্রমে আসিয়া তোমাদের সঙ্গলাভ করিব। তুমি আমাদের নলিনাক্ষকে দেখিও—সে যাহাতে নিরুপমার পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারী হয়, তাহার চেষ্টা করিতে

বিরত হইও না।" এইবার নলিনাক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন -"নলি! বৎস! এ সংসারে তুমিই আমার মায়ার আধার; তোমাকে আমি হৃদয়ের কবাট খুলিয়া সমস্ত শিক্ষা দিয়াছি। তুমিও আমার মুখ রক্ষা করিয়াছ। তোমাকে শিষ্যত্ব প্রদান করিয়া আমিও ধন্য হইয়াছি। তোমার কার্য্যাবলি আমি লোক পরম্পরায় শ্রুত হইয়াছি। সংসারে থাকিয়া তুমি যে মাতৃপ্রসাদ লাভ করিতে পারিবে, আমার হৃদয়ে সে বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তোমাকে পরকালসম্বল শক্তিমন্ত্র হৃদয় খুলিয়া প্রদান করিয়াছি; সেই মন্ত্রের সাধনায় তুমি সংসার-সংগ্রামে জয়লাভ করিবে। যখন যে আশ্রমে থাকিবে, তখন তাহার প্রথানুসারে কর্ত্তব্য পালন করিবে, সংসারে থাকিয়া সংসারীর মত চলিতে হইবে— অবহেলা করিলে মহাপাপ! কিন্তু সাবধান মোহে আত্মহারা হইয়া পরকাল নষ্ট করিও না। সংসারে প্রবেশ করিয়া কোন প্রকার বিভীষিকা দেখিলেই সেই শক্তিমন্ত্র জপ করিও, সকল বিপদে পরিমুক্তি লাভ করিবে। নদীয়ার এ আশ্রম পরিত্যাগ করিও না, বিবাহিত হইলেও সময়ে সময়ে সস্ত্রীক এই আশ্রমে আসিয়া ধর্ম্মসাধন করিলে—এই সিদ্ধাশ্রমে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য। এ আশ্রমের নাম যেন বিলোপ না হয়—তুমি প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিবে। সময়ে সময়ে অধ্যাপক বিদায়ের যে পত্রাদি দেশ বিদেশ হইতে এখানে আসে, তাহাতে উপস্থিত হইবে। ছত্রপুর হইতে একখানি পত্র আসিয়াছে; তুমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার সময় ছত্রপুরে তোমার সহপাঠী জ্যোতিষের সহিত

দেখা করিবে ও ত্রিলোচন বিশ্বাসের সহিত দেখা করিয়া উভয়কে এই দুইখানি পত্র দিবে।” এই বলিয়া উভয়ের নামীয় দুইখানি পত্র এবং ছত্রপুরের নিমন্ত্রণ-পত্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন। নলিনাক্ষ ছল ছল নেত্রে তাহা গ্রহণ করিলেন।

নলিনাক্ষকে বিষাদ-ভারাক্রান্ত দেখিয়া বামদেব বলিলেন—“বৎস! চিন্তা কি? আমাকে দেখিবার কিম্বা সংবাদ জানিবার ইচ্ছা হইলে হালিসহরে, অথবা প্রয়াগ-তীর্থে দেখিতে পাইবে এবং আমিও সময়ে সময়ে এই আশ্রমে আসিব। যেখানে থাকি, আমি তোমাকে সংবাদ দিয়া লইয়া যাইব। এ জগৎ-প্রপঞ্চে তুমিই আমার একমাত্র মায়ার আধার রহিলে। আমাকে দেখিবার জন্য চিন্তা করিও না। আবশ্যক হইলেই দেখিতে পাইবে। তোমার বিবাহ হইলে সংসারে তোমাদিগকে একত্রে ধর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করিতে দেখিলে আরও সুখী হইব।”

এতক্ষণ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও নলিনাক্ষ সেই মহাপুরুষের মহীয়সী উপদেশপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া সকল কষ্ট ভুলিয়াছিলেন। কিন্তু আর সে সুখ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। রজনী প্রভাত হয় দেখিয়া বামদেব উঠিলেন, প্রভাতে বহুলোক সমাগম হইবে, বহুভক্ত তাঁহাকে দেখিতে আসিবে; তাহা হইলে পাছে সে দিনও তাঁহার গমনে বাধা পড়ে, এই জন্য গাত্রোত্থান করিয়া ভাগীরথী তটাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মহারাজের আদেশে তথায় তরণী সুসজ্জিত ছিল। নলিনাক্ষ ও মহারাজ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। বামদেব তীরে আসিয়া ভাগীরথী দেবীকে প্রণাম করিলেন।

পবিত্র সলিল মস্তকে প্রদান করিয়া নৌকারোহণ করিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও নলিনাক্ষ উভয়ে শ্রীগুরুর চরণে প্রণাম করিলেন। বামদেব উভয়কে প্রাণের আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। নৌকা মহাপুরুষের পাদপদ্ম বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া নাচিতে নাচিতে পাল-ভরে চলিতে লাগিল। তীরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও নলিনাক্ষ ছল ছল নেত্রে গুরুদেবকে বিদায় দিলেন। মুক্তযোগী বামদেবের নেত্রও যে অশ্রুসিক্ত হয় নাই—এমন নহে।

যতদূর দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল, উভয় পক্ষ বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতে লাগিলেন। যখন নৌকা চক্ষুর অন্তরাল হইল, আর দেখিতে পাওয়া গেল না—তখন নলিনাক্ষ ও মহারাজ বিষণ্ণ-চিত্তে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শূন্য আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া বাস্তবিক নলিনাক্ষ কাঁদিয়া ফেলিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে আর সে দিন আশ্রমে থাকিতে না দিয়া রাজবাটীতে লইয়া যাইলেন। নদীয়াবাসী সকলেই বামদেবের অদর্শনে দুঃখ-সাগরে ভাসমান হইল। সকলেই বলিতে লাগিল—"এমন মহাপুরুষের অদর্শনে বাস্তবিক নদীয়া অন্ধকারময় হইল। নদীয়ার পণ্ডিতমণ্ডলী এতদিনে একটী প্রকৃত বাহুবল হারাইলেন।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নিমন্ত্রণ রক্ষা।

কয়েক দিবসের পর নলিনাক্ষ প্রকৃতিস্থ হইলেন। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার প্রকৃত গুণ যে, পার্থিব কোন বিষয়েই তাহাকে দুঃখ-দগ্ধ করিয়া সাধারণ মানবের মত কাতর করিতে পারে না। বিশেষতঃ নলিনাক্ষের মত তেজস্বী পুরুষ কি পার্থিব কোন বিষয়ে বিচলিত হইয়া স্বকার্য্য-সাধনে পরাঙ্মুখ হইতে পারেন! তবে মায়ার মায়া সকলকেই মোহিত করিতে পারে। সাধারণে তাহাতে একেবারে কাতর হইয়া পড়েন কিন্তু নলিনাক্ষের ন্যায় পুরুষকে মায়ায় কাতর করিতে পারে না। সেই সময়ের জন্য কতকটা কষ্ট অনুভব করিতে হয় বটে; কিন্তু তাহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না।

নলিনাক্ষ এখন আশ্রমে থাকিয়া নিজ-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিকক্ষণ ধরিয়া তিনি ইষ্ট-চিন্তায় কালক্ষেপ করেন। কেবল আহারের সময় স্বহস্তে চারিটী পাক করিয়া আহার করেন মাত্র, তার পর সমস্ত সময় তিনি আপন কার্য্যে ব্যয় করেন। তাঁহার প্রাণে এখন সাধন-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, সংসারের বৃথা কাজে সময়-ক্ষেপণ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কেন?

আগামী পরশ্ব তারিখে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে ছত্রপুরে যাইতে হইবে। তৎপরে গুরুর আদেশক্রমে রুদ্রপুরে

জ্যোতিষের এবং স্বর্গীয় নীলরতনের গোমস্তা ত্রিলোচন বিশ্বাসের সহিত দেখা করিয়া পত্র প্রদান করিতে হইবে। এই পত্রেই তাঁহার বিবাহ-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গুরুদেব উক্ত দুই ব্যক্তির দ্বারা মহামায়াকে বিবাহ দিতে বাধ্য করিতেছেন। বিবাহের বিষয় চিন্তা করিয়া আপন হৃদয়েও প্রণয় সঞ্চার হইল।

আজ নলিনাক্ষের হৃদয়ক্ষেত্র যেন দেবরূপে নিরুপমা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। নলিনাক্ষ সেই আদর্শ রমণী রত্নের পবিত্র প্রতিমা যেন মানস নয়নে দেখিতে পাইতেছেন। যে নলিনাক্ষ প্রণয় বলিয়া কোন পদার্থ অবগত ছিলেন না, আজ যেন তাঁহার হৃদয়ভূমি প্রণয়-পয়োধীজলে ভাসিয়া যাইতেছে। নিরুপমার সেই অতুলনীয় সুন্দর কান্তি, সেই রক্তাভ নধর মধুর হাসিমাখা মুখখানি, সেই দৈহিক সুঠাম গঠন প্রণালী ভাবিতে ভাবিতে সেই পবিত্র মধুর ভাবসাগরে নলিনাক্ষ যেন ডুবিয়া গিয়াছেন। এতদিন পরে নিরুপমার জন্য তাঁহার প্রাণ বিচলিত হইয়াছে। তিনি গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সংসারী হইবেন — ইহা স্থির নিশ্চয়, কিন্তু তাঁহার দৃঢ় মন এত শীঘ্র যে বিচলিত হইবে—তাহা কে জানিত! এই জন্য বলিতে হয়—প্রণয়! এ জগতে তোমার ক্ষমতা অসীম! তুমি আয়ত্তাধীন করিতে পার না, জগতে এমন জীব দেখিতে পাওয়া যায় না! তুমি যোগী, ভোগী, সংসারী, সন্ন্যাসী সকলকেই বিমোহিত করিতে পার! তুমি না থাকিলে এতদিন এ জগৎ শ্মশানে পরিণত হইত; সংসার অন্ধকারময় কারাগার বলিয়া পরিণত হইত;

এ জগতে কেহ কাহাকেও আপনার বলিয়া ভাবিতে পারিত না। হায়! প্রণয়! তোমারই মোহিনী-মায়ায় জগৎ-সংসার মুগ্ধ! নলিনাক্ষ ত এ জগত ছাড়া নহেন, তবে তাঁহার হৃদয়ে প্রণয়ের আবির্ভাব না হইবে কেন। প্রণয়হীন মানব যে পশুতুল্য, নলিনাক্ষের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ, সাধু-চরিত্র যুবক কি প্রণয়হীন হইতে পারে! যাঁহার হৃদয় এত পবিত্র, ধর্ম্মভাবে এতদূর বিভোর—প্রণয় কি তাঁহার হৃদয় ছাড়া হইতে পারে! এতদিন নলিনাক্ষকে কিন্তু প্রণয় আয়ত্ত করিতে পারে নাই! যে দিন হইতে বামদেব তাঁহাকে সংসারী হইতে আদেশ দিয়াছেন, সেইদিন হইতেই নিরুপমার কথা, তাঁহার রূপলাবণ্য ও সরলতার কথা নলিনাক্ষের মানসপটে অঙ্কিত হইয়া পুর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিয়া তুলিয়াছে। মনে পড়িল—তাঁহার বাল্যের সহপাঠী বন্ধু জ্যোতিষচন্দ্রের কথা। কয়েক বৎসর পুর্ব্বে নীলরতন মুখোপাধ্যায় তাঁহার আত্মীয় জ্যোতিষকে গুরুদেবের চতুষ্পাঠীতে শিক্ষার্থে আনয়ন করিয়াছিলেন। কিছুদিন একত্রে অধ্যয়ন করিয়া জ্যোতিষ ও নলিনাক্ষের মধ্যে বেশ সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। কিন্তু জ্যোতিষের মাতৃভাষা শিক্ষার সুযোগ বেশীদিন হয় নাই। তাহার পিতা বার্দ্ধক্য বশতঃ অকর্ম্মণ্য হওয়ায়, বাধ্য হইয়া জ্যোতিষকে চতুষ্পাঠীর পাঠ সমাপন করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। এখন জ্যোতিষ এ কার্য্যে পরিপক্ক হইয়া ছত্রপুরের কোতয়ালীতে উকীলের কার্য্য করিতেছেন। জ্যোতিষ অতিশয় ধর্ম্মভীরু বালক ছিলেন। এইজন্য নলিনাক্ষের সহিত তাঁহার প্রাণের মিলন হইয়াছিল। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে উভয়ে বিভিন্ন পন্থাবলম্বন

করিয়াছেন। জ্যোতিষের পার্থীব জগতে উন্নতি, আর নলিনাক্ষ অন্তর্জগতে জয়লাভ করিয়া ইহপরকালের পথ মুক্ত করিতেছেন। উভয়ে পৃথক হইলেও জ্যোতিষ নলিনাক্ষের সংবাদ লইতে ছাড়িতেন না। এক্ষণে তাঁহাদের সেই ভালবাসার কথা নলিনাক্ষের স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। এতদিন অনন্যোপায়, অনন্যোচিত্ত হইয়া কেবল গুরু-সেবায় এবং গুরুপ্রদর্শিত শিক্ষা ও দীক্ষায় রত ছিলেন। এখন গুরুর আদেশে সংসারী হইতে যাইতেছেন - তাই সমস্ত দিন ইষ্ট-চিন্তার পর আহারাদি করিয়া রজনীযোগে সংসার-চিন্তায় রত হইতেন। এ চিন্তা ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে আনিতে হইত না। যখন অবসাদ-গ্রস্ত শরীরে নিদ্রার জন্য নলিনাক্ষ শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেন; নয়ন মুদিয়া যখন নিদ্রার কোমল-ক্রোড়ে অচেতন হইতেন, তখন স্বপ্নে এক দেবী-মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিত, হাসি হাসি মুখে জীবনের সেই পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া দিত—এ মূর্ত্তি আর কেহ নহে—নলিনাক্ষের বাল্য-সহচরী "নিরুপমা"। এই মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত হইলেই নব অনুরাগে নলিনাক্ষের হৃদয় ভরিয়া উঠিত, গৃহী হইবার আশা যেন তাঁহাকে সহস্র মুখে আশান্বিত করিত। এখন তাহারা সকলে কে কেমন আছে, নিরুপমাই বা এখন কোথায় কি অবস্থায় অবস্থান করিতেছে; ইত্যাদি চিন্তা তাঁহাকে বিভোর করিয়া তুলিল। বহুদিন রুদ্রপুর যান নাই; তাহারা কি এখনও তাঁহাকে মনোমধ্যে স্থান দিয়া রাখিয়াছে। কল্য প্রত্যূষেই ত রওনা হইতে হইবে। এই সকল চিন্তা করিতে করিতে রজনী প্রভাত

হইয়া গেল। প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ সমাধা করিয়া তিনি বহির্গমনের আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার জন্য এক খানি তরণী সজ্জিত করিয়া আসিয়াছেন। নলিনাক্ষ বয়সে ছোট হইলেও যে তাঁহার জীবন-দাতা, তিনি কি সে কৃতজ্ঞতা ভুলিতে পারেন ?

নবাব-সরকারে ব্যাঘ্রকে আশীর্ব্বাদ করিবার পর হইতে কৃষ্ণচন্দ্র নলিনাক্ষকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া ভক্তি করিতেন ; কিন্তু নলিনাক্ষ তাহাতে সাতিশয় অপ্রতিভ হইয়া মহারাজাকে তাঁহার প্রতি তাদৃশ সম্মান আরোপ করিতে নিষেধ করিতেন। নলিনাক্ষ বলেন—"মহারাজ ! এ সকল কার্য্যে মহাপুরুষত্বের লক্ষণ কিছুই নাই। ইহা তপঃনিরত ব্রাহ্মণগণের সাধারণ ধর্ম্ম, আশ্চর্য্যের বিষয় বা মহত্বের বিষয় ইহাতে কি আছে ? আপনি আমাকে যেমন নিজ-পুত্রের মত দেখিয়া থাকেন, সেইরূপই দর্শন করিবেন। আমার ন্যায় হীনমতি বালক মহারাজের নিকট হইতে ইহাপেক্ষা বেশী কিছু আশা করিতে পারে না" মরি মরি ! কি হীনতা স্বীকার, ধর্ম্মজীবনের কি অপূর্ব্ব নম্রতা ! এই হীনতাই না মহত্বের লক্ষণ ! বামদেব চলিয়া গিয়াছেন, এখন নলিনাক্ষ নদীয়ায় অবস্থান করিতেছেন বলিয়া মহারাজের ভরসা আছে, কোন বিপদাপদে পড়িয়া তাঁহাকে কাতর হইতে হইবে না। এখন নলিনাক্ষও নদীয়া ছাড়িয়া যাইতেছেন—তাই মহারাজের প্রাণ আজ নৈরাশ্য-সাগরে অবগাহন করিয়াছে।

দ্বিপ্রহরের পর বারবেলা পড়িবে—আর অপেক্ষা না করিয়া

নলিনাক্ষ শুভযাত্রা করিলেন। মহারাজ ছল ছল নেত্রে বলিলেন—"বৎস! বেশী দিন তথায় অবস্থান করিও না, সত্বর কার্য্য সমাধা করিয়া ফিরিয়া আসিবে। আমি আশা-পথ চাহিয়া রহিলাম।" পুত্রাধিক স্নেহে মহারাজ নলিনাক্ষকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন। বহুদিন পরে আবার নিরুপমার দর্শন লাভ হইবে। নিরুপমাও যে নলিনাক্ষের দর্শন লালসায় অস্থির। সেও যে নলিনাক্ষময় জগৎ দেখিয়া থাকে। আজ তাহার কি আনন্দ। পাঠক পাঠিকা! একবার অনুভব করতঃ পবিত্র প্রণয়ের ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া ধন্য হউন। নলিনাক্ষ ব্রহ্মচর্য্যের পর গুরুর আদেশ অনুসারে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, তিনি যে নিজ ব্রহ্মচর্য্যবলে এসংসারে আদর্শ গৃহীরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবেন—সংসারের যাবতীয় পবিত্র নিয়ম প্রতিপালন করিয়া যে ক্রমশঃ বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া আনন্দময় হইতে পারিবেন, তাহা কে না স্বীকার করিবে? এক্ষণে মা মঙ্গলময়ীর কৃপায় তিনি দুরন্ত সংসার-সংগ্রামে জয়লাভ করুন।

পাঠক! আসুন, আমরা তাহার মঙ্গল চিন্তা করিতে করিতে অদ্যকার মত বিদায় গ্রহণ করি।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—※—

জমিদার বাটী।

পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম। ভগবানের এই অনন্ত কৌশল পরিপূর্ণ পরিদৃশ্যমান জগৎ-রাজ্যে কিছুই সমভাবে থাকে না। কালপ্রবাহে একের অভ্যুদয় অন্যের পতন, ইহা আবহমান-কাল চলিয়া আসিতেছে। আজ যাহা নয়ন-গোচরীভূত, কাল তাহা অতীতের অতলতলে নিমজ্জিত-জগতের ইহাই নিয়ম। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না। কালে সকলকেই সমভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে হইবে-কালের এমনি অসীম অনন্ত প্রভাব। হে কাল! এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তোমার তুল্য প্রভাব আর কাহারও নাই, তুমি একমাত্র সর্ব্বব্যাপী-অনন্ত নামে অভিহিত, তোমার আদি নাই, অন্ত নাই। তোমার সুখদুঃখ-বিমিশ্রিত অনন্ত-ক্রোড়ে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কতশতবার পরি-বর্ত্তিত হইয়াছে, কতশতবার তোমাতে লয় পাইয়াছে। তুমি সর্ব্বদর্শী অনন্ত চক্ষু লইয়া কেবল তাহাই দেখিতেছ, আর বিধির বিধানানুসারে জগদ্ভাগ্যের প্রতিবিধান করিতেছ। সামান্য সুখ দুঃখের কথা বলি না, আজ সুখ, কাল দুঃখ, বা আজ দুঃখ, কাল সুখ,—ইহা ত আছেই। সত্যসন্ধ-জটাবল্কলধারী-বনবিহারী স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন,—

যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি।
যচ্চেতসানগণিতং তদিহাভ্যুপৈতি॥

প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপচক্রবর্ত্তী।
সোঽহম্ ব্রজামি বিপিনে জটিলস্তপস্বী॥

এই ত ত্রেতাবতার ভগবান রামচন্দ্রের কথা, সুতরাং সামান্য মানবের সুখ দুঃখের কথার আর প্রয়োজন কি? জগত কালেই উৎপত্তি আবার কালেই লয় পাইয়া থাকে। এই চন্দ্র-সূর্য্য নক্ষত্রাদি সমন্বিত আসমুদ্র পৃথিবী কতবার তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আর কতবার যে তোমাতে লয় পইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা কাহারও সাধ্য নহে। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, জন, যৌবন, এ সকলের তুমিই একমাত্র নিদান। জল বুদ্বুদ্ যেমন জলে উৎপত্তি, পরক্ষণে আবার তাহাতেই মিশিয়া যায়, জাগতিক সমস্ত বস্তুই তেমনি তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়া, তোমাতেই নিবৃত্ত হইতেছে। ভগবৎসৃষ্টির মূল প্রকৃতির প্রতি চাহিলে দেখিতে পাওয়া যায়— তাহার কিছুই চিরস্থায়ী নহে, যে দিকে চাও সেই দিকেই পরিবর্ত্তন— কেবল পরিবর্ত্তনের স্রোত একটানা বহিয়া চলিয়াছে। এইমাত্র দেখিলাম— রন্ধ্র-হীন— ঘনান্ধকারময়-স্ফুরিদ্বিদ্যুদ্দাম-চকিত আকাশ, আবার কিছু ক্ষণ পরে দেখি—নীরেন্দ্র-প্রতিম-নীল, নক্ষত্র-মালা পরিশোভিত রজত-শুভ্র-কৌমুদী-বিভাসিত গগনপট হাসিতেছে। মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-কিরণ-তপ্ত ধুলারাশিতে অস্থির হইয়া পড়িলাম, আবার প্রদোষে স্নিগ্ধমলয়ানিল-বাহিত পুষ্প-পরাগে শরীর শীতল হইল। আজ ফুল্লেন্দীবর-নয়না, শরদিন্দুনিভাননা প্রিয়-তমার হাসিতে অমৃতধারা ক্ষরণ হইয়া প্রাণে অনুপম শান্তি আনয়ন করিয়া দিতেছে— দুই দিন পরে, বেশী নয় সামান্য একটু জ্বর বিকার! রূপ যৌবন সমস্ত ধ্বংস; হয়ত চিরদিনের

জন্য বিদায় দিতে হইবে। আজ অনাঘ্রাতকুসুম সদৃশ, নখাঘাতবিবর্জ্জিত কিশলয়ের ন্যায় সুন্দর শিশু, প্রাণে স্বর্গীয় আনন্দের সঞ্চার করিয়া দিতেছে। দুই একদিন পরে হয়ত কালের একটী ফুৎকারে স্বর্গীয় দূত চিরকালের জন্য নরজগৎ ছাড়িয়া যাইবে। জগতের এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন—তাহার এই অনিত্যতা প্রতিনিয়ত স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও মানব ক্ষণকালের জন্য আপনার প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করিতে অগ্রসর হয় না; কেবল আমার আমার করিয়া বৃথা অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া অবাধে কত পাপ সঞ্চয় করিতেছে; নর-ভুবন তাহাদের চিরবাসস্থান মনে করিয়া একেবারে দিশেহারা হইয়াছে, কিন্তু কাল সর্ব্ব সাক্ষীস্বরূপ হইয়া জগতের সমস্ত প্রাণীর উপর একাধিপত্য বিস্তার করিতেছে, তাহাদের মস্তকোপরি সুতীক্ষ্ণ খড়্গ উত্তোলন করিয়া রাখিয়াছে, সময় হইলেই তাহা সকলের মস্তকে পতিত হইবে—ভিন্ন প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া তোমাকে ভিন্নরূপে নূতন করিয়া তুলিবে কিন্তু সে নূতনত্বও কয়দিনের জন্য! দেখিতে দেখিতে তাহাও আবার পরিবর্ত্তন স্রোতে ভাসিয়া যাইবে। আজ নানা জাতীয় প্রস্ফুটিত পুষ্পগন্ধে কাননভূমি আমোদিত, কল্য আর তাহা নাই—আতপতাপে তাপিত হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে; বসন্ত মারুত-হিল্লোলে পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা লতিকা সহকার-সম্মিলিত হইয়া ধীরে ধীরে কাঁপিতেছে—কাল দেখিবে—শিশির-বাতাহতা পত্র-পুষ্পবিরহিতা ব্রততী সহকার-চ্যুতা হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বলিতে হয়—পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম; অনন্ত কালই এই নিয়মের সর্ব্বময় কর্ত্তা। স্থাবরজঙ্গম একই সূত্রে

গ্রথিত, কালের একই নিয়মে পরিচালিত - এবং সেই জন্যই রুদ্রপুরের সম্ভ্রান্ত জমীদার বংশের এই দুর্দ্দশা। রুদ্রপুর এক খানি গণ্ডগ্রাম। পূর্ব্বে গ্রামটী বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখন কালবশে সে পূর্ব্ব গৌরব হারাইয়াছে। যে সকল সুন্দর উপবন এক সময়ে চিত্তবিকার নষ্ট করিত, এখন সে সকল শৃগাল ও বন্যবরাহের আবাসভূমি হইয়াছে। বীচিবিক্ষোভ-শীতল প্রস্ফুটিত কমলকুল এখনও সরসীর শোভাবর্দ্ধন করিতেছে, কিন্তু প্রভাতে বা প্রদোষে আর তাহার সোপানাবলীতে যুবতীর হাস্য, কঙ্কণ-ঝনৎকার, বৃদ্ধার তর্জ্জন গর্জ্জন, কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। সমগ্র গ্রামখানি যেন পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া দুঃখে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। কেবল অশ্বত্থ বৃক্ষের মর্ম্মর ধ্বনি, এবং দূরশ্রুত বিষাদ-সঙ্গীতের ন্যায় কীচক-তান এখন শুনিতে পাওয়া যায়। এমন একদিন ছিল, যখন এই গ্রামখানিতে পঞ্চশত দুর্গোৎসব হইত। শারদীয় প্রভাতে মাঙ্গলিক বাদ্য-ধ্বনিতে গ্রামখানি জাগিয়া উঠিত। ছোট ছোট বালকেরা নূতন পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া প্রতিমা দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইত। তখন গ্রামে লোক ধরিত না। হায়! সেই রুদ্রপুর আজ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। পাঠক! কালের পরিবর্ত্তনে আজ আমাদের চিরপরিচিত নীলরতন মুখোপাধ্যা-য়ের সোণার সংসারও একপ্রকার ছারখার হইয়া গিয়াছে।

৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় এই গ্রামের জমীদার ছিলেন। সত্যনিষ্ঠা, তপোধর্ম্মাদি যে সকল গুণ থাকিলে, লোকে মানব নামে অভিহিত হইতে পারে, জমীদার মহাশয় সেই সকল সদ্‌গুণেই ভূষিত ছিলেন। কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যার

বিবাহ দিতে পারিতেছেন না—জমীদার মহাশয়কে জানাইলেন, তিনি ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন, কোন বিধবা অর্থাভাবে তাহার পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইতে পারিতেছেন না, জমীদারকে জানাইলেন—তিনি তাঁহার পুত্রের ভার গ্রহণ করিলেন। আজ এখানে দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, জলাশয় খনন করাইতে হইবে, কাল বিদ্যালয়-সমূহ নির্ম্মাণ করাইতে হইবে-রাস্তাঘাট সংস্কার করাইতে হইবে ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই জমীদার মহাশয়ের উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালায় প্রত্যহ দেড়শত দুই শত লোক ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। বাটীতে লোকজন প্রভৃতি পোষ্যবর্গের অভাব ছিল না। কালের পরিবর্ত্তনে আজ সেই বংশের পরিণাম দেখিলে বাস্তবিক হৃদয় গভীর দুঃখে ভরিয়া যায়। জমীদার মহাশয় বহুপূর্ব্বে বিপত্নীক হইয়াছিলেন। সংসারে তাঁহার বিধবা ভগ্নী মহামায়া ও একমাত্র কন্যা নিরুপমা ব্যতীত আর কেহ ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর বিষয়াদি সমস্ত নষ্ট হইল। মহামায়া স্ত্রীলোক, সমস্ত বিষয় বিশেষতঃ জমীদারি-সংক্রান্ত ব্যাপার কিছুই বুঝিতেন না।

কয়েকজন অর্থপিশাচ ও জুয়াচোর জ্ঞাতি সব লুটিয়া খাইল। এখন কেবলমাত্র পূর্ব্ব-গৌরবের নিদর্শনস্বরূপ অট্টালিকাখানি আছে এবং মহামায়ার হাতে কিছু নগদ টাকা আছে।

জ্যৈষ্ঠ মাস। দারুণ গ্রীষ্ম। বেলা দ্বি-প্রহরের সময় রৌদ্রতপ্ত রুদ্রপুর যেন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। মাঝে-মাঝে এক একটা ঝটিকা বাতাস যেন অগ্নিকণা বর্ষণ করিতেছে।

বাপীতড়াগাদি সমস্ত শুষ্ক হইয়া আসিয়াছে। একে ত রুদ্রপুরে লোকসংখ্যা অতি বিরল, তাহাতে এখন আবার পথে জন-মানবের চিহ্নমাত্রও নাই। কেবল দুই একটী আতপ-ক্লিষ্ট গাভী ছায়াসমন্বিত বনবৃক্ষতলে শুইয়া রোমন্থন করিতেছে। ঝলসিত শ্যাম-পত্র পল্লব মধ্যে মাঝে মাঝে একটা শ্রান্ত কোকিল ফুকারিয়া ডাকিতেছে। মহিষেরা রৌদ্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া পল্বলে অবগাহন করিতেছে। জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। যে দুই চারিজন লোক আছে, তাহারা হয়ত কেহ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, লেপ মুড়ি দিয়াছে, কিম্বা প্লীহা-বর্দ্ধিতোদর, কেহ দাওয়ায় বসিয়া তামাকু খাইতেছে। রুদ্রপুরে গ্রামের মধ্য দিয়া একটি ক্ষীণতোয়া নদী প্রবাহিতা। এই নদীর তীরে আম্র, পনস, তাল, খর্জ্জুরাদি বৃক্ষশোভিত একটী উদ্যান মধ্যে বড় বড় থামওয়ালা একটী বাটী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই বাটীখানি ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের। আজ বাটীখানি যেন শ্রীহীন হইয়াছে। চুণ বালি খসিয়াছে। বাটীর ঠাকুরদালানে চটকা ও কপোত বাসা লইয়াছে। প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে আগাছা জন্মিয়াছে। তোষাখানা, কাছারীবাটী, নহ-বৎখানা সমস্ত বন্ধ। হায়! বৈঠকখানায় জমীদার মহাশয়ের গদিতে আজ কেহই নাই। ইতস্ততঃ তুলারাশি বিক্ষিপ্ত— আরস্থলা, ইন্দুরে গদিতে বাসা করিয়াছে! কি শোচনীয় পরি-বর্ত্তন! দেখিলে বাস্তবিক নয়ন অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়।

* * *

এই বাটির মধ্যে একটী দ্বিতলস্থ প্রকোষ্ঠে দুইটী স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। একজন প্রৌঢ়া, অপরা কিশোরী। প্রৌঢ়া

বিধবা, কিশোরী অবিবাহিতা রূপসী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। প্রৌঢ়া কিশোরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"নিরুপমা! আমার কথায় কি তুমি সম্মত হইবে না?"

কিশোরী আনত-আননে বসিয়া নখাঘাতে কেবল মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল। প্রৌঢ়ার কথার কোনও প্রত্যুত্তর করিল না।

প্রৌঢ়া পুনরপি বলিলেন—"মা! আমিও বোধ হয় আর বেশী দিন বাঁচিব না, আমার শরীর দিন দিন যেরূপ ভগ্ন হইতেছে, নানাপ্রকার রোগে যেরূপ জড়ীভূত হইতেছি, তাহাতে শীঘ্রই আমাকে ইহধাম ত্যাগ করিতে হইবে। এক্ষণে যদি তোমাকে একটী উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দিতে পারি, তাহা হইলে আমি নির্ভাবনায় মরিতে পারিব।" পাঠক! জমীদার-ভগ্নী মহামায়া, ভ্রাতুষ্পুত্রী নিরুপমাকে তাঁহার মনোনীত পাত্রে সমর্পণ করিবার জন্য বুঝাইতেছেন, কিন্তু নিরুপমা তাঁহার পিতৃষ্বসার স্থিরীকৃত পাত্রে প্রণয় স্থাপন করিতে কিছুতেই স্বীকৃতা হইতে পারিতেছেন না। তিনি আবাল্য যাহাকে ভালবাসিয়া আসিতেছেন, সেই প্রণয়পাত্র ভিন্ন আর কাহাকেও আত্মসমর্পণ করিবেন না—ইহাই তাঁহার মনোগত ইচ্ছা; কিন্তু লজ্জায় তিনি এ ইচ্ছাও প্রৌঢ়ার নিকট প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না।

এবারেও মহামায়া ভ্রাতুষ্পুত্রীর কোনও উত্তর না পাইয়া কথঞ্চিৎ রাগতস্বরে বলিলেন—"তবে মা! আমি আর বৃথা চিন্তা করিয়া কেন শরীর মাটী করি, যখন তুমি কোনও কথাই কহিবে না—মনোগত ইচ্ছা কিছু প্রকাশ করিবে না, তখন

আমার দোষ নাই। কিন্তু নিরুপমা, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি—তোমার কপালে অনেক কষ্ট আছে। তুমি যদি আমার কথায় সম্মত না হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে এক পয়সাও দিব না, আমার যা কিছু আছে, আমার দেবরপুত্রের নামে সমস্তই উইল করিয়া যাইব। তাহা হইলে তোমার কষ্টের একশেষ হইবে।"

এইবার নিরুপমা ছল ছল নেত্রে তাহার পিসীমার বদন প্রতি একবার তাকাইয়া, অশ্রুজলে ধরাতল অভিষিক্ত করিতে লাগিল, তথাপি কথা কহিল না। এই সময় নিরুপমার শৈশব-সহচরী সুকুমারী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নিরুপমাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বলিল-"পিসীমা! সইকে বকিতেছেন কেন? সে কি করিয়াছে?"

মহামায়া বলিলেন-"দেখ্‌না মা! আমি কত কষ্টে তোমার শ্বশুরের দ্বারা ওপাড়ার শ্রীধর বাঁড়ুয্যের পুত্রের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিতেছি। আজকাল এ অঞ্চলে তাঁহার ন্যায় বড়লোক আর কেহই নাই। আমি আর ক'দিন বাঁচিব মা! এখন যত শীঘ্র পারি ও'র একটা কিনারা করিয়া দিতে পারিলেই বাঁচি, কিন্তু পোড়া মেয়ে, বাঁড়ুয্যের বাটী বিবাহের কথা শুনিলেই কেবল কাঁদে। এখন কি করি মা, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না।" সুকুমারীর সহিত নিরুপমার সমস্ত মনের কথা হইত—কোন কথাই উভয়ের মধ্যে অজানা থাকিত না। সে একদিন তাহার সইয়ের মনোভাব জানিয়াছিল। তাই মহামায়ার কথা শুনিয়া বলিল—"পিসীমা! ও বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী বিয়ে ক'রতে স্বীকৃত নয়। তোমাদের বাটীতে পূর্ব্বে যে নায়েব

ছিল, বাসুদেবপুরের সেই ভবানী চাটুয্যের ছেলে নলিনাক্ষকে বিবাহ করিবে। নলিনাক্ষের পিতা মুখুয্যে মহাশয়ের কর্ম্মচারী হইলেও ধর্ম্মনিষ্ঠা গুণে তিনি নাকি নিরুর বাপের পরম বন্ধু ছিলেন, নলিনাক্ষকে তিনি নাকি এই জন্যই নিরাশ্রয় অবস্থা হইতে মানুষ করিয়াছেন এবং খুব লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, সই সে সব কথা জানে।"

মহামায়া সুকুমারীর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি বলিলেন—"নলিনাক্ষ লেখাপড়া শিখিলে কি হইবে, তাহাদের এখন কিছুই নাই ; অন্নাভাবে গুরুর বাড়ী থাকে, বাপ মা নাই। আমি জীবিত থাকিতে কিছুতেই তাহার সহিত বিবাহ দিতে পারিব না। এতে ও'র বিয়ে হ'ক আর নাই হ'ক।" এই বলিয়া মহামায়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে রৌদ্র পড়িয়া আসিয়াছিল। সুকুমারীর স্বামী বহুদিনের পর বাটী আসিয়াছে। আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে।

সুকুমারী সইকে কত বুঝাইয়া বলিল—"বুড়ী কবে মরে যাবে, আর অমন ক'রে সময় নষ্ট ক'রো না। তিনি তোমার মঙ্গলের জন্যই বলেন এখন তাঁর মতে আর ভিন্ন মত ক'রো না ভাই, তাহা হইলে তোমাকে বড় কষ্ট পেতে হবে, কেন আপনার কষ্ট আপনি ডেকে আন ?"

নিরুপমা বলিল—"সই ! মন কি কুসুম—তাই আজ ফুটিল, কাল ঝরিয়া পড়িবে ? আমি নলিনাক্ষ ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিব না—ইহাতে আজীবন অবিবাহিতা থাকিতে হয়, সেও ভাল।"

নিরুপমা কিছুতেই সম্মতি প্রদান করে না দেখিয়া সুকুমারী

সেদিনকার মত গৃহে গমন করিল। নিরুপমাও সন্ধ্যা সমাগতা দেখিয়া কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেল।

পিতার মৃত্যু সময় গুরুদেবকে সাক্ষ্য করিয়া যে কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়াছে; আজ জানিয়া শুনিয়া নিরুপমা সে সত্য কিরূপে লঙ্ঘন করে। মহামায়া ত আর এসকল বিষয় ভালরূপ জানেন না, আর বলিলেও তিনি তাহার কথা বিশ্বাস করেন না। তিনি মনে করেন, ধনীরপুত্রকে ভ্রাতুষ্পুত্রী সম্প্রদান করিলেই সে সুখী হইবে। মহামায়া সব জানেন, সব বুঝেন কিন্তু কপাল ছাড়া যে পথ নাই, কপালে সুখ না থাকিলে যে সুখী হওয়া অসম্ভব; মহামায়া সে কথা আদৌ বিশ্বাস করেন না। পিতামাতার প্রগাঢ় যত্নে শিক্ষিতা, বিদুষী নিরুপমা—তাই পিসীমাতার কথায় স্বীকৃত হইতে পারিতেছেন না বলিয়া তাঁহার বিষ-নয়নে পড়িয়াছেন। আর শ্রীধর বাঁড়ুয্যের পুত্র প্রবোধের সহিত কি নলিনাক্ষের তুলনা হয়! উভয়ের যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ধর্ম্মশিক্ষা ও চরিত্রগুণে নলিনাক্ষ স্বর্গের দেবতা, প্রবোধ নরকের কীট। নিরুপমার ন্যায় আদর্শ রমণী-রত্ন কখন প্রবোধের অঙ্কলক্ষ্মী হইতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মনোমালিন্য।

মন যাহা চায়—তাহা না পাইলে কিরূপ দুঃখ হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। মন নিজের ইচ্ছায় পরিতৃপ্ত হইতে চাহে; ব্যতিক্রম হইলে সে কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবে না, ইহা মানবের স্বভাবসিদ্ধ। পরের পরিতৃপ্তিতে আমার মন পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। মহামায়া নিরুপমার ভবিষ্যৎ সুখের জন্য রুদ্রপুরের নূতন জমীদার শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র প্রবোধচন্দ্রের সহিত তাহার পরিণয় সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। মহামায়া জানেন—শ্রীধরবাবুর অতুল ধনসম্পত্তি, একমাত্র পুত্র প্রবোধচন্দ্র ভবিষ্যতে তাহার উত্তরাধিকারী হইবে। প্রবোধ যদিও তাদৃশ লেখাপড়া শিখে নাই, কিন্তু তাহার ত অর্থ আছে; তাহাকে ত আর সামান্য অর্থের জন্য পরের উমেদারী করিতে হইবে না, তবে তাহার পক্ষে লেখাপড়া শিক্ষার আবশ্যক কি? মহামায়ার একান্ত ইচ্ছা, প্রবোধচন্দ্রের সহিত নিরুপমার উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হউক, এইজন্য তিনি আজ চারি মাস ধরিয়া সুকুমারীর শ্বশুরের দ্বারা শ্রীধরবাবুর মনোগতভাব অবগত হইয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি এক প্রকার সম্মত আছেন। মহামায়াও ভ্রাতুষ্পুত্রীর আজীবন সুখের জন্য তথায় বিবাহ দিতে রাজী হইয়াছেন; কিন্তু নিরুপমা ত বাড়ুয্যে-বাটিতে বিবাহ করিতে চাহে না; তথায় বিবাহের নাম হইলে সে কাঁদিয়া আকুল হয়, অশ্রুজলে ধরাতল অভিষিক্ত করে। সে

দরিদ্র অন্নসংস্থান-বিহীন নলিনাক্ষ ভিন্ন অপর কাহাকেও বিবাহ করিতে চাহে না। সুকুমারীর মুখে নিরুপমার এইরূপ মনোগত ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া মহামায়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। আজ কয়েক দিবস হইল, ইহার জন্য নিরুপমার সহিত তাঁহার একটু মনোমালিন্যও হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে ভালরূপ কথাবার্ত্তা নাই।

সুকুমারী প্রত্যহ আসিয়া বাল্য-সখী নিরুপমাকে মহামায়ার কথামত নানাপ্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করে; কিন্তু নিরুপমা ত আর বালিকা নহে, সে সুকুমারীর কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলে, "সই! অর্থের বিনিময়ে কি প্রণয়ে পরিতৃপ্তি হয়? প্রণয় স্বর্গীয় পদার্থ—যথার্থ প্রণয়পাত্র, শিক্ষিত ও সরল প্রকৃতি না হইলে কিছুতেই সুখের আশা করিতে পারা যায় না। যাহারা সদাই সামান্য পার্থিব অর্থের জন্য পরের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে, যাহারা চরিত্রহীন—অকর্ম্ম—কুকর্ম্ম—যাহাদের অঙ্গের ভূষণ, এ জীবনে অর্থই যাহাদের মূল-মন্ত্র, এরূপ হৃদয়-বিহীন পাত্রে আমি আত্মসমর্পণ করিয়া আজীবন কষ্ট স্বীকার করিতে পারিব না। পিসীমা আমার সুখের জন্য অজস্র অর্থ নষ্ট করিয়া যাহার সহিত আমায় পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে বলিতেছেন, তাহার সহিত আমার বিবাহ হইলে সুখী হওয়া ত পরের কথা, চিরকাল মনোকষ্টে কাল কাটাইতে হইবে। এ কথা আমি বেশ বুঝিয়াছি।"

সুকুমারী। শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থ পিশাচ, অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক, ইহা স্বীকার করি;—কিন্তু প্রবোধচন্দ্র যে ঐরূপ হইবে তাহার কোন মানে নাই।

নিরুপমা। সই! আমি প্রবোধচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে ভালরূপ অবগত আছি। তাহার ন্যায় চরিত্রহীন এবং ধনবানের পুত্রের

সহিত আমার ন্যায় দরিদ্রার বিবাহ কখনই সম্ভবপর নহে। এ ঘটনা সংঘটন হইলে নিশ্চয়ই পিসীমাতাকে পদে পদে লাঞ্ছিত ও অনুতপ্ত হইতে হইবে, আর আমারও দুঃখের অবধি থাকিবে না।

নিরুপমা সকল কথারই একটা না একটা দোষ ধরিয়া তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল। সুকুমারীর প্রয়াস ব্যর্থ হইল দেখিয়া, সে ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে মহামায়ার নিকট গমন করিল। বেলা তখন দুইটা বাজিয়াছে; গ্রীষ্মের দারুণ মধ্যাহ্নে তখন জীব-জগৎ স্তব্ধ; ভীষণ রৌদ্রে চারিদিক ভস্মীভূত হইতেছে। নিরুপমা ললিত-লবঙ্গ-লতাবৎ সুন্দরী, লতিকার ন্যায় কোমল ও কমনীয়, প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় গণ্ডস্থল। এই নিদারুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে ততোধিক এই নিদারুণ চিন্তায় তাহার শরীরকান্তি নিতান্ত বিমলিন হইয়া গিয়াছে! তাহার আকৃতি, রক্তিমাভ বদনের ভাব এবং সুন্দর ললাটপটের শিরঃকুঞ্চনভাব দেখিলে বোধ হয়, চিন্তারাক্ষসী তাহাকে বড়ই যাতনা প্রদান করিতেছে। মস্তকের কেশপাশ অযথা বিন্যস্ত, স্বেদাক্ত চূর্ণ কুন্তলদাম বদনের চারিধারে বিক্ষিপ্ত, দেখিলে সহসা তাহাকে পাগলিনী বলিয়া ভ্রম হয়। সেই সুবর্ণ প্রতিমা-সদৃশ-দেহ হইতে অনবরত স্বেদ নির্গত হইয়া দেহখানি যেন বিবর্ণ হইয়াছে।

৺নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের অট্টালিকার পাদদেশ বিধৌত করিয়া ক্ষীণতোয়া—বাঁকা নদী প্রবাহিতা; গ্রামখানির পূর্ব্ব-গৌরব স্মরণ করিয়া নদী দিন দিন ক্ষীণ-কলেবরা হইয়া যেন সাগরে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে। নদী যেন রুদ্রপুরের সে শোচনীয় দশা আর দেখিতে পারে না। তাই দিন দিন তাহার দশা

ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। নদীতে সে তরঙ্গ নাই, সুস্নিগ্ধ পবন-হিল্লোলে তরঙ্গকুল তালে তালে নৃত্য করিয়া ভাবুক মনে আর অপার আনন্দ প্রদান করিতে পারে না। সকলই গিয়াছে—আছে কেবল সলিল-রেখাবৎ একটী ক্ষুদ্র স্রোত। চিন্তার তুল্য শক্র মানবের আর নাই। সুস্থ মনকে অসুস্থ করিতে, মর্ম্মজ্বালায় দগ্ধ করিতে, চিন্তার ক্ষমতা অসীম। চিন্তাকুলা কুমারী নিরুপমা আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, দেহভার তাহার যেন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল,—ধীরে ধীরে উঠিয়া নদী সন্নিকটবর্ত্তী বাতায়ন পথে দাঁড়াইয়া মর্ম্মযাতনা দূর করিবার মানসে অভিনিবিষ্ট চিত্তে নীলিম আকাশ দর্শন করিতে লাগিল। সলিল-শিকর-বাহী-মৃদু-মন্দ পবন সঞ্চালনে দেহ যেন কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ হইল। বাতায়ন পথে দাঁড়াইয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিল।

* * * * * *

এদিকে সুকুমারী মহামায়ার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার অকৃতকার্য্যতার কথা নিবেদন করিয়া বলিল—"পিসীমা! সইকে কিছুতেই ফিরাইতে পারিলাম না, আমি অনেক বুঝাইলাম, প্রবোধচন্দ্রকে কিছুতেই সে বিবাহ করিতে চাহে না। সে বলে যাহারা অর্থের জন্য প্রজাবর্গের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতে পারে—তাহাদের হৃদয় কঠিন; সে হৃদয়ে প্রণয়ের তুল্য স্বর্গীয় কোমল পদার্থ কখনই স্থান পাইতে পারে না।" পাঠক! নলিনাক্ষ যেমন চিরদিন নিরুপমাকে হৃদয়-রাজ্যে অধিষ্ঠিত রাখিয়াছেন, নিরুপমার হৃদয়েও নলিনাক্ষ কিরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাহার হৃদয় কিরূপ নলিনাক্ষময়, আজ তাহা একবার অনুভব করুন।

মহামায়া তিন চারিদিন হইল নিরুপমার সহিত মনোমালিন্যের

ভাণ করিয়া বাক্যালাপ পর্য্যন্ত রহিত করিয়াছিলেন; যদি তাহাতে বালিকার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। এক্ষণে সুকুমারীর প্রমুখাৎ নিরুপমার পূর্ব্ববৎ প্রত্যুত্তর শুনিয়া বড়ই ক্ষুব্ধা হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া সুকুমারীকে বলিলেন, "মা! আমি ত ভাবিয়া ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। এখন কি করা যায় বল্ দেখি মা?"

সুকুমারী বলিল—"পিসীমা! তুমি বাবার সহিত পরামর্শ করিয়া আর একটী পাত্র ঠিক কর না, তাহা হইলে ত সমস্ত গোল মিটিয়া যায়।"

মহামায়া। মা! তাহাও ঠিক করিয়াছি; কল্য বৈকালে তোমার শ্বশুর আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "গোবিন্দপুরে একটি ভাল পাত্র আছে; তবে ছেলেটির অভিভাবক কেহ নাই। পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি বেশী কিছু নাই, তবে ছেলেটি সদ্বংশ-জাত এবং খুব লেখাপড়া শিখেছে।"

সুকুমারী। তবে পিসীমা! সেই পাত্রই ঠিক কর।

মহামায়া। মা! শুধু ভাল দেখিলেই ত হইবে না, কিছু সম্পত্তি দেখিয়া বিবাহ না দিলে আজকাল বড়ই ঠকিতে হয়। প্রবোধের বিষয় সম্পত্তির সীমা নাই। সে জন্যই ত আমার ঐ পাত্রে বিবাহ দিতে একান্ত ইচ্ছা; তা অভাগী ইহাতে বাধা হইল কৈ?

সুকুমারী। পিসীমা! আচ্ছা আমি একবার এই বিষয়ে সইয়ের মত নিয়ে আসি, দেখি সে কি বলে।

সুকুমারী চলিয়া গেল এবং প্রায় দুই ঘণ্টার পর ফিরিয়া আসিয়া বলিল "পিসীমা! 'ভবি ভোল্‌বার নয়' সে কিছুতেই

নলিনাক্ষকে ভুলিতে পারিবে না। নদী-সৈকতে নলিনাক্ষের সহিত বাল্যকালের সেই ধূলা-খেলা এখনও তাহার হৃদয়ে নবীভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহার হৃদয়ের ভিতর নলিনাক্ষ যেন সদাসর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে; কেমন করিয়া সে আবাল্যের পূজনীয় মূর্ত্তি মুছিয়া তাহার স্থানে অপর মূর্ত্তি স্থাপন করিবে, তাহা সে কখনই পারিবে না।"

সুকুমারীর মুখে নিরুপমার কথা শুনিয়া মহামায়া যারপর নাই ক্রুদ্ধা হইলেন। তিনি বলিলেন—"তাহার সহিত কথা ত বন্ধ করিয়াছিই, মনে করিয়াছিলাম, এই নূতন পাত্রে সে নিশ্চয়ই প্রণয় স্থাপন করিতে স্বীকৃতা হইবে, এখন দেখিতেছি যে, আমার মতের বিরুদ্ধে কায করাই তাহার মনোগত ইচ্ছা। লোকের নিকট আমাকে হাস্যাস্পদ হইতে হইতেছে, ইহা দেখিয়াও যদি তাহার চিত্ত-বিকার নষ্ট না হইল, তবে আমি আর তাহার জন্য ভাবিয়া মরি কেন? তাহার যাহা ইচ্ছা হয় করুক। আমি কালাই আমার দেবরপুত্রের বিবাহে এ বাটী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব!"

এই বলিয়া রাগে অধরোষ্ঠ দংশন করিতে করিতে মহামায়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

গতিক ভাল নয় দেখিয়া—সুকুমারীও তাহাদের বাটীতে গমন করিল। পিসীমার মনে যাহাই হউক, সুকুমারীর কিন্তু একান্ত ইচ্ছা, নিরুপমা যেন নলিনাক্ষের হস্তে আত্মসমর্পণ করে; সে সর্ব্বতোভাবে নলিনাক্ষের ন্যায় মহাধার্ম্মিক, নির্ম্মল চরিত্র, নিরহংকারী ও শিক্ষিত পাত্রের উপযুক্তা পাত্রী, সে বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে কি করিবে—মহামায়ার ও তাহার শ্বশুরের

কথার উপর কথা কহিবার ত তাহার ক্ষমতা নাই। এই জন্য উহাঁরা তাহাকে যেরূপভাবে চালিত করিতেছেন—সে সেইরূপেই চলিতেছে।

স্ত্রীজাতির নিকট অর্থের আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শিক্ষিতা-শিক্ষিত তাহার তত বুঝে না—অলঙ্কার দ্বারা শ্রীঅঙ্গ সাজাইতে পারিলে—তাহার স্বামী মূর্খই হউক, আর বিদ্বানই হউক, রমণীসমাজে তাহার সুযশ ও মহত্ত্ব বর্ণনাতীত। মহামায়া স্ত্রীজাতি; তিনি নিরুপমাকে বহুকষ্টে লালনপালন করিয়া এতবড় করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি নিরুপমাকে একটী ধনীর পুত্রবধূ এবং তাহার সেই সুকুমার দেহ-লতিকা নানাবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইতে দেখিলে, নয়ন সার্থক করিতে পারেন। নিরুপমা অতুলনীয়া সুন্দরী; যে সে পাত্রে বিবাহ দিয়া কষ্ট পাইলে মহামায়া বড়ই মর্ম্মযাতনা ভোগ করিবেন, নিরুপমার সে কষ্ট তিনি কখনই দেখিতে পারিবেন না। এই জন্যই ধনবান পাত্রে বিবাহ দিতে মহামায়ার একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু নিরুপমা যে নিজে সে সাধে বাদ সাধিতেছে।

আজ কয়েক দিবস হইল, মহামায়ার দেবর, তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে তাঁহাকে লইতে আসিয়াছিলেন,—আগামী সপ্তাহে তাঁহার যাইবার দিন। বিবাহ অতীব জাঁক জমকের সহিত সম্পন্ন হইবে, রুদ্রপুরের সকলেই আমন্ত্রিত হইয়াছেন। ছত্রপুর, গোবিন্দপুর প্রভৃতি মহকুমার সকল গ্রামের লোকই আহূত হইয়াছেন। মহামায়া মনের দুঃখে এবং নিরুপমাকে ভয়-প্রদর্শন মানসে কিয়দ্দিনের জন্য তথায় অবস্থান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন এবং ভ্রাতাকে কয়েকদিন অগ্রেই লইয়া

যাইবার জন্য সংবাদ দিলেন। ভৃত্য রূপচাঁদ সংবাদ লইয়া প্রস্থান করিল। শ্যামার মা—পুরাতন ঝি নিরুপমাকে লইয়া যাইবে, সুকুমারী প্রভৃতিও তাহার সঙ্গে যাইবে, এইরূপ স্থির হইল, কিন্তু উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘুচিল না।

মহামায়া শিক্ষিতা ও পাকা গৃহিণী হইলে কি হইবে, অর্থলিপ্সা তাঁহার বড়ই প্রবলা ছিল। শুনিয়াছিলেন, নলিনাক্ষ একে অর্থহীন, তাহাতে সন্ন্যাসীর শিষ্য, সে নাকি সন্ন্যাসীর মত দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, স্বপাকে আহার করে, গেরুয়া পরে। জানিয়া শুনিয়া মহামায়া এরূপ পাত্রে কন্যাদান করিতে কখনই পারিবেন না। আজকাল দেশে শ্রীপদ বাঁড়ুয্যের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা সৌভাগ্যের বিষয়। এ আশা ত্যাগ করা কখনই উচিত নহে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মরণে—মিলন।

অদ্য প্রত্যূষে মহামায়া দেবর-পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ছত্রপুরে গমন করিয়াছেন। নিরুপমা ও তাঁহার সই সুকুমারী একত্রে তথায় যাইবেন বলিয়া কালক্ষেপ করিতেছেন। সুকুমারীর স্বামী নবাব-সংসারে প্রধান ব্যবহারজীবির কার্য্য করেন। তিনি প্রবাসে পাঠাভ্যাস করিয়া এক্ষণে ছত্রপুরে ওকালতী করিতেছেন, তাঁহার আহারাদি না হইলে পতিব্রতা ত বাটী পরিত্যাগ করিতে পারেন না, এইজন্য নিরুপমা আজ এখন এই নির্জ্জন গৃহে একাকিনী বসিয়া আছেন। শ্যামার মা নীচে গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা, সময়ে সময়ে উপরে যাইয়া নিরুপমাকে আহারের জন্য ব্যস্ত করিতেছে।

মহামায়া গৃহে নাই। নিরুপমা একাকিনী গৃহে বসিয়া নানা প্রকার চিন্তায় দুর্ব্বিসহ যাতনা ভোগ করিতেছেন। আজ কিয়দ্দিবস হইল, তাঁহার মনে সুখের লেশমাত্র নাই। কি করিবেন, কি করিলে পিসীমার সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘুচিবে, এক্ষণে এই চিন্তাতেই তাঁহার মন অহরহঃ চিন্তামগ্ন। তিনি মনে করিতেছেন—হায়! মানুষের যৌবনকাল কেন উপস্থিত হয়, কেনই বা সেই সময় তাহাদের বিবাহের জন্য পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজনকে এত ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। যদি পিতা মাতা প্রভৃতি

আত্মীয় স্বজন বিবাহের জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে মনোমত পাত্রে বিবাহ দিতে তাঁহাদের এত অমনোযোগ হয় কেন? যে বিবাহের সহিত মানুষের জীবন-মরণ সম্বন্ধ—সে কার্য্য বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক সম্পন্ন না হয় কেন? এই সকল চিন্তা করিয়া নিরুপমা ক্রমশঃ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতেছেন। তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্য এই কয়দিনের মধ্যে কালিমাময় হইয়াছে। হঠাৎ তাঁহাকে দেখিলে—চিনিতে পারা যায় না। অতিরিক্ত চিন্তায় মানুষের দুর্দ্দশার একশেষ হয়; তাহার মনের স্থিরতা থাকে না। নিরুপমা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস সহকারে গাত্রোত্থান করিলেন এবং ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর হইতে একখানি রামায়ণ আনিয়া পাঠারম্ভ করিলেন। নিরুপমা রামায়ণ মহাভারতাদি পাঠ করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। এখনকার স্ত্রীলোকদিগের মত নাটক নভেল পাঠ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না। রামায়ণখানি লইয়া "সীতা দেবীর বিবাহ" পাঠ করিতে করিতে কতই অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। তাহার পর রামসীতার সম্মিলন প্রভৃতি পাঠ করিলেন, কিন্তু আজ তাঁহার পাঠে তাদৃশ একাগ্রতা নাই, যেন কিছুই ভাল লাগিতেছে না; প্রাণের ভিতর যেন একটা উদাস ভাব আসিয়া তাঁহার মনকে সতত চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। পাঠে তাঁহার মন কোন ক্রমেই নিবিষ্ট হইল না। পুস্তকাদি রাখিয়া আবার করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া চিন্তা-সাগরে নিমজ্জিতা হইলেন। নিষ্কর্ম্মা হইয়া একাকী বসিয়া থাকিলে চিন্তা রাক্ষসী মানবকে বিবিধমতে যন্ত্রণা দিতে চেষ্টা করে। নিরুপমা যতই এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, নলিনাক্ষের প্রতি

তাঁহার আসক্তি ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। নিরুপমা স্থির করিলেন,—যদি বিষ খাইয়া মরিতে হয়—সেও ভাল তথাপি নলিনাক্ষ ভিন্ন অন্য পাত্রে আত্ম-সমর্পণ করিব না। নিরুপমা আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। পরিণামে তাঁহার অদৃষ্ট-চক্র কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইবে, তাঁহার এই প্রণয়-স্রোত নলিনাক্ষরূপী মহাসাগরে কতদিনে মিশিবে, এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার দেহ অবসন্ন হইতে লাগিল। সুন্দর ললাটপটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মের সঞ্চার হইল। নিদারুণ গ্রীষ্মের দারুণ প্রকোপে ততোধিক ভীষণ চিন্তায় তাঁহার গৃহবাস অসহ্য বোধ হইল। নিরুপমা শয়নগৃহ হইতে নীচে নামিলেন এবং শীতল বায়ু সেবনে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইবার জন্য গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে প্রবেশ করিলেন।

উদ্যানটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। তাঁহার পিতা জীবিতাবস্থায় উদ্যানটীকে নানা প্রকার মনোহর পুষ্পবৃক্ষে সুশোভিত করিয়াছিলেন। মধ্যস্থলে একটী সরোবর, ক্ষুদ্র হইলেও সলিল অতি স্বচ্ছ। উদ্যানের চারিধারে আম, জাম, নারিকেল প্রভৃতি ফল-বৃক্ষ সকল মস্তকোন্নত করিয়া উদ্যানের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে, উদ্যানটীর চারিধারে প্রাচীর বেষ্টিত থাকায় সাধারণ লোক তাহাতে প্রবেশ করিতে পায় না। প্রাচীরের পরই রাজপথ; উত্তর দিকে নদী পার হইবার বাঁধাঘাট। নিরুপমা উদ্যানমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুশীতল অনিল স্পর্শে যেন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন, কিন্তু তাহা কতক্ষণের জন্য; যাহার হৃদয়ে গভীর চিন্তা, তাহার সুখ কতক্ষণ স্থায়ী! নিরুপমা চারিধারে পরিভ্রমণ করিতে

লাগিলেন। উদ্যানের দুইটী প্রবেশ পথ, একটী বাটী সংলগ্ন, আর একটী রাজপথ সংলগ্ন। এক্ষণে উদ্যানরক্ষকগণ আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহার্থ রাজপথ সংলগ্ন দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। নিরুপমা চারিদিকে বেড়াইতে বেড়াইতে, পুষ্পবৃক্ষের শোভা দেখিয়া ও সৌরভ পরিপূর্ণ বায়ুস্পর্শে হৃদয়বেগ কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিলেন। মধুমক্ষিকা সকল মধু আহরণে আসিয়া ফুলকুমারীর কত তোষামোদ করিতেছে; চারিধারে গুণ্ গুণ্ করিয়া তাহাদের কত গুণ গান করিতেছে; কুলনারী লজ্জায় অধোবদন হইয়া যেন তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে নিষেধ করিতেছে। কিন্তু কে কাহার কথা শুনে,—মধুকরনিকর যেন সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহার অন্তরে প্রবেশ করতঃ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া লইতেছে। ফলবৃক্ষ সকল ফল-ভারে নত হইয়া যেন বিধাতার চরণে প্রণিপাতচ্ছলে বলিতেছে— মানবগণ! সম্পদের সময় এইরূপ ভাবে নত হইও, তাহা হইলে তোমার সম্পদ কিছুদিন স্থায়ী হইবে—নতুবা ইহার সুখ স্বপ্নবৎ ক্ষণস্থায়ী।

উদ্যানটী যেন শান্তি-নিকেতন। ইহার ভিতর প্রবেশ করিলে, ইহার শোভা সন্দর্শন করিলে বাস্তবিকই সংসারদাবদগ্ধ অশান্তচিত্ত কিয়ৎক্ষণের জন্য শান্তিময় হয়। বৃক্ষরাজি অতিশয় ঘনসন্নিবিষ্ট বলিয়া দিবাভাগেও এখানে সৌরকর-রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না। উদ্যান মধ্যস্থিত সরোবরের দুইটী বাঁধাঘাট, নিরুপমা চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া পূর্ব্বদিকের বাঁধাঘাটে আসিয়া উপবেশন করিলেন। সলিল শিকরবাহী মৃদুমন্দ পবনান্দোলনে তাঁহার মনের অবসাদ কথঞ্চিৎ বিদূরিত

হইল। ম্লান মুখ কমল একটু ফুল্লভাব ধারণ করিল! তিনি সোপান পার্শ্বে একটী স্থানে উপবেশন করিলেন, বৃক্ষগাত্রে দেহভার ন্যস্ত করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন- হায়! এই সময় যদি নলিনাক্ষ নিকটে থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কত আনন্দ! কিন্তু মানুষ যাহা মনে ভাবে, ভগবান তাহা কি পূর্ণ করেন? শরীর সুস্থ হইলে নিদ্রা সহজেই মানবদেহ আশ্রয় করে! অহোরাত্র জাগরণ হেতু দেহ অবসন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে শীতল সমীর স্পর্শে সর্ব্বসুখময়ী তন্দ্রা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। নিরুপমা সুখাবেশে বৃক্ষগাত্রে আপন দেহ-লতা ন্যস্ত করিয়া তন্দ্রাবেশে সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন—নলিনাক্ষ যেন ছত্রপুর নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। রাজপথে যাইতে যাইতে নিরুপমার খেদোক্তি যেন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, তাই তিনি উদ্যান প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে কত প্রকার প্রণয়-বচনে পরিতুষ্ট করিতেছেন। এই সময় নিকটবর্ত্তী চূতশাখায় বসিয়া একটী কালপাখী "কুহু-কুহু" রবে পঞ্চমে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। তন্দ্রামগ্না নিরুপমার হৃদয়-তন্ত্রী যেন সেই সুরে বাজিয়া উঠিল। দেহ কণ্টকিত হইল। নিরুপমার নিদ্রাভঙ্গ হইলে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই, সকলই স্বপ্ন কোথায় নলিনাক্ষ, আর কোথায় তিনি। হায়! পোড়া কোকিল! কেন কুহুতানে অভাগিনীর সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ ক'র্‌লি, কই নিরুপমা ত তোর কোন অপরাধ করে নাই! আজ কয়েক দিবস যে সে নলিনাক্ষ নলিনাক্ষ করিয়া পাগল হইয়াছে। যার জন্য পাগলিনী হইয়া এতক্ষণ হৃদয়-মন্দিরে তন্ময় ভাবে যে মোহন মূরতি

দর্শন করিতেছিল, কেন কামসখা তাহার এমন সুখনিদ্রা ভঙ্গ করিলে, কেন বিষাদিনীকে বিষাদ-সাগরে ডুবাইলে? নিরুপমা আবেগভরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন- "নলিনাক্ষ! হৃদয়দেবতা! আর কত দিন এ হৃদয় শূন্য পড়িয়া থাকিবে, আর যে সহ্য হয় না, আর যে আমি তোমার বিরহযাতনা সহ্য করিতে পারি না। সেই গিয়াছ, আর একবারও কি দর্শনদানে দাসীর মনোবাসনা পূর্ণ করিতে নাই। এ দাসীর কথা কি তুমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ—যদি তাহাই হয়, তবে আমি আর কাহার আশায় এ দুর্ব্বিসহ জীবন-ভার বহন করিব। এ দেহ-মন-প্রাণ বহুদিন হইতে তোমার পবিত্র চরণে অর্পণ করিয়াছি, ইহাতে আর আমার অধিকার নাই বলিয়া, ইহাকে এতদিন নষ্ট করিতে পারি নাই। এখন যথার্থই যদি তুমি আমাকে বিস্মৃত হইয়া থাক, তবে আর আমার এ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিবার আবশ্যক কি? আর কোন্ সুখের আশায় এ পোড়া দেহভার বহন করিব? প্রখর রৌদ্রতাপে প্রকৃতি নিস্তব্ধ, উদ্যানও নির্জ্জন, আমি এই সময় সরোবর সলিলে এ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া সকল যাতনার অবসান করি না কেন?" এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উদ্দেশ্যে বলিলেন—"নলিনাক্ষ! নলিনাক্ষ! কেন তুমি নলিনাক্ষ হইয়াছিলে, কেন তুমি বাল্য হইতে এ অভাগিনীর প্রতি অমানুষিক ভালবাসা দেখাইয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিলে! শেষে চিরদিনের জন্য দেশান্তরিত হইয়া কেন তাহার কোমল প্রাণে এমন করিয়া দাগা দিলে? নলিনাক্ষ! ইহা কি তোমার ন্যায় পবিত্রচিত্ত, মহাপ্রাণ সাধু যুবকের উচিত কার্য্য হইয়াছে! যদি যাওয়া আসা পরিত্যাগ

প্রাণাধিক (নলিনাক্ষ) ! এখন বুঝিলাম এ (আমাদের মিলন) তোমার আমার ইচ্ছা নহে। * * * তখন আর পুড়িয়া মরি কেন ? এই সুশীতল সরোবরে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া সকল যন্ত্রণার শেষ করি।

[১২৩ পৃঃ।

করিবে ত দাসীকে লইয়া গেলে না কেন? আমিও গুরু গৃহে অবস্থান করিয়া তোমদের সেবায় পরকালের পথ মুক্ত করিতাম। যদি লইয়া গেলে না ত বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া উদাসপ্রাণে সময় নষ্ট করিলে কেন? তাহা হইলে ত তোমাকে পাইতে আজ আমার এত কষ্ট হইত না। অর্থ থাকিলে পিসীমা অনায়াসেই তোমার করে আমাকে সমর্পণ করিতে স্বীকৃতা হইতেন। প্রাণাধিক! এখন বুঝিলাম, এ তোমার আমার ইচ্ছা নহে। যাঁহার ইচ্ছায় এই চরাচর সুনিয়মে চলিতেছে; যাঁহার ইচ্ছায় মানব প্রেমে আত্ম-বলিদান দিয়া শেষে বিফল মনোরথ হয় এ সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা; যখন তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য্য করা নরজগতে কাহারও সাধ্য নাই; তখন আর পুড়িয়া মরি কেন? এই সুশীতল সরোবরে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়া সকল যন্ত্রণার শেষ করি।" এই বলিয়া যেমন তীর হইতে ঝম্প প্রদান করিবেন, অমনি পশ্চাদ্দিক হইতে দুইখানি সুশীতল হস্ত নিরুপমার প্রণয়তাপতপ্ত দেহলতা বেষ্টন করিয়া ধরিল; হতাশ অবসাদে অবসন্না নিরুপমা চৈতন্য-বিহীনা, বিবর্ণা হইয়া ভূতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। আগন্তুক নিজ উত্তরীয়খানি সরোবর সলিলে আর্দ্র করিয়া রমণীর হস্ত, পদ ও মুখমণ্ডলে জলসেক করিয়া নিজের পরিধেয় বস্ত্রের অগ্রভাগ দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন।

বেলা প্রায় মধ্যাহ্ন সমীপবর্ত্তী। প্রকৃতি নীরব, শাখী শাখে পক্ষী পক্ষিনী বদনে বদনার্পণ করিয়া নীরবে তুলায় অভিভূত। নিম্নে বৃক্ষতলে আগন্তুক নিরুপমার স্পন্দহীন পবিত্র দেহ ক্রোড়ে লইয়া ততোধিক নীরব, অশ্রুনীরে গণ্ডস্থল প্লাবিত।

পাঠক! এ দৃশ্য কি মনোহর, প্রণয়ীর পক্ষে এমন সুন্দরদৃশ্য কি আর আছে? অনেক শুশ্রূষার পর নিরুপমার চৈতন্য হইল, তিনি নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন—তাঁহারই প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের আরাধ্য দেবতার সুশীতল ক্রোড়ে আলুথালু-ভাবে লজ্জাহীনার ন্যায় শায়িতা! লজ্জায় তিনি পুনরায় চক্ষুর্দ্বয় নিমীলন করিলেন। সেই নিমীলিত নেত্রযুগল হইতে অজস্র অশ্রু প্রবাহিত হইয়া দেবতার পদধৌত করিতে লাগিল। এই-বার আগন্তুক আর হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া গাহিল—

বিধুমুখ মলিন কি দুঃখে,
ঝরিছে ঝরঝর তব আঁখি যুগল।
রবির বিরহে যেমন কমল,
ভাসে কমল তাহে সতত অসুখে॥

সলিলে সলিলের আকর্ষণ! আগন্তুকের অশ্রু আর থাকিতে পারিল না; প্রথম গণ্ড, পরে বক্ষঃ বহিয়া নিরুপমার পবিত্র দেহ স্পর্শ করিল। এইবার নিরুপমা আর থাকিতে পারিলেন না—গাত্রোত্থান করিয়া নিজ বস্ত্রাঞ্চলে আগন্তুকের নেত্রজল মার্জ্জনা করিতে করিতে বলিলেন—"নলিনাক্ষ, প্রাণেশ্বর! এতদিনে জানিলাম—বিধাতা আছেন, পবিত্র প্রণয়ও আছে। তোমার অদর্শনে আমি যেরূপ কষ্ট ভোগ করিতেছি, তুমিও যে অভাগিনীকে এতদিন না ভুলিয়া আমার মত সমবেদনা অনুভব করিতেছ, ইহা ভাবিয়াও এই নীরস হৃদয়-কন্দর আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।" এই বলিয়া নলিনাক্ষের পদধূলি লইয়া মস্তকে দিলেন।

নলিনাক্ষ বলিলেন—"নিরুপমা, প্রাণাধিকে! তুমি বৃথা আমার উপর অভিমান করিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলে, ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে আমার দোষ কিছুই নাই। আমি তোমাকে পাইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তোমার পিসীমাতা আমার হস্তে তোমাকে অর্পণ করিতে কোন ক্রমেই রাজী নহেন। তাই বলিয়া আত্মহত্যা করিবে? আত্মহত্যা যে মহাপাপ।"

নিরুপমা। প্রাণাধিক! মহাপাপ তা জানি, কিন্তু যখন হৃদয়বেগ সম্বরণ করিতে না পারি, যখন মনে হয় আমাকে অন্যের দাসী হইতে হইবে, তখন পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই মনে থাকে না। আমি যেন আত্মহারা হইয়া যাই।

নলিনাক্ষ। নিরুপমা! তুমিও যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ - নলিনাক্ষ ভিন্ন কাহাকেও আত্মসমর্পন করিবে না, আমিও তদ্রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যদি সংসারী হইতে হয় তবে তোমা ভিন্ন এ হৃদয়-মন্দিরে আর কাহারও স্থান হইবে না। ইহাতে যদি চির-কৌমার-ব্রত ধারণ করিয়া জীবনপাত করিতে হয়, তাহাতেও নলিনাক্ষ তিল মাত্র কষ্ট বোধ করিবে না; জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ বিধাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে, এক্ষণে এস—আমরা মনকে দৃঢ় করিয়া কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হই।

নিরুপমা। প্রিয়তম! তোমার অনুমতি আমার শিরোধার্য্য। আত্মহত্যা অপবিত্র বাসনা আজ হইতে বিসর্জ্জন দিলাম। এখন মনকে দৃঢ় করিয়া কর্ত্তব্য প্রতিপালনে যত্নবান হইলাম। তাহাতে যদি ভগবানের কৃপা না হয়, যদি একান্তই দেখি, যথার্থই

আমাকে অন্য পাত্রে প্রণয় স্থাপন করিয়া ব্যভিচারিণী হইতে হইল, তখন কার্য্যস্থলে তাহার প্রতিকার করিব।

নলিনাক্ষ। নিরুপমা! তোমার পিসীমাতা কোথায়?

নিরুপমা। তিনি ছত্রপুরে নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থ গিয়াছেন।

নলিনাক্ষ। তোমরা যাইবে না?

নিরুপমা। হাঁ আমি সইয়ের সহিত একত্রে আগামী কল্য প্রাতে তথায় যাইব।

"তবে আর কাল-বিলম্ব করিও না বেলা আর নাই। আমিও তথায় যাইব, তোমরা আইস! গুরুদেব জ্যোতিষের পিতার নামে একখানি পত্র দিয়াছেন। আমাদের বিবাহ বিষয়ে তোমার পিসীমার নিকট এই তাঁহার শেষ অনুরোধ, এইখানি তাঁহাকে দিয়া আমি ছত্রপুরে যাইব।" এই বলিয়া নলিনাক্ষ গাত্রোত্থান করিলেন। নিরুপমাও অনিচ্ছা সত্ত্বে গাত্রোত্থান করিলেন। উভয়ে পুনরায় চারিচক্ষের মিলন হইল।

"তথায় দেখা হইবে।" বলিয়া নলিনাক্ষ আর অপেক্ষা না করিয়া উন্মুক্ত দ্বার দিয়া উদ্যানের বাহির হইয়া পড়িলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, নিরুপমা একদৃষ্টে নলিনাক্ষের গমন-পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তারপর আপন মনে গৃহে ফিরিলেন। গুরুদেবের শেষ অনুরোধ—মহামায়াকে শুনিতেই হইবে। জ্যোতিষের পিতাও এইবার ভিন্নমত করিতে পারিবেন না ভাবিয়া নিরুপমার হৃদয় আনন্দে নাচিতে লাগিল। দিবসের রৌদ্র পড়িয়াছে, আর কাল-বিলম্ব করিলে সমস্ত কাজ শেষ করা হইবে না, কল্য প্রাতে তথায় না যাইলে পিসীমাতার রোষ আরও বর্দ্ধিত হইবে। এই ভাবিয়া নিরুপমা

তাড়াতাড়ি গৃহে আসিলেন; আজ তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের স্রোত ছুটিয়াছে। আজ মরুভূমিতে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইয়া দুকুল প্লাবিত করিতেছে। এই সময় সুকুমারী আসিয়া ডাকিল, "সই! আহারাদি শেষ হইয়াছে কি? বেলা যে আর নাই।"

নিরুপমা। ভাই! তোমার অপেক্ষায় আছি, আসিতে আজ এত বিলম্ব কেন, জ্যোতিষবাবু বুঝি আজ ঘরে আছেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিতে পার নাই?

সুকুমারী। হাঁ ভাই! তাঁহার শরীর আজ ভাল নহে। খাওয়া দাওয়ার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ক'র্ত্তে হ'লো ব'লে দেরী হ'য়েছে। কাল অনেক দূর যেতে হবে জ্বর টর না হলেই বাঁচি।

নিরুপমা। সই! ভগবান এমন ক'র্‌বেন না ও আজ রাত্রেই সেরে যাবে তাঁহার নাম ক'রে রজনী যাপন কর কোন ভাবনাই থাক্‌বে না।

সুকুমারী। ভাই! তা হ'লেই বাঁচি, তিনি না গেলে ত আর যাওয়া হবে না।

নিরুপমা। তা কি হয়—স্বামী ছাড়া স্ত্রী কি কোথাও যেতে পারে; আর তিনি সঙ্গে না গেলে আমরা স্ত্রীলোক এত দূর যাবই বা কি ক'রে?

সুকুমারী। ভাই! আমি আর বিলম্ব ক'র্ব্বো না, তুমি কাজ-কর্ম্ম সারিয়া রাখ, আমি কাল প্রাতঃকালেই আস্‌বো।

নিরুপমা। হাঁ ভাই! আমি সব ঠিক করিয়া রাখিব—তুমি তাঁহার নিকট যাও।

সুকুমারী চলিয়া গেল। রজনীযোগে জ্যোতিষ আর আহারাদি করিলেন না। শরীরের গ্লানি বিদূরিত হইয়া বেশ সুস্থ

বোধ হইল। প্রাতঃকালে সকলে ছত্রপুর যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

সুকুমারী সমস্ত ঠিক করিয়া নিরুপমাকে ডাকিতে আসিল এবং বলিল--"সই আর বিলম্ব কত?"

নিরুপমা। না ভাই, আর বিলম্ব নাই; তুমি প্রস্তুত হইয়া এস।

সুকুমারী। আমি প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছি, তুমি এস।

নিরুপমাও বাহির হইলেন। পরে দুই সইয়ে একত্রে শ্যামার মাকে ও রূপচাঁদকে সঙ্গে লইয়া ছত্রপুর যাইবার জন্য নৌকারোহণ করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে সুকুমারীর সহিত নিরুপমার কত মনের কথা হইল। সুকুমারী যে কেবল মহামায়ার উত্তেজনায় তাহাকে অন্য পাত্রে প্রণয় স্থাপন করিতে বলে—ইহা যে তাহার মনোগত ইচ্ছা নহে, তাহাও জ্ঞাপন করিল। নলিনাক্ষ ও নিরুপমার বিবাহ ত হইয়া গিয়াছে, কেবল একটা লৌকিক-ক্রিয়া বাকী আছে মাত্র, এ অবস্থায় কেহ কি পাত্রান্তর গ্রহণ করিতে পারে? তাহা হইলে ত ধর্ম্মহানী হইবে! এই নবীন দম্পতীর মধ্যে যে ধর্ম্মের মহিমা অতীব প্রবল—ধর্ম্মের বন্ধন কখনও কি শিথিল হইতে পারে,- ধর্ম্মের সংসারে কি অধর্ম্মের রাজত্ব সম্ভবপর। ইহাদের শুভ সম্মিলন যে ভগবানের অভিপ্রেত, মানবে কি তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারে? যাহা বিধাতার বিধান, তাহাতে মানবের বাধা দিবার ক্ষমতা নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বন্ধু-সনে।

আতপতাপতপ্ত জীবকুলের শান্তি-বিধানার্থ ধীরে ধীরে সন্ধ্যাসতী ধরাধামে অবতীর্ণা হইতেছেন। সূর্য্যদেব সমস্ত দিবস ধরাকে দগ্ধ করিয়া পশ্চিম গগনে চলিয়া পড়িলেন। সে দারুণ উত্তাপ, সে প্রখর কিরণ এখন আর নাই; শ্রান্তক্লান্ত দেহে অবসন্নভাবে ভগবান ভাস্কর, জগত হইতে অবসর গ্রহণ করিবার উপক্রম করিতেছেন। যাহারা পরের সন্তাপ সংঘটন করে, পরকে উৎপীড়ন করা যাহাদের কার্য্য; তাহাদিগকে অচিরাৎ জগৎ হইতে অস্তমিত হইতে হয়, ইহা দেখাইবার জন্যই যেন ভগবান দিবাকর সমস্ত দিন সংসার সন্তপ্ত করিয়া ম্লান ভাবে অস্তমিত হইতেছেন। সন্ধ্যা সমাগতা দেখিয়া পক্ষী-কুল কলরব করিয়া কুলায়াভিমুখে ধাবিত হইল। কৃষক সকল হল-স্কন্ধে গোগণ সহ গৃহে ফিরিতে লাগিল। রাখাল গোচা-রণে বিরত হইয়া গাভিবৎস সহ সরল প্রাণের তরল উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতধ্বনি করিতে করিতে আলয়াভিমুখে ধাবিত হইল। সাঁজের বাতি জ্বলিল, গৃহে গৃহে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। ত্রয়োদশীর চন্দ্র সন্ধ্যার পরক্ষণেই গগনগাত্রে সমুদিত হইয়া সুধারশ্মি বর্ষণে জীব-জীবনে অতুলানন্দ প্রদান করিতে লাগিল। সুশীতল সমীর সেবনার্থ সকলে বাঁকা নদীর বাঁধাঘাটে একে একে সমবেত হইতেছে, কেহ বা

তীরে ধীরে ধীরে পদচারণা করিতেছে। যুবকসকল স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া আপনাদের পাঠাভ্যাসের পরিচয় দিতেছে। আর যে সকল যুবক ভগবতী সরস্বতী দেবীর সহিত চির-বিবাদ করিয়াছে, তাহারা কিছু দূরে যাইয়া রসভাবে মত্ত হইয়াছে, কেহ বা মনের উল্লাসে সরস মধুর টপ্পার সুললিত স্বরে শ্রোতৃবর্গের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিতেছে। বৃদ্ধসকল পবিত্র সলিল মস্তকে স্পর্শ করিয়া ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতেছে। লীলাময়ের লীলাক্ষেত্র মাঝে কত প্রকারের জীব যে কত প্রকার লীলা প্রদর্শন করে—তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। প্রাক্তনের গতি অনুসারে খেলুয়ার হরিঠাকুর এই মায়া-প্রপঞ্চে আমাদিগকে লইয়া যেরূপভাবে খেলা করেন, আমরা সেইরূপ খেলাতেই মত্ত হই। ভাবি না যে, এ খেলা, আমাদিগকে বেশী দিন খেলিতে হইবে না; দুই দিন অগ্রে বা দুই দিন পশ্চাতে এ খেলার মেলা নিশ্চয়ই ভাঙ্গিবে; ভাবিলে বাঁকার ঘাটে এই পবিত্র সন্ধ্যা সমাগমে এরূপ পাপাভিনয় হইবে কেন? এখন ঘাটে কয়েকজন তপঃনিরত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্যতীত তাদৃশ জনসমাগম নাই। ইতিপূর্ব্বেই ঘাটে একখানি সুসজ্জিত নৌকা বাঁধা ছিল; কোন আরোহী নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে দুইটী মদোন্মত্ত যুবক টলিতে টলিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বাঁধা ঘাট তাদৃশ পরিসর নহে। বৃদ্ধ সকল স্থানে স্থানে বসিয়া, সায়ং-কালীন জপতপ করিতেছেন। যুবকদ্বয়ের সে বিষয়ে দৃষ্টি নাই; পিতৃস্থানীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের প্রতি একটু সম্মান করা ত পরের কথা, টলিতে টলিতে কাহারও ঘাড়ে পড়িল,

কাহাকেও ধাক্কা মারিয়া নৌকাভিমুখী হইতে লাগিল। সকলেই দেখিয়া অবাক, সকলেই চিনিলেন, বলিলেন —"শ্রীধর বাঁড়ুয্যের ছেলেটা অধঃপাতে গিয়াছে।" এতদিন গুপ্তভাবে ছিল, পিতা শয্যাগত হইবার পর হইতে প্রবোধচন্দ্রের পৈশাচিকতার এই প্রথম প্রকাশ। সে দিন বিবাহের শুভদিন ছিল। ক্রমে ক্রমে ঘাটে আরও লোক সমাগম হইল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি; সে সময় শ্রীধর বাঁড়ুয্যের তুল্য ধনী জমীদার রুদ্রপুরে আর কেহ ছিল না। এখন তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন; তাহাতে রুগ্ন, উত্থানশক্তি রহিত, বৈষয়িক কাজ কর্ম্মের ভার এখন পুত্র প্রবোধচন্দ্রই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সুবৃহৎ জমীদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারী প্রবোধ-চন্দ্র কোনও বিষয়েই দৃক্‌পাত করেন না, যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন, তাঁহার গতিরোধ করা বা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করা, কাহারও সাধ্য নাই। মহামায়ার দেবর-পুত্রের বিবাহে তিনিও আজ নিমন্ত্রিত হইয়া ছত্রপুরে গমন করিবেন; তজ্জন্য সন্ধ্যার প্রাক্কালেই বাঁকার ঘাটে তরণী সুসজ্জিত রহিয়াছে। মহামায়ার দেবর ইহাদের নায়েব, কাজেই জমীদার পুত্র স্বগণে তাঁহার আলয়ে আহূত হইয়াছেন; নিরুপমা যখন তথায় গিয়াছে, প্রবোধচন্দ্রকে তথায় যাইতেই হইবে, নিরুপমাকে করায়ত্ত করিবার এই ত মহা সুযোগ, যাহার জন্য প্রবোধচন্দ্র কত চেষ্টা করিতেছেন, কিছুতেই করিতে পারিতেছেন না, তাহাকে করতলগত করিবার এই ত মহামাহেন্দ্রক্ষণ। প্রবোধচন্দ্র বুঝিয়াছেন এখনও যে তাহাদের পরিণয়ে এত বাধা বিঘ্ন ঘটিতেছে, তাহার একমাত্র কারণ

মহামায়া। মহামায়া এতদিন আশ্বাস দিয়া এখন বোধ হয়, তিনিই আবার বিপরীত ভাব প্রকাশ করিতেছেন, তাই তাহাদের মিলনে এত গোলযোগ হইতেছে; কিন্তু গোলযোগ করিলে কি হইবে—তিনি ত সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। এখন মহামায়ার উপর তাহার আক্রোশ বৃদ্ধি হইয়াছে। মহামায়াকে কোনও প্রকারে হত্যা করিতে পারিলে, অভিভাবক-বিহীনা নিরুপমা নিশ্চয়ই তাহার হইবে। পাপাচরণে যাহার মন কলুষিত—এ জগতে তাহার অকর্ম্ম কি আছে?

হায় সঙ্গদোষ! তুমি মানুষকে এইরূপেই ধীরে ধীরে নরকের পথে লইয়া যাও। প্রবোধ ত লেখাপড়া শিক্ষা করে নাই, কিন্তু শ্রীধর যদি পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া—তাহাকে সৎসঙ্গে সহবাস করিতে বাধ্য করিতেন তাহা হইলে আর এরূপ হইত না। এইজন্য কথায় বলে—"যদি না পড়াবি পো, তবে সভায় নিয়ে থো"; কিন্তু তাহা হইলে কিরূপে অদৃষ্টের গতিরোধ করে—এমন সাধ্য কার আছে! পুত্র পিতার গুণানুসরণ করিয়াই থাকে, নতুবা "পিতৃগুণে গুণীপুত্র, পিতৃদোষে দোষী" এ কথার সার্থকতা সম্পাদন হইবে কিসে?

এখন আর ঘাটে অন্য লোকজন নাই। প্রবোধচন্দ্র নৌকার উপর উঠিয়া বিধিমতে সুরাদেবীর সেবা করিলেন। সঙ্গে তাঁহার সেই বাল্যবন্ধু—রমেশ, ইনিও গোবিন্দপুরের একটী ক্ষুদ্র জমীদারের পুত্র। পাঠক! দ্বিতীয়বার যাহার সহিত নিরুপমার সম্বন্ধ হইয়াছিল—ইনিই সেই রমেশ। উভয়ে

সুরাদেবীর অর্চ্চনা করিয়া নৌকারোহণ করিলেন। ভৃত্য আলবোলায় তামাক সাজিয়া দিল। উভয়ে এখন বেশ বিভোর হইয়াছেন। রমেশ তামাক টানিতে টানিতে বলিল -"প্রবোধ! মাগী কি মনে ক'রেছে? প্রথমে তোমার, পরে আমার সহিত নিরুপমার সম্বন্ধ স্থির করিল। কিন্তু কই বিবাহ দিবার সময় এরূপ করিতেছে কেন? তোমার ন্যায় ধনবান ও রূপবান পাত্র কি আর পাইবে?"

প্রবোধ। ভাই! আমার সন্দেহ হয়, ইহাতে মাগীরই কোন প্রকার কারসাজী আছে?

রমেশ। কিন্তু তাহার এরূপ মতিভ্রম হইবার কারণ কি? এখন আর তাহাদের কি আছে, যে তোমার অপমান করে? পূর্ব্বে না হয় ছিল।

প্রবোধ। না ভাই, এখন মাগীর কাছে বেশ টাকা কড়ি আছে।

রমেশ। আরে সে কি আবার টাকা, মেয়ে মানুষের হাতে নগদ টাকা কত থাকা সম্ভব, দশ পনর হাজার হউক, এর বেশী ত নয়?

প্রবোধ। আরে না না অত নয়, তবে কিছু আছে।

রমেশ। ভাই প্রবোধ! যেমন ক'রেই হউক, ছুঁড়িটাকে হস্তগত ক'র্ত্তে হবে। দেবভোগ্য বস্তু যেন কাকের উচ্ছিষ্ট না হয়। নলিনাক্ষ যেন কিছুতেই ছুঁড়িকে বিয়ে ক'র্ত্তে না পারে।

প্রবোধ। ভাই! ছুঁড়িটা লাখেকের একটা বটে; অমন রূপ, অমন চক্ষু, অমন টানা ভ্রূ, হাত পায়ের অমন সুগোল

গঠন, চাঁপা ফুলের ন্যায় অঙ্গুলী, কুন্দের ন্যায় দন্তপংক্তি, একাধারে এত রূপ, আমি আর কাহারও দেখি নাই। নিরুপমা বাস্তবিকই নিরুপমা—অমন স্ত্রীরত্ন লাভ করা নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের বিষয়। আমি সর্ব্বস্ব দিয়াও যদি নিরুপমাকে পাই, তাহাতেও রাজী আছি।

রমেশ। ভায়া চিন্তা কি, যদি সহজে না হয়, অন্য উপায় করা যাবে। আমরা ত কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইব না।

প্রবোধ। রমেশ! নিরুপমার উপর তোরও ত দৃষ্টি পড়েছে?

রমেশ। ভাই! তুমি থাকিতে আমি উহাকে বিয়ে ক'রতে রাজী নই, প্রথমে তোমার সহিত উহার সম্বন্ধ হয়েছে। যাহাতে নিরুপমা তোমার হয়, আমার এখন সেই ইচ্ছা। ইহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নাই। "যেন তেন প্রকারেণ সোদরং পরিপূরয়েৎ" বুঝ্লে ভাই?

প্রবোধ। বাহবা রমেশ! ন্যায়-শাস্ত্রেও তোমার যে বিশেষ দখল আছে দেখ্ছি।

রমেশ। ভায়া! দেবীর কৃপা হ'লে বোবারও বোল ফোটে, তা আমরা ত যাহা হউক দু'চার খানা কেতাব পড়েছি।

এইরূপ কথোপকথন হইতে এবং বন্ধুবান্ধব আসিয়া জুটীতে প্রায় রাত্রি আটটা হইল। আর অপেক্ষা করা বিধেয় নহে। প্রবোধচন্দ্র নৌকা খুলিয়া দিবার অনুমতি দিলেন। মাঝিরা প্রভুর অনুমতি পাইয়া ঝুপ্ঝাপ্ দাঁড় ফেলিতে লাগিল। অজগররূপিনী তরনী কয়েকটী পাপিষ্ঠ জীবকে উদরস্থ করিয়া মন্থর গমনে চলিতে লাগিল।

পাঠক! নিরুপমার ন্যায় আদর্শ রমণীর সহিত এই দুইটি পশুপ্রকৃতি যুবকের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, আর মহামায়া অর্থ-লোভে প্রবোধের ন্যায় চরিত্রহীন অপাত্রে নিরুপমারূপিণী পবিত্র প্রতিমাকে সম্প্রদান করিতে এক প্রকার কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। নিরুপমা পূর্ব্ব হইতেই ইহাদের চরিত্র বিশেষ-রূপে অবগত আছেন বলিয়া, কিছুতেই বিবাহ করিতে স্বীকৃতা নহেন। যদি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করা হয়, তাহা হইলে তিনি বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, এইরূপ অভি-প্রায় প্রকাশ করায় মহামায়ার সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। হায় মহামায়া! তুমি অবশ্য ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ধনীপুত্রের হস্তে ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সম্প্রদান করিতে যাইতেছ। কিন্তু অর্থে কি হইবে, যাহার চরিত্র নাই, সে যে অপদার্থ, মানবনামের অযোগ্য—পশুতুল্য। সহকার ভ্রমে কি মাধবী-লতা বংশবৃক্ষে বিজড়িত করিবে? সুখিনী করিবার পরিবর্ত্তে কি সযত্নপালিতা সুকুমারীকে অগাধ দুঃখার্ণবে ডুবাইবে? মা! ক্ষান্ত হও, অর্থ আছে বলিয়া, বানরের গলদেশে অমূল্য মুক্তা-মালা পরাইয়া দিও না—আদর হইবে না, সোহাগ পাইবে না, অনাদরে কর্ত্তিত হইয়া নষ্ট হইবে! আজ বাঁকার ঘাটে প্রবোধের এই বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় তুমি দেখ নাই; তাই তাহাকে মানুষ বলিতেছ। কিন্তু সে মানুষ নহে—নরাকারে পশু। তাহার সহিত নিরুপমা সম্প্রদানের নাম পর্য্যন্ত আর মুখে আনিও না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পল্লী-কাহিনী।

ছত্রপুর একখানি ক্ষুদ্র পল্লী। লোকজনের বাস অতি অল্প। অসংখ্য জন-সঙ্ঘের গভীর কোলাহল, গো, বা অশ্বশকটের অবিশ্রান্ত ঘোর ঘর্ঘর শব্দ, ছত্রপুরবাসী জনগণের কর্ণপটহ অহরহঃ পরিত্যক্ত করিতে পারে না। পল্লী-জীবন অতীব সুখকর দেখাইবার জন্যই বুঝি প্রকৃতি-সুন্দরী আপন মনোমত সুন্দর সাজে গ্রামখানিকে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। ছত্রপুর ক্ষুদ্র হইলেও প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সহরের ন্যায় এখানে বড় বড় ইষ্টক-নির্ম্মিত অট্টালিকা না থাকিলেও মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহ সকল এই গ্রামের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে; তাহা ইষ্টক-নির্ম্মিত অট্টালিকা অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। অট্টালিকা অপেক্ষা তাহার শোভা অধিক; ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকায় যে অর্থ ব্যয় হয়, ছত্রপুরে এই সকল মৃৎনির্ম্মিত গৃহেও অর্থ ব্যয় তাদৃশ বা তদপেক্ষা অধিক। এই গৃহ সকলের খড় ও খুঁটি-যুক্ত চালের কারুকার্য্য ও শিল্প-নৈপুণ্য দেখিলে বাস্তবিক চমৎকৃত হইতে হয়। সুউচ্চ মৃত্তিকা-স্তূপের উপর গৃহগুলি দণ্ডায়মান; সুবৃহৎ তালবৃক্ষের কাণ্ড সকল ইহার কাঠাম মাথায় করিয়া রহিয়াছে। কাঠামর চারিদিকে, উর্দ্ধের ও অধো-ভাগের চিত্র বিচিত্র দেখিলে কে না বলিবে, ইহা সহরের ইষ্টক

নির্ম্মিত অট্টালিকা অপেক্ষা সহস্রগুণে সুন্দর ও ব্যয়-সাপেক্ষ। দাসত্ব-নিগড়ের সহিত ছত্রপুরের অধিবাসিগণের সদ্ভাব নাই; তথাকার অধিকাংশ লোক স্বাধীনজীবী; চাষবাসের উপর নির্ভর করিয়া অনেকেই জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, ক্ষেত্রভরা শস্য, তরি তরকারী এখানে কাহারও অভাব নাই। যাহার নাই তাহাকেও প্রতি কাজে অর্থ ব্যয় করিয়া এ সকল খরিদ করিতে হয় না। পরস্পর আদান প্রদানে সকলের অভাব পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, গ্রামের মধ্যে পরস্পরে এইরূপ সহানুভূতি আছে বলিয়াই গ্রামখানি সুখ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ এবং নয়নমনোহর শোভায় সুশোভিত। তখন ঘটিকা-যন্ত্রের তাদৃশ প্রচলন ছিল না, আবশ্যকও হইত না; কারণ দাসত্ব-জীবীর সময় নিরুপণ আবশ্যক; দাসত্বনিগড়ের সহিত এখানে কাহারও সম্বন্ধ নাই, এখানকার সকলেই স্বাধীনজীবী—কেহ কাহারও দাসত্ব করে না, সময়ের তাদৃশ ধরা বাঁধা থাকিবে কেন? সূর্য্যদেব উদিত হইলেন—দেখিতে দেখিতে মধ্যগগনে আপন প্রখর কিরণ বিতরণ করিয়া, পশ্চিমগগণে বিশ্রাম লাভ করিলেন। ইহা দেখিয়াই গ্রামবাসিগণ দিবসের বেলার তারতম্য করিয়া থাকেন। গ্রামে অধিকাংশই ব্রাহ্মণের বাস, আশে পাশে শ্রমজীবিগণের বাসও যথেষ্ট, তাহারা ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। ব্রাহ্মণগণও তাহাদের প্রতি দয়া-প্রবণ, কাজেই সকলে সদ্ভাবে থাকিয়া গ্রামের সুখ-শান্তি বৃদ্ধি করিতেছে। গ্রামের পরই চারিদিকে সুবিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র, ধরণীর দৈর্ঘ্য দেখাইবার জন্য বিশাল বপু লইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা যে সময়ের কথা

বলিতেছি, সে সময় সবেমাত্র ধান্যক্ষেত্রের হরিদ্রাবর্ণ ঘুচিয়াছে, ধান গোলাজাত হইয়াছে। ক্ষেত্র সকল কতক দিনের জন্য যেন বিশ্রামসুখানুভব করিতেছে। গ্রামের অধিকাংশ রাস্তাই মৃত্তিকানির্ম্মিত, তবে কয়েক স্থান বর্ষাকালে কর্দ্দমাক্ত হয় বলিয়া গ্রামবাসিগণ নিজব্যয়ে ইষ্টক বা কাষ্ঠাদি বিস্তৃত করিয়া গমনাগমনের সুবিধা করিয়া লইয়াছে। পল্লীগ্রামে সমাজের বন্ধন বড়ই কঠিন ছিল। বিশেষতঃ তখন সামাজিকতা মানিয়া চলিতে না পারিলে কাহারও নিস্তার ছিল না, তুমি যত বড় ধনী এবং প্রতাপশালীই হওনা কেন, সমাজের নিকট তোমাকে অবনতভাবে আদেশ প্রতিপালন করিতেই হইবে নতুবা তোমার নিস্তার নাই। যদিও তখন দেশে নানাপ্রকার অশান্তি—মুসলমানগণ পতনোন্মুখ এবং ইংরাজের অভ্যুদয় সময়ে দেশে নানাপ্রকার কলহ বিবাদ, একের উন্নতি, অন্যের পতন সময়ে দেশের যে দুর্দ্দশা হইয়া থাকে তখন চারিদিকে তাহারই সূত্রপাত্র হইয়াছিল। তথাপি সামাজিক শাসন অমর্য্যাদা করা কাহারও সাধ্য ছিল না। গুপ্তভাবে পাপসঞ্চয় করিয়া ব্যক্ত হইয়া পড়িলেই তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইত। প্রবোধচন্দ্র এইবার ব্যক্ত হইয়া পড়িলেন সমাজ কি তাহাকে ছাড়িবে? এ অধর্ম্ম কতদিন চাপা থাকিবে?

মহামায়ার দেবর ভুবনেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ছত্রপুরের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তি। মহামায়ার স্বামীও একজন বড় কবিরাজ ছিলেন,—প্রসার, প্রতিপত্তি তাঁহার যথেষ্ট ছিল। পুত্রাদি না হওয়ায় উপার্জ্জনের যাবতীয় মুদ্রা মহামায়ারই হস্তগত হইয়াছিল। সকলেই অনুমান করিত মহামায়ার হস্তে নগদ মুদ্রা

প্রায় দশ পনর হাজার আছে। মহামায়া স্বামী বিয়োগের কিয়দ্দিন পরে পিতৃগৃহের পরিণাম দেখিয়া—রাজা-রাণী তুল্য ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায়—বাধ্য হইয়া নিরুপমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রুদ্রপুরের বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আসিবার সময় নিজের স্ত্রীধন ব্যতীত দেবরপুত্রকে তাঁহার যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তির দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। এই জন্য ভুবনেশ্বর বাবু জ্যেষ্ঠা-বধূকে জননীর তুল্য মান্য করিতেন, যাবতীয় কার্য্য তাঁহার মতামত লইয়াই সম্পন্ন হইত। স্ত্রীলোক হইলেও মহামায়ার বুদ্ধিশক্তি পুরুষের ন্যায় অতীব প্রখর ছিল। এই জন্য আপামরসাধারণ সকলেই তাঁহার তীব্রবুদ্ধির প্রশংসা করিত। রুদ্রপুরের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত জমীদার শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও কার্য্যদক্ষতা গুণে তাঁহার প্রশংসা করিতেন, মনে মনে সভয়-সম্ভ্রম করিতেও ক্রটী করিতেন না; এই শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কূটমন্ত্রে যদিও মহামায়ার সহোদর ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের সমস্ত জমীদারী উৎসন্ন গিয়াছে, যদিও প্রকারান্তরে তিনি সমস্ত হস্তগত করিয়া নিরুপমাকে পথের ভিখারিণী করিয়াছেন, তথাপি এখন তিনি সে সকল বিস্মৃত হইয়া তাঁহার প্রাণের নিরুপমাকে তদীয় একমাত্র পুত্র প্রবোধচন্দ্রের হস্তে সম্প্রদান করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহা হইলেও নিরুপমা একদিন তাঁহার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে। এখন রুদ্রপুরের মধ্যে তাঁহাদের তুল্য ধনবান আর কেহই নাই। প্রবোধচন্দ্র পিতার একমাত্র পুত্র, বৃদ্ধ পিতার অবর্ত্তমানে সমস্তই প্রবোধচন্দ্রের হইবে। নিরুপমার সহিত তাহার বিবাহ হইলে, সেও

আজীবন সুখে থাকিবে। আর মহামায়ার যাহা কিছু ধন সম্পত্তি আছে, তাহা ত ভবিষ্যতে নিরুপমারই হইবে। তিনি প্রবোধচন্দ্রের অসীম জমীদারির ভিতর অর্থ-সুধাই অবলোকন করিতেছেন। এ সুধায় সযত্ন প্রতিপালিতা সুধামুখী নিরুপমা সুখে কাল কাটাইতে পারিবে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস; কিন্তু তিনি ত জানেন না যে এ সুধায় প্রবোধের অশিক্ষিত চরিত্র ক্রমশঃ গরল উদ্গীরণ করিতেছে, প্রবোধ ক্রমশঃ অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। না জানিয়া, স্ত্রী জাতীর এরূপ ভ্রম অসম্ভব নহে।

ভুবনেশ্বর শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নায়েব, ছত্রপুর গ্রামে তিনিও এখন যথেষ্ট ভূসম্পত্তি করিয়াছেন এবং নগদ টাকা যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেছেন। গ্রামে তাঁহার প্রসার প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। এই গ্রামেরই জনৈক কুলীনপুত্রের সহিত তাঁর কন্যা সৌদামিনীর শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। সেই জন্য আদর্শ-গৃহিণী মহামায়া আসিয়া কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। বিবাহের মহতী ঘটা, নিকটবর্ত্তী পাঁচ সাতখানি গ্রামের লোকসমূহ আমন্ত্রিত হইয়াছেন। দুই তিন দিন ধরিয়া বাটিতে আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। ভুবনেশ্বরের জ্ঞাতি, আত্মীয়, পোষ্য নলিনাক্ষ এবং প্রভুপুত্র প্রবোধচন্দ্র স্বগণে বিবাহবাটীতে আহূত হইয়াছেন। পাঠক এ সংবাদ পূর্ব্বপরিচ্ছেদে অবগত আছেন। প্রবোধচন্দ্র কখনও এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হন না। নিমন্ত্রণাদি রক্ষা করা তাঁহার চরিত্র-বিরুদ্ধ. সমাজে বসিয়া লোকের সহিত সমাদৃত ও আপ্যায়িত হইতে প্রবোধচন্দ্র আদৌ অভ্যস্থ

নহেন। তাঁহার চরিত্র কিছুমাত্র মার্জ্জিত হয় নাই, সরস্বতীর সহিত তাঁহার চিরবিবাদ · বাল্যকালে সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও সে আজীবন গুণ্ডামী করিয়া জীবন কাটাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে। তবে পিতা নানাপ্রকার পীড়ায় অস্থির, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই; তাহার উপর নায়েব মহাশয়ের অনুনয় বিনয়, ততোধিক কারণ নিরুপমাকে হস্তগত করা, এই সকল কারণে তিনি দলবলসহ এই দূরদেশে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। হায়! রমণীসৌন্দর্য্য! তুমি অজ্ঞান কামোন্মত্ত পুরুষকে এইরূপ প্রকারেই "নাকফোঁড়া বলদের" মত অহরহঃ যন্ত্রণা প্রদান কর; শেষে আপনার তীব্র কটাক্ষবাণে তাহার প্রাণ বিনাশ করিয়া জগতে আপনার অসীম মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান কর! তোমার যাদুকরী ক্ষমতা এরূপ অপ্রমেয় না হইলে, দেবগণ পর্য্যন্ত তোমার ভয়ে সশঙ্কিত হইবেন কেন? আবার কেনই বা তোমার আপাততঃ মধুর প্রণয়-সরে অবগাহন করিবার জন্য অকার্য্য-সাধনেও কুণ্ঠিত হন না? হায়! সৌন্দর্য্যের আধার যোষিদ্বর্গ, তোমাদের অতুলনীয় ক্ষমতাকে ধন্য!

মহামায়া প্রবোধের সহিত যে নিরুপমার বিবাহ দিতে এরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন এবং তাহা লইয়া যে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য সঙ্ঘটিত হইয়াছে, ভুবনেশ্বর তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানেন না। তিনি জানিতেন—৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় জীবিতাবস্থায় তাঁহার পালক-পুত্র নলিনাক্ষের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবার মনস্থ করিয়াছেন। নলিনাক্ষ যে, রূপে গুণে সর্ব্বতোভাবেই নিরুপমার উপযুক্ত পাত্র, তাহা

তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। এই জন্যই স্বামী-স্ত্রীতে তাঁহাকে জামাতা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন; এই জন্যই তিনি পুত্রাধিক স্নেহে তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন; কিন্তু দুরন্ত কাল সে আশা সুসিদ্ধ হইতে না হইতেই নিরুপমার পিতামাতাকে কবলিত করিল। আশালতা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল। মহামায়া তখন স্বামীগৃহে, তিনি এ বিষয়ের বিন্দুমাত্র অবগত ছিলেন না। বাল্যকালে একত্রে খেলা ধূলায় কাল কাটাইলেও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দর্শন-লাভ এক প্রকার দুরূহ হইয়াছিল। তবে পিতার মৃত্যু সময়ে নিরুপমা দুই একবার নলিনাক্ষকে দেখিয়াছিলেন এবং তখন হইতে নিজ প্রাণমন-জীবন-যৌবন নলিনাক্ষের পদে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সারল্য-বিমিশ্রিত-বাল্যের সরল আত্মসমর্পণ নিরুপমা এখন কেমন করিয়া ভুলিবেন? এই জন্যই তাঁহার জননীসমা পিসীমাতার সহিত বাদবিসম্বাদ, এই জন্যই তাঁহাদের ভিতর এতাদৃশ মনোমালিন্যের সূত্রপাত। বিবাহবার্তা আসিয়া সে মনোবিবাদের যদিও কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে, তথাপি এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই! পাছে কেহ কোনও প্রকার দোষারোপ করে, এই জন্য উভয়ের মধ্যে যেন কিছু কিছু সদ্ভাব হইয়াছে। সমাগত আত্মীয় স্বজন কেহই কিছু জানিতে পারিল না। নিরুপমা সকলেরই আদর যত্নে এখানে সঙ্গীগণের সহিত বেশ সুখে সচ্ছন্দে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এ জগতে সৌন্দর্য্যের পূজা কে না করিয়া থাকে। ভগবানের সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রতি তাকাইয়া কে না অপার

আনন্দ অনুভব করে? সৌন্দর্য্য যে ভগবানের স্বরূপ-মূর্ত্তি! যাহার শারীরিক সৌন্দর্য্য আছে, ভগবানের কৃপাও তাহার প্রতি সমধিক বিরাজমান। সৌন্দর্য্যবতী নরনারী ত সকলেরই ভালবাসার সামগ্রী। নিরুপমার রূপ আছে—সে রূপ, গুণের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া অতি রমণীয় ভাব ধারণ করিয়াছে। তাই নিরুপমাকে যে দেখে, সেই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না।

তখন বাটীতে কোন কাজকর্ম্ম হইলে পূর্ব্ব হইতেই যাবতীয় আত্মীয় স্বজন ও কুটুম্বগণের নিমন্ত্রণ হইত। ভুবনেশ্বর কন্যার বিবাহে সকল আত্মীয়কেই আহ্বান করিয়াছেন। এখন দুইদিন বাকী, কেহ আসিয়াছেন, কেহ বা আসিতেছেন। ইতিমধ্যেই গৃহ-প্রাঙ্গণ রমণী-কলকণ্ঠে মুখরিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উৎসবে-ব্যসন।

বিবাহের শুভ বাসর সমাগত। আজি ছত্রপুরে ভুবনেশ্বরের কন্যা সৌদামিনীর বিবাহ। বিবাহে মহাধুম। ভুবনেশ্বর মহৎ প্রকৃতির লোক হইলেও দরিদ্রতা হেতু এতদিন মুক্তহস্ত হইয়া কোন কাজ-কর্ম্মে খরচ পত্র করিতে পারেন নাই। এখন তাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন; জমীদারের কাজে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন। সৎকার্য্যে অর্থের সদ্ব্যবহার করিবার এই ত সময়। ভুবনেশ্বর সৎকার্য্য করিতে পারিলেই আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করেন বাল্যকাল হইতে এই সকল কাজে তাঁহার আগ্রহ সমধিক, কিন্তু দরিদ্রতা এতদিন তাঁহার সে সাধে বাদ সাধিয়াছিল। এখন সময় হইয়াছে; ভগবান তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, কাজেই প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিতে তাহার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। একমাত্র কন্যা সৌদামিনীর বিবাহে তাই তিনি মুক্তহস্ত হইয়া খরচ পত্র করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

ভুবনেশ্বরের গৃহ প্রাঙ্গণ আজ আনন্দে উৎফুল্ল, চারিদিকেই আনন্দের স্রোত প্রবাহিত। হিন্দুগৃহে বিবাহের তুল্য আনন্দ আর নাই; সকল জাতিরই বিবাহে অর্থ ব্যয় হয় বটে; কিন্তু হিন্দুর বিবাহে যেরূপ ব্যয়বাহুল্য, ধর্ম্মের সহিত যেরূপ অর্থের সদ্ব্যয় হয়, অন্য জাতির মধ্যে ঠিক সেরূপ ধর্ম্মভাব দেখিতে

পাওয়া যায় না। হিন্দুর বিবাহ--দুইটী অপরিচিত পুত্র কন্যার একত্র সম্মিলন, যাহা ইহজীবনের সুখে দুঃখে সমান অধিকারী। স্ত্রী পুরুষ দুইটীকে একটী করিয়া দিবার জন্য হিন্দুর বিবাহ-প্রথার প্রচলন। শুধু ইহজীবনে কেন, পরজীবনেও তাহাদের সম্বন্ধ অটুট রাখিবার ব্যবস্থা সনাতন হিন্দুশাস্ত্রের অমোঘ বিধান। অন্য জাতির বিবাহ তাহা নহে, কেবল ইহজীবনের সুখ-সচ্ছন্দের উপর তাহাদের বিবাহবন্ধন নির্ভর করিতেছে, সুখৈশ্বর্য্যের তিলমাত্র ব্যতিক্রম হইলে সে বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। অন্য কোন জাতির ধর্ম্মকার্য্যের সহিত পবিত্র আর্য্যজাতির ধর্ম্মকার্য্যের তুলনা হইতে পারে না। কোন ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয়বাহুল্য করিতে হইলে আত্মীয় লোকজনের নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা কার্য্যে সুযশ লাভ করিতে পারা যায় না। কেবলমাত্র পর লইয়া এ কার্য্য সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইতে পারে না। যাহার আত্মীয় লোকজন অনেক আছে, এ সকল কাজে তাহারই সুযশ লাভ হইয়া থাকে। ভুবনেশ্বর বাবুর লোকজনের অভাব নাই। আত্মীয় লোকজনে তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছে; স্ত্রী পুরুষ সকলেই আপন আপন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ আসর সাজাইতেছে, কেহ লোকজন বসিবার সুবন্দোবস্ত করিতেছে, কেহ আলোক সজ্জায় ব্যস্ত হইয়াছে, কেহ গৃহ প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিবার জন্য উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিতেছে, কেহ বা আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ করিতেছে। ভুবনেশ্বর বাবুর পল্লীভবন আজ এক নূতন শোভায় সুশোভিত। অন্দরমহলেও শোভার কিছুমাত্র ত্রুটী নাই. সেখানেও রূপের

হাট বসিয়াছে, বৃদ্ধা রমণীগণ নিজ নিজ কাজ-কর্ম্মে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। যাহাদের বয়স আছে, তাহাদের ত কথাই নাই। বাসর জাগিতে হইবে বলিয়া তাহারা প্রাতঃকাল হইতেই ব্যস্ত; কে কিরূপভাবে সজ্জিত হইয়া বাসর গৃহ উজ্জ্বল করিবে, তাহারই ব্যবস্থা হইতেছে। বেলা আর বেশী নাই। নিরুপমা ও সুকুমারী আপন সাজ সজ্জায় সজ্জিতা হইয়াছেন। তাহাদের রূপসাগরে সৌন্দর্য্যের তুফান বহিতেছে। নিরুপমার ঘন-বিকুঞ্চিত-শ্যামল কেশকলাপ সুবর্ণ পুষ্পে পরিশোভিত, যেন কৃষ্ণা-রজনীর ঘন-নিবিড়-কুন্তলে তারাহার সুশোভিত; একে নিরুপমার সেই সুঠাম, মনমোহন অত্যুজ্জ্বল রূপরাশি, তাহার উপর নানা কারুকার্য্যবিশিষ্ট মণিময় অলঙ্কারের অপূর্ব্ব সংযোগে রূপ-জ্যোতিঃ যে কিরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা লেখনীর দ্বারা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। নিরুপমা, সুকুমারী এবং অন্যান্য রমণীগণের বেশভূষা সমাধা হইলে সৌদামিনীর বিবাহ-সজ্জা আরম্ভ হইল। নিরুপমা ও সুকুমারী এইবার সৌদামিনীকে সাজাইতে বসিলেন। বিবাহের ফুল ফুটিলে, রমণী-জীবনে যৌবন সংযোগ হইলে স্বভাবতঃই রূপ-জ্যোতিঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহার উপর পরিপাটীরূপে সাজাইতে পারিলে যে সে রূপ অপরূপ হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? সৌদামিনীর বিবাহ-সজ্জা দেখিয়া সকলেই অবাক হইল; সকলেই একবাক্যে নিরুপমা ও সুকুমারীর সুখ্যাতি করিতে লাগিল। কষিত-কাঞ্চন-বর্ণা সৌদামিনী একখানি ময়ূরকণ্ঠি চেলি পরিধান করিয়া সকলকে প্রণাম করিল। সকলেই বলিতে লাগিল—জলদজালসমাচ্ছন্ন

চঞ্চলা চপলা যেন আজ স্থিরভাবে গৃহ উজ্জ্বল করিতেছে। আজি ভুবনেশ্বর বাবুর গৃহে আগত অভ্যাগত, আত্মীয়স্বজন সকলেই আসিয়াছেন। কেবল তাঁহার প্রভুপুত্র প্রবোধচন্দ্র দলবল সহ এখনও আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই। ভুবনেশ্বর পার্শ্বের বাটীতে তাঁহার জন্য একটী গৃহ সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রবোধচন্দ্র বন্ধুবান্ধব সহ তথায় অবস্থান করিবেন। গীত বাদ্যাদির আয়োজনও করা হইয়াছে। তবে আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের তাদৃশ সমাবেশ হয় নাই এবং প্রচলনও ছিল না। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ স্থানেই কীর্ত্তন হইয়া থাকে এবং তাহার উপযুক্ত বাদ্যযন্ত্রের অভাব তথায় নাই। এ আসরেও তাহাই হইয়াছে, তবে বেশীর ভাগ একটী জোড়া বাঁয়া তবলা ভুবনেশ্বর বাবু বহু কষ্টে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। নব্য-সম্প্রদায়-যুবকগণের মধ্যে ইহার আদর সমধিক, না হইলেও গীতবাদ্য অসম্ভব। প্রভুপুত্রের আদর অভ্যর্থনার জন্য গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোকও নিয়োজিত হইয়াছেন। নলিনাক্ষ ও জ্যোতিষ অপরাপর কাজ কর্ম্মের অধ্যক্ষতা করিতেছেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সমস্ত দিবস অক্লান্তভাবে রশ্মি বিতরণ করিয়া সূর্য্যদেব শ্রম-রক্তিম-বদনে, ক্লান্ত দেহ শীতল করিবার মানসে পশ্চিম সমুদ্রের শীতল সলিলে অবগাহন করিলেন। চারিদিকে সাঁজের বাতি জ্বলিল বিবাহ প্রাঙ্গণও আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পরই বিবাহের লগ্ন,—দেখিতে দেখিতে স্বজনগণ সমভিব্যাহারে বর আসিয়া সভাস্থ হইল। অন্তঃপুর হইতে মাঙ্গলিক হুলুধ্বনী ও শঙ্খধ্বনী হইতে লাগিল। বিদ্যালয়ের বালকগণ সমবয়স্ক-

গণের সহিত লেখা পড়ার তর্ক বিতর্ক করিয়া আপনাপন পক্ষে জয়লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। গ্রামের নর-সুন্দর আজ মহাব্যস্ত, সে একবার অন্দরমহলে যাইতেছে, একবার আসিয়া কতক্ষণে বরকে আসর হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইতে হইবে, তাহার জন্য সময় প্রতীক্ষা করিতেছে। পূরোহিত এইবার বরকে বিবাহস্থানে লইয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। নর-সুন্দর সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঝটিতি তাঁহার হুকুম তামিল করিল। বর বিবাহাসনে সমাসীন হইলেন। যথা-শাস্ত্র ধর্ম্ম-সাক্ষী করিয়া বিবাহ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বর ও কন্যা বাসরঘরে আনীত হইলেন। রমণীগণ পঙ্গপালের ন্যায় সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। আর কিছু হউক আর না হউক, বাসরে প্রবেশ করিয়া বরের সহিত দুই চারিটী তামাসা করিতে পারিলেই তাহাদের সমস্ত দিনের আশা পরিপূর্ণ হয়। বরের মুখে কোনও কথা নাই। একজন রমণী অগ্রসর হইয়া বলিল,—"ভাই বর! তোমার নামটী কি শুন্‌তে পাই না?" বর না চোর, ধীরে ধীরে বলিল,—"আমার নাম অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।"

অপর একজন রমণী আসিয়া বলিল,—"ভাই! নামটী ত শুনাইলে, এক্ষণে একটি গান শুনাইলে ভাল হয় না?" অনিল কুমার বলিল,—"আমি গান জানি না, আপনারা দয়া করিয়া একটী গান করুন।" সুকুমারী গান গাহিতে বড়ই পারদর্শিনী, সে বরের কথায় ও সকলের অনুরোধে গান ধরিল—,

প্রণয় পরম নিধি বিধিদত্ত ধন।
যতনে হৃদয়ে তাহে করিলে ধারণ,

নরের পশুত্ব যায়, নাহিক সন্দেহ তায়,
দেবত্ব লাভের ইহা দুর্ল্ভ রতন।
ভক্তভাবে প্রেমভাবে, জননী বাৎসল্যভাবে,
পুত্র তারে ভক্তি ভাবে নমে চিরদিন,
যুবক যুবতী তারে বিভোর হৃদয়ে
জপমালা ক'রে সদা জপে অনুক্ষণ
প্রণয় বিহীন হলে জীবনে মরণ॥

সুকুমারীর কোকিলকণ্ঠবিনিন্দিত স্বরলহরী শ্রবণ করিয়া সকলেই শত-মুখে সুখ্যাতি করিতে লাগিল। তাহার পর আরও দুই একজন সঙ্গীত কল-তানে বাসর-গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিল। বাসর-গৃহে এরূপ আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল। পাঠক! আসুন, আমরা একবার ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যাপারটা দেখিয়া আসি। বরযাত্রিগণ ও প্রতিবাসী ব্রাহ্মণগণ ভোজনে বসিয়াছেন। মহামায়া ভাণ্ডার-গৃহে সমস্ত দ্রব্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। পরিবেশনকারী ব্রাহ্মণগণ মহামায়ার নিকটে আসিয়া দ্রব্যাদি গ্রহণ করতঃ বহির্বাটিতে ব্রাহ্মণগণকে পরিতোষের সহিত ভোজন করাইতেছেন! সকলেই আয়োজন ও রন্ধনাদির পারিপাট্য দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ভোজন ব্যাপার এক প্রকার সমাধা হইল। পরিচারকগণ এইবার একটু বিশ্রাম করিয়া পরে নিজেদের, আহারাদির ব্যবস্থা করিবে, এই ভাবিয়া সকলেই তাম্রকূট সেবনে সারা-দিবস-পরিশ্রমজনিত ক্লেশের লাঘব করিতে লাগিল। এমন সময়ে বাহিরে একটি মহা গোলমাল আরম্ভ হইল। সকলেই দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল—কতকগুলি

সুরাপায়ী পার্শ্বের সজ্জিত গৃহে আসিয়া গোলমাল করিতেছে। ভুবনেশ্বর সংবাদ পাইয়া তথায় আসিয়া দেখিলেন—তাঁহারই প্রভুপুত্র প্রবোধচন্দ্র দলবল সহ নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছেন। কি করিবেন—সেই অবস্থাতেই তিনি তাহাদিগকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। প্রবোধচন্দ্র ও রমেশ, ভুবনেশ্বর বাবুকে সম্মুখে দেখিয়া একটু লজ্জিত হইয়া গৃহের এক পার্শ্বে উপবেশন করিল। ভুবনেশ্বর তাহাদের বসিতে বলিয়া এবং তাহাদের তত্বাবধানের জন্য লোকের বন্দোবস্ত করিয়া অন্দরমহলে স্ত্রীলোক-দিগের আহারের বন্দোবস্ত করিতে প্রস্থান করিলেন। ভুবনেশ্বর আজ একাকী হইয়াও চারিদিকে সমানভাবে বিচরণ করিতে-ছেন। এ সকল কার্য্যে অনবরত পরিশ্রম করিয়াও তাঁহার কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ হইতেছে না।

প্রবোধচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলে, গ্রামের অনেক গণ্য মান্য লোক তাহার ন্যায় ধনী সন্তানের সহিত আলাপ করিতে অসিল। কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া সকলেই ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া প্রস্থান করিল। কতকগুলি যুবক আসিয়া তাহাদের নিকট উপবেশন করিল এবং সঙ্গীতাদির উদ্যোগ করিতে লাগিল। ছত্রপুর গ্রামে সকলেই সঙ্কীর্ত্তন করিতে বিশেষ অভ্যস্ত। তাহারা অন্য সঙ্গীতাদি ভালরূপ গাহিতে জানে না বলিয়া, এ আসরে তাহাদের অভ্যস্ত সঙ্গীতেরই অবতারণা করিতে আরম্ভ করিল। প্রবোধচন্দ্র ও রমেশ সুরাপানে এতদূর উন্মত্ত হইয়াছিল, যে তাহাদের কোনরূপ ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি নাই। অপরাপর সহযাত্রিগণও তদ্রূপ, এমন কি বাবুর সহিত যে কয়েকজন পাইক অসিয়াছিল, তাহারাও

সুরাপানে এরূপ উন্মত্ত, যে প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধ জ্ঞান নাই বলিলেই হয়। তাহারা যারপর নাই উপদ্রব আরম্ভ করিল। ভুবনেশ্বর বড়ই বিব্রতে পড়িলেন। তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া যে তিনি অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, এখন তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। তখনও আত্মীয় স্বজন অনেকেরই ভোজন কার্য্য সমাধা হয় নাই। ভুবনেশ্বর বাবু ও অপরাপর সকলে তাহাদের গর্হিত আচরণ দেখিয়া মনে মনে সংক্ষুব্ধ হইতে লাগিলেন। কিন্তু কি করিবেন—এখন ত আর কোন উপায় নাই? মহামায়া এতদিন প্রবোধচন্দ্রের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার সহিত নিরুপমার বিবাহ দিবার জন্য বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রবোধচন্দ্রের বিষয় আশয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই, মহামায়া তাহার করে নিরুপমাকে সম্প্রদান করিবার মানস করিয়াছিলেন। আজ তিনি প্রবোধ-চন্দ্রের কলুষিত চরিত্রের গরলোচ্ছ্বাস দর্শন করিয়া সাবধান হইলেন। তিনি হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া প্রবোধচন্দ্রের সহিত বা রমেশের সহিত যে নিরুপমার পরিণয় কার্য্য সমাধা করেন নাই, উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হইয়া যে সে কার্য্য এতদিন স্থগিত রহিয়াছে, তজ্জন্য বিধাতাকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

ব্যাপার দেখিয়া ভুবনেশ্বর বাবু প্রবোধচন্দ্র ও রমেশকে নানাপ্রকার হিতকথায় বুঝাইতে লাগিলেন,—কিন্তু তাহা শুনিবে কে, তাহাদের কি এখন কোনও প্রকার চৈতন্য আছে! চৈতন্যহারিণী বোতল-বাসিনী মা যে তাহাদের হিতাহিত বিবেচনা শক্তি রহিত করিয়াছেন। ভুবনেশ্বর মনে করিলেন,

এই সময় তাহাদের কিছু খাদ্যাদি উদরস্থ করাইতে পারিলে, নেশা ছুটিয়া যাইতে পারে। এইরূপ স্থির করিয়া ভাল ভাল আহারীয় দ্রব্য আনাইয়া প্রবোধচন্দ্রকে ভোজন করিতে বলিলেন, সে সঙ্গিগণ সহ আহারে বসিল। কোনও প্রকার দ্বিরুক্তি করিতে তাহার সাধ্য হইল না—কারণ সে সময় দেবী তাহাদের স্কন্ধে এরূপভাবে ভর দিয়াছিলে যে, তাহারা ভূতলশায়ী হইবার উপক্রম করিতেছিল। এবার ধরার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই সকল গোলমাল মিটিয়া যায়। সুরাপানোন্মত্ত দুরাচারগণ অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় কিছু কিছু খাদ্য দ্রব্য উদরস্থ করিয়া, সেই স্থানেই শয়ন করিল। আর উঠিতে পারিল না। তবে প্রবোধচন্দ্র দুই একবার "নিরুপমা, নিরুপমা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। ভুবনেশ্বর বাবু তাহার এই কুৎসিত আচার ব্যবহার দেখিয়া সাতিশয় সন্দিহান হইলেন।

পাষণ্ডগণ স্থির হইয়াছে দেখিয়া, অপরাপর সকলে আহারাদি সমাপন করিল। ভুবনেশ্বর বাবুর অনুমতি ক্রমে কয়েক জন বলিষ্ঠ যুবক সে রাত্রি মাতালগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি নীরবে বসিয়া থাকা বড়ই কষ্টকর বলিয়া তাহারা বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। প্রবোধচন্দ্র ও রমেশ বিকৃতস্বরে কত "বাহবা" দিতে লাগিল; কিন্তু আর উঠিয়া বসিতে পারিল না। মাতাল শুইলে আর উঠিতে পারে না—ইহাই সুরা দেবীর অনুগ্রহ।

যুবকগণ কতই মধুর কীর্ত্তনের সুরে গীত আরম্ভ করিলেন। দুই একটী অপর সঙ্গীতও যে গীত হইয়াছিল—তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কীর্ত্তনের সুর নানা প্রকারের এবং তাহা সাধারণ

শ্রোতার বোধগম্য হইবার নহে। একজন বলিল,—"ভাই! সেই দশকুশী রাগিণীর গীতটী একবার গাও; আমি বাজাইতে পারি কি না দেখি।" প্রবোধচন্দ্রের উঠিবার ক্ষমতা নাই। ধরা-ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার বচন আওড়াইতেছিল। মত্তাবস্থায় স্বাভাবিক সুরে প্রবোধ বলিল "বাবা! আমরা অনেক দূর হইতে আসিয়াছি। রাস্তায় ত কূল কিনারা নাই, বাবা! এখন ঐরূপ দশ বার কুশী না গাহিয়া এক আধ কুশী যদি থাকে, তবে গা—গাহিতে পার।"

এই বলিয়া প্রবোধচন্দ্র নীরব হইল। সকলেই বলিল,—"ভাই! এ স্থানে আর কীর্ত্তনাঙ্গ গাহিয়া কোন ফলোদয় নাই, অপরাপর গান করাই যুক্তি সঙ্গত।" এই বলিয়া সকলে রাত্রি জাগরণের মত যাহার মনে যাহা উদয় হইল—তাহাই গাহিতে লাগিল। ছত্রপুরে বিবাহ বাটীর এইরূপ বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া রজনীদেবী অবশ কলেবরে স্বস্থানে গমনোদ্যতা হইলেন। বাটীতে মহৎ কাজ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইলে, কর্ত্তৃপক্ষ স্ত্রীপুরুষ কাহারও নিদ্রা হয় না। যতক্ষণ কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সমাধা না হয়, ততক্ষণ তাঁহাদের চিত্তচাঞ্চল্য সমভাবে বর্ত্তমান থাকে। ভুবনেশ্বর বাবু সস্ত্রীক ও মহামায়া সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর উষাসমাগমে, বাসী-বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। যে সকল পুরস্ত্রীগণ বাসরে সমস্ত রাত্রি আসর জাগাইয়াছিল, তাহারাও শুষ্ক মুখ-কমলে কাষ্ঠহাসি হাসিতে হাসিতে স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। নলিনাক্ষ তিন চারি দিবস হইল, এখানে আসিয়াছেন। রুদ্রপুরে তাঁহার যে কাজ ছিল, এই কয়দিন তাহার কিছুই হয় নাই। এই জন্য তিনি অদ্য প্রাতঃকালেই

ভুবনেশ্বরের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। মহামায়া সদলবলে প্রবোধচন্দ্রের আগমন ও তাহাদের ভাব গতিক দেখিয়া বড়ই সন্দেহ করিয়াছিলেন। তিনি দেবরকে সমস্ত বলিলেন। ভুবনেশ্বর বলিলেন—"বউ! সে বিষয় কোন চিন্তা নাই। আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

ক্রমে বেলা হইল। সৌদামিনী সকলের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া অনিলকুমার সহ শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিলেন। এতদিন লালন-পালন করিয়া ভুবনেশ্বরের কন্যা আজ পর হইল। এত আনন্দ, এত উৎসবের অবসানে আজ যেন সমস্ত গৃহ-প্রাঙ্গণ নিরানন্দময় দেখাইতে লাগিল। বহুদিনব্যাপী উৎসবের শেষ হইলে পরে যে একটা অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা বাস্তবিকই অসহনীয়; বিপুল আনন্দের পর একেবারে নিরানন্দ ভোগ বড়ই বেদনাদায়ক, ভুবনেশ্বরের গৃহে আজ তাহারই অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

বিবাহের আমোদ চিরদিন থাকে না। বিবাহ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উৎসবামোদের অবসান হইয়া থাকে। ভুবনেশ্বর বাবুর গৃহ-প্রাঙ্গণ এই কয়দিন তাঁহার কন্যার বিবাহে বেশ আনন্দস্রোতে প্রবাহমান ছিল। বিবাহ ফুরাইয়াছে, আত্মীয় কুটুম্বগণ সকলেই একে একে বিদায় হইয়াছেন। নলিনাক্ষ বিবাহের পরদিবস প্রাতেই ছত্রপুর পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্গীয় নীলরতনের সমস্ত বিষয় আত্মসাৎ করিয়াছেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৈতৃক সম্পত্তি ছাড়া তিনি স্বোপার্জ্জিত যাহা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই অধর্ম্মে অর্জ্জিত; অর্থের জন্য এত অধর্ম্ম ও অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রীধর শয্যাগত, এক্ষণে তাঁহার কৃতীপুত্র প্রবোধ জমীদারীর ভার প্রাপ্ত হইয়া নলিনাক্ষের বাস্তটুকু এবং চানকের সম্পত্তিটুকু হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সংসারে থাকিলে এ সকল রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক—ইহাই নলিনাক্ষের গুরুর উপদেশ। তাই তিনি বাল্যবন্ধু জ্যোতিষপ্রসাদের দ্বারা তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। সংসারের কূট মন্ত্রণাজাল তিনি ত ভেদ করিতে জানেন না। তাই, জ্যোতিষপ্রসাদ তাঁহার হইয়া আদালতে মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। আদালতের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার তাঁহাকে বহন করিতে হইলে না

তাহার জন্য আদালতে দাঁড়াইতে হইলে, তিনি এই পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইতে পারিতেন না। তবে এই মোকদ্দমায় তাঁহার উকীল খরচ কিছুমাত্র লাগিতেছে না। তাঁহার প্রাণের বন্ধু জ্যোতিষপ্রসাদ এখন উকীল হইয়াছেন। তিনি নলিনাক্ষের ন্যায় শিক্ষিত, মার্জ্জিত-চরিত্র সাধক যুবকের নিজস্ব-সম্পত্তি অর্থাভাবে পরহস্তগত হয় দেখিয়া, নিঃস্বার্থভাবে প্রাণপণে তাহার উদ্ধার সাধনে যত্নবান হইয়াছেন। পাঠকের এইখানে জানিয়া রাখা উচিত যে, জ্যোতিষপ্রসাদ আর কেহই নহেন, আমাদের চির-পরিচিত নিরুপমার বাল্যসহচরী সুকুমারীর প্রিয়তম স্বামী। নিরুপমা ও সুকুমারী যেমন বাল্যকাল হইতে প্রাণে প্রাণে সংবদ্ধ, নলিনাক্ষ ও জ্যোতিষপ্রসাদের মধ্যেও প্রণয় ঠিক সেইরূপ ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে। একজন একজনের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নহেন। নলিনাক্ষের পরমাত্মীয় ভুবনেশ্বর বাবু তদীয় কন্যার বিবাহে উপস্থিত না হইলে পাছে মনোকষ্ট করেন এবং পাছে গুরুদেবের আদেশ অমান্য করা হয়, এই জন্য নলিনাক্ষকে আসিতে হইয়াছিল। আরও নিরুপমার প্রণয়সূত্র তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল, এ আকর্ষণ যে বড় ভয়ানক। বহুদিন দেখা হয় নাই, এই সূত্রে একবার সেই অপরূপ রূপ মাধুরী দর্শন করিয়া মনোনয়নের তৃপ্তি সাধন করিবেন বলিয়াই আসিয়াছিলেন জ্যোতিষপ্রসাদও নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে আসিয়াছিলেন। পরদিন প্রত্যুষে সস্ত্রীক তিনিও নলিনাক্ষের সহিত প্রস্থান করিয়াছেন। নিরুপমা সখী-বিহীনা হইয়া সৌদামিনী-জননী মনোরমার আদর

আপ্যায়নে এ কয়দিন পিসীমাতার সহিত একপ্রকার কাটাইয়াছেন। আজ তাঁহাদের স্বদেশ যাইবার দিন। প্রাতঃকালে ভুবনেশ্বর একখানি নৌকা ও দুইজন লোক ঠিক করিয়া আসিলেন। আহারাদির পর রৌদ্রতাপ কিছু মন্দীভূত হইলে তাঁহারা ঐ দুইজন বলিষ্ঠ লোক সহ স্বগৃহে শুভযাত্রা করিলেন। তাহা হইলেই পরদিন সূর্য্যাস্তের মধ্যে তাঁহারা রুদ্রপুরে পৌঁছিতে পারিবেন। আজ লোকারণ্য হট্ট লোকশূন্য হইবে, আত্মীয় স্বজন পরিপূর্ণ গৃহ একেবারে স্বজনশূন্য হইবে ভাবিয়া মনোরমা ও ভুবনেশ্বর যারপরনাই ক্ষুণ্ণ হইতেছেন। স্বজনগণে পরিপূর্ণ গৃহ-প্রাঙ্গণ স্বজনশূন্য হইলে বাস্তবিক খাঁ খাঁ করিতে থাকে। গৃহীর মন-প্রাণও সেইরূপ শূন্য বলিয়া বোধ হয়, হৃদয় উদাসভাবে পরিপূর্ণ হইয়া ঘোরতর দুঃখ অনুভব করে। মনোরমা আজ নানাবিধ আহারাদির আয়োজন করিয়াছেন। ভুবনেশ্বরও আজ বাটী হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারিতেছেন না। কেবল জননীসমা জ্যেষ্ঠাবধূর নিকট নানাপ্রকার সুখ দুঃখের গল্প করিয়া মনের অবসাদ-ভার লাঘব করিতেছেন।

* * * * *

পাঠক! প্রবোধচন্দ্রের বিষয় বোধ হয়, জানিতে উৎসুক হইয়াছেন। প্রবোধচন্দ্র মত্ততার অবসানে বড়ই লজ্জায় পড়িয়াছিলেন। কিরূপে নায়েব ভুবনেশ্বর বাবুর নিকট মুখ দেখাইবেন, কেমন করিয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবেন। গত রজনীর ধৃষ্টতার কথা, সেই অমানুষিক পশ্বাচারের কথা স্মরণ করিয়া তাহার বদন অবনত হইল। মাতালের অবস্থাই এইরূপ, মত্ততা তিরোহিত হইলে, মন প্রকৃতিস্থ

হইলে—এইরূপ ভাবই হইয়া থাকে, যেন এ মানুষ আর সে মানুষ নহে। যখন তাহার চৈতন্য হইল, তখন প্রবোধ দেখিল অপর কেহ নিকটে নাই। কেবল তাহারই সঙ্গীগণ নিদ্রা যাইতেছে। উষার শীতল বাতাসে সকলেই ঘুমে অচেতন, তিনি ধীরে ধীরে রমেশকে ডাকিয়া উঠাইয়া সমস্ত কথা বলিলেন। রমেশ বলিল,—"তাহাতে আর ক্ষতি কি, ভুবনেশ্বর বাবু ত তোমার কর্ম্মচারী!"

প্রবোধ। তাহা হইলেও বয়োজ্যেষ্ঠ, আমার পিতা পর্য্যন্ত তাঁহাকে মান্য করেন, কল্য এতদূর করাটা ভাল হয় নাই। তিনি কি মনে করিয়াছেন।

রমেশ। মনে আর কি করিবেন।

প্রবোধ। যদি পিতার নিকট এই সকল প্রকাশ করেন।

রমেশ। ভাই! পুত্র উপযুক্ত হইলে, পিতা তাহার কার্য্যে তাদৃশ প্রতিবাদ করেন না। যদি একান্ত রাগিয়া থাকেন, তাহা হইলে না হয় ভুবনেশ্বর বাবুকে একটু মিনতি করা যাইবে।

প্রবোধ। না, সে কার্য্য এখন হইতে পারে না; সকলের নিকট এরূপ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তিনি খাজনাখানায় প্রথম দিন উপস্থিত হইলে, আমি তাঁহাকে সে বিষয় মিনতি করিয়া বলিব। এখন এস্থান হইতে প্রস্থান করাই যুক্তিসঙ্গত।

রমেশ। তাহা হইলে, যাহার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এই দূরদেশে আগমন করা হইল—কই, তাহার ত কিছুই করা হইল না।

প্রবোধের মনে কেমন একটু ধর্ম্মভাব উদিত হইয়াছে, সে বলিল—"আর কাজ নাই, যা হবার তা হয়েছে।"

এ জগতে দেবতা ও পিশাচ দুইই বাস করে। পাঠক! সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন মহাপুরুষের চরিত্র দেখিয়াছেন। এখন পিশাচের চরিত্র দেখুন, এই সকল অবহেলায় উত্তীর্ণ হইলে তবে সংসার-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারা যায়; সাধক তাহাতে পশ্চাদ্‌পদ হইবে না; তবে ঈশ্বরের নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করিতে না হয়। যেন সঙ্গদোষে মানুষ পিশাচে পরিণত না হয়।

মানবমনে ধর্ম্মভাবের উদয় হইলেও কুসঙ্গরূপ প্রবল পবনান্দোলনে সময়ে সময়ে তাহা একেবারে লয় প্রাপ্ত হয়। প্রবোধ বিবেক সাহায্যে যত অগ্রমত করিতে লাগিল, দুরাত্মা রমেশের কূট মন্ত্রণায় ক্রমশঃ তাহা ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এখানে আর অপেক্ষা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে ভাবিয়া প্রবোধ বলিলেন,—"ভাই! এখন রজনীর অন্ধকার সম্পূর্ণরূপ তিরোহিত হয় নাই। চল আমরা এই সময় প্রচ্ছন্নভাবে এস্থান হইতে প্রস্থান করি।" রমেশ কি করিবে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাতে মত প্রদান করিল। সে মনে ভাবিল—স্থানান্তরিত হইয়া পুনরায় সুরাদেবীর আরাধনা করিতে পারিলে প্রবোধ আবার প্রকৃতিস্থ হইবে। এই ভাবিয়া সঙ্গীগণসহ দিবাবিকাশের পূর্ব্বেই তাহারা নিঃশব্দে ছত্রপুর পরিত্যাগ করিল। পরদিন বাসী বিবাহের সময় ভুবনেশ্বর একবার প্রভুপুত্রের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন সন্ধান না পাইয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ আত্মীয় যত শীঘ্র গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, ততই মঙ্গল। পলায়নের পর ভুবনেশ্বর বুঝিয়াছিলেন, এ পলায়নের উদ্দেশ্য ভাল নহে, নিশ্চয়ই তাহাদের মনে কোনও

দুরভিসন্ধি বদ্ধমূল হইয়াছে। এইজন্য তিনি প্রাতঃকালে মহামায়া ও নিরুপমার স্বদেশ গমনের সহায়তা করিবার জন্য দুইজন বিশ্বস্ত পাইক নিযুক্ত করিয়াছেন।

মধ্যাহ্ন সময়ে আহারাদি শেষ হইল। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর মনোরমা নিরুপমার বেশ বিন্যাস করিতে লাগিলেন। মহামায়া এদিকে নানাপ্রকার দ্রব্যসম্ভার একত্র করিয়া পুট্টলিকা বন্ধন করিতে লাগিলেন। এই সকল কার্য্যে ক্রমে দিবাবসান হইল, মেদিনী-পৃষ্ঠে আর রৌদ্র নাই, তবে আপাততঃ অস্তমিত সূর্য্য-রশ্মি-রঞ্জিত উর্দ্ধগগনের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব হেতু ধরাতল সন্ধ্যার আলোকচ্ছটাপাতে উৎফুল্ল হইতে এখনও বিলম্ব আছে। বৃহৎ তরুশিরোভাগে কাঞ্চন-কিরীট সদৃশ উজ্জ্বল আভা এখনও তিরোহিত হয় নাই। নিরুপমা বেশভূষা করিয়া বাতায়নপথে ভাস্বর-চাহনিতে, উদাস-মনে বসিয়া আছেন, আর ভাবিতেছেন,—আবার একদিন ত দেখিতে দেখিতে প্রকৃতিকোলে লীন হইল, ক্রমশঃ দিনের পর দিন ত ফুরাইয়া যাইতেছে; কিন্তু প্রাণ যাহাকে চায় তাহার সহিত কবে মিলিত হইব—স্রোতস্বিনী কবে সাগরে আত্মসমর্পণ করিবে? তবে অনুকূল বাতাস বহিয়াছে; পিসীমাতার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—আশার ক্ষীণালোক দেখা দিয়াছে। এই সময় মহামায়ার মুখে সেই কথা একবার শুনিলেই হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। তাহার কথা ও কাজ যে একই—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

মহামায়ার ইচ্ছা ছিল, আরও দুইদিন থাকিয়া পরশু প্রাতঃকালে শুভযাত্রা করিবেন। কিন্তু কল্য পূর্ণিমা-প্রতিপদে

চন্দ্রে গ্রহণ লাগিবে, এইজন্য হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে সাতদিন অকাল—কোথাও যাত্রা করিতে নাই। এখন আর এক মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট করিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। এতদিন মনে মনে যে সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়াছিলেন, নিরুপমার বিবাহ বিষয়ে যে কৃত-নিশ্চয় হইয়াছিলেন, প্রবোধচন্দ্রের সে দিনকার ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার সে দৃঢ়তা বিনষ্ট হইয়াছে। এখন যত শীঘ্র পারেন, দেশে যাইয়া নলিনাক্ষের সহিত নিরুপমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিবেন। এ বিষয়ে তাঁহার দেবর ভুবনেশ্বর বাবুও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। নলিনাক্ষের ন্যায় উপযুক্ত পাত্র যে আর পাওয়া যাইবে না, এখন তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। কাজেই দুর্গানাম স্মরণ করিয়া অপরাহ্ণ সময়ে শুভযাত্রা করিলেন। নিরুপমার প্রসন্ন-বদনে আজ হাসি নাই; যেন কি এক ভাবী অমঙ্গল চিন্তায় বালিকার মুখকমল অপ্রসন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু না যাইলেও নয়, পিসীমার মতি যখন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তখন আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। অদৃষ্টে যাহা আছে—তাহাই হইবে। নলিনাক্ষকে পাইবার জন্য যে সে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে—অমঙ্গল ত কোন্ ছার। দুইজন পাইক আসিয়া জুটিল. ভুবনেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে নদীতীর অবধি যাইবেন বলিয়া অগ্রসর হইলেন। মনোরমা বহির্ব্বাটীতে আসিয়া মহামায়াকে প্রণাম করতঃ পদধূলি গ্রহণ করিলে মহামায়া কনিষ্ঠ বধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। নিরুপমাও যথারীতি মনোরমার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। মনোরমাও তাহার চিবুক ধারণ করতঃ সেই রক্তিমাভ গণ্ডে একটী স্নেহ-চুম্বন করিয়া বলিলেন, "মা! ভুলে থেক না, আবার এস।

সৌদামিনী আসিলে আমি তাঁহাকে দিয়া আবার তোমায় আনিতে পাঠাইব।" এই বলিয়া মনোরমা অতি করুণ-চাহনীতে রবিকর-ক্লিষ্ট মধ্যাহ্ন গোলাপবৎ, নিরুপমার বিষণ্ণ-বদনখানির প্রতি চাহিতে চাহিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। মহামায়াও দেবরপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বগণ সমভিব্যাহারে ধীর-পদ-বিক্ষেপে গঙ্গাতীরে উপনীতা হইলেন। তথায় তরণী তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া তরণী আরোহণ করিলেন। ভুবনেশ্বর মহামায়াকে প্রাণামানন্তর পাইকদ্বয়কে বিশেষ সাবধানে লইয়া যাইতে বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

নানা কারণে অভিভাবক-বিহীনা নিরুপমার বিবাহ অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে হইতেছে—কারণ তখন ৯'১০ বৎসরই কন্যাদানের সময় নিরূপিত ছিল। নিরুপমার সেই বয়স উত্তীর্ণ হইয়া এখন বার তের হইয়াছে-- কাজেই বেশী। আর নিরুপমার বর ঠিক না হইলে ত বিবাহ হইবে না, ইহা যে ঈশ্বরাধীন কার্য্য, ইহাতে তোমার আমার হাত নাই। মানুষ ইহার জন্য চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করিবে; কিন্তু বিধি-নির্দ্দিষ্ট পাত্র-পাত্রী সংযোজন না হইলে কার্য্যোদ্ধার করা কাহারও সাধ্য নহে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

-•••••••••••-

জলপথে।

নৌকা ছাড়িয়া দিল। অনুকূল বাতাসে তরণীখানি পাল ভরে হেলিতে দুলিতে মন্থর গমনে চলিল। দুই একখানি গ্রাম অতিক্রম করিতে না করিতেই সন্ধ্যা হইল। যামিনী চন্দ্রমা-শালিনী, ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত কুসুমপরাগাপহরণ করিয়া মলয় পবন প্রবাহিত হইতে লাগিল। নদীর স্বচ্ছ জলে চন্দ্রকর নিপতিত হইয়া অগণ্য হীরকখণ্ডের ন্যায় ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

নিরুপমার শরীর সামান্য অসুস্থবোধ হইয়াছিল বলিয়া মহামায়ার আজ্ঞায় তিনি তরণী মধ্যে শয়ন করিলেন। এখন প্রাণোপমা নিরুপমার ভবিষ্যত ভাবিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হইয়াছে। নিরুপমাকে কথঞ্চিত সুস্থ হইতে দেখিয়া মহামায়া গবাক্ষ উন্মোচন করতঃ প্রবহমান নদীর প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিলেন। জ্যোৎস্নালোকে সমস্তই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। উহার প্রবল স্রোতে কত সামগ্রী ভাসিয়া যাইতেছে। কোন্ সামগ্রী কোথায় যাইবে, কোথায় যাইয়া কাহার সহিত মিলিত হইবে—তাহা কে বলিতে পারে? স্রোতে একটী তৃণ আর একটী তৃণের উপর আসিয়া পতিত হইল, আরও কিছু দূরে কতক-গুলা তৃণ একত্রিত হইল, আবার স্রোতের প্রকৃতি বিপর্য্যয়ে ঐ তৃণ সমষ্টি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল-ইহাদের কোন্‌টা

কোথায় যাইবে, কে বলিতে পারে? সময়রূপী জীবনস্রোতে শুভ অশুভ ঘটনা সকলও ঐরূপ ভাসিয়া ভাসিয়া সংযত হইতেছে, আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। বিধাতাই এই কাল-স্রোত প্রবাহিত করিবার একমাত্র কর্ত্তা; মনুষ্যজীবনে ঘটনা সংযোজনা তাঁহারই লীলা। যে ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারিয়া সুখে দুঃখে আত্মহারা না হন, মানবজীবনে সহিষ্ণুতার হাল ধরিয়া আপন কর্ত্তব্য পথে পরিচালিত হন, তিনিই মানুষ নামের যোগ্য। স্ত্রী হউক, পুরুষই হউক, ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলে—কালে আর তাহাদিগকে ঘোর মনোকষ্ট সহ্য করিতে হয় না। আমি এতদিন যদি নিরুপমার মনোভাব বুঝিবার জন্য ধৈর্য্য ধারণ না করিয়া বিবাহ দিতাম, তাহা হইলে না জানি কি ভীষণ অনর্থপাতই হইত। আর আমার নিরুরও ধৈর্য্যের অবধি নাই, সে বয়স্থা হইয়াও আমার মুখের উপর একটী দিন কোনও কথা কহে নাই। অনবরত সে নীরবে আমার বচনবাণ সহ্য করিয়াছে। ধন্য নিরুপমার বাল্যশিক্ষা, পিতামাতা ভাল হইলে যে পুত্রকন্যা আদর্শ-চরিত্র হয়, নিরুপমাই তাহার প্রমাণস্থল।

এইবার বিদুষী মহামায়া নিরুপমার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ সহকারে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—“নিরু! তোকে যে এতদিন কষ্ট দিয়াছি, তজ্জন্য আমিই দোষী; এখন বুঝিতে পারিতেছি, হটকারিতার বশে প্রবোধের সহিত বিবাহ দিলে আমিই মহাপাপে লিপ্ত হইতাম, সুবর্ণ-বিজড়িত মুক্তার মালা বানরের গলায় প্রদান করিয়া আমিই নিন্দনীয় হইতাম। কি করিব মা! আর মনোকষ্ট করিও না, আমি

গৃহে যাইয়া আগামী আষাঢ় মাসেই তোমার অভীষ্ট পাত্রে তোমায় সম্প্রদান করিয়া চির-কর্ত্তব্য-কার্য্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব। দেবরের মুখে শুনিলাম,- নলিনাক্ষই তোমার উপযুক্ত পাত্র।"

মমূর্ষু-প্রাণে নবশক্তির সঞ্চার হইলে সে যেমন উৎফুল্ল হয়, মহামায়ার মুখে নলিনাক্ষের কথা শুনিয়া নিরুপমার হৃদয়ও তদ্রূপ আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিল। তিনি হৃদয়বেগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন -"পিসীমা! ইহাতে তোমার দোষ কি, আমার অদৃষ্টের দোষ। বিধাতা বিবাহের ফল না ফুটাইলে ত আর বিবাহ হইবে না। ইহা যে ঈশ্বরাধীন কার্য্য।"

মহা। মা! সে যাহাই হউক, আমি বাটী গিয়াই আদ্যনাথ বাবুকে পাঠাইয়া নলিনাক্ষের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিব।

নিরু। পিসীমা! জ্যোতিষ বাবু ও তিনি বোধ হয় বাটীতে নাই! কয়েকদিনের মধ্যে চানকের ও বাসুদেবপুরের জমিখানি তত্ত্বাবধান করিতে যাইবার কথা ছিল।

মহা। তা, তাঁহারা কি আর এতদিনে ঘরে আসেন নাই। মোকর্দ্দমা আর কতদিন ধরিয়া হইবে।

এইবার মহামায়া নলিনাক্ষের অশেষবিধ গুণগান করিতে লাগিলেন। নানাপ্রকার কথায় বার্ত্তায় তাঁহারা কত গ্রাম, কত নগর অতিক্রম করিতে লাগিলেন। দাঁড়ি মাঝিরা সকলেই হিন্দু, এই চাঁদিনী রজনীতে নৌকার উপরিভাগে বসিয়া তাহারা ভগবানের নাম গান করিবার অবসর পাইল। পাইক-দ্বয়ও খোলা হাওয়ায় ঢালসাজ পরিয়া তামাকু-বংশ নির্ব্বংশ করিতে লাগিল।

রাত্রি গভীর-গম্ভীর। আকাশের কোলে দুই এক খণ্ড কাল মেঘ অনাদরে অভিমানে গড়াইতে গড়াইতে এক দিক হইতে অন্য দিকে চলিয়া যাইতেছে। চন্দ্রদেব সুবিস্তীর্ণ আকাশে রাজত্ব বিস্তার করিয়াছেন। কিন্তু খণ্ড খণ্ড মেঘগুলা তাঁহার শাসন না মানিয়া বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিল। তৃণগুচ্ছ একত্র হইয়া যেমন মত্ত হস্তীর গতি রোধ করিতে পারে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাল মেঘগুলাও সেইরূপ একত্র আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ হইয়া চন্দ্রদেবের রাজত্ব হঠাৎ ঘেরিয়া ফেলিল। সহসা ঘোর পরিবর্ত্তন! বিচিত্র পরিবর্ত্তনে প্রকৃতি সতী বিচিত্রবেশিনী হইয়া পরিবর্ত্তনশীল জড়জগতে বিচিত্র লীলা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ক্ষণপূর্ব্বে যে প্রকৃতি নির্ম্মল জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে আপনি হাসিতেছিল ও জড় জগৎ এবং জীবন্ত জগৎকে হাসাইতেছিল; দেখিতে দেখিতে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন, চতুর্দ্দিক তমসাচ্ছন্ন—ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন—কোথাও কিছু দেখা যাইতেছে না। মেঘ গর্জ্জনের ভীম কড় কড় শব্দে গগন হইতে ধরাতল পর্য্যন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত; নদীবক্ষে প্রবল প্রভঞ্জন প্রবাহে তরণী ওতপ্লুত, অরক্ষণীয়া নৌকা নিমগ্নপ্রায়, আরোহীগণ প্রাণভয়ে আকুল। মহামায়া বিপদ ঘনীভূত দেখিয়া বলিলেন,—"মাঝি! আর এক পদ, অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিও না; বিদ্যুদালোকে সম্মুখেই তট দেখা যাইতেছে; বিশেষ সাবধানে তীরে তরী আবদ্ধ কর।"

"আজ্ঞে তাহাই হইতেছে," বলিয়া মাঝি—ধীরে ধীরে তীরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া একটি বৃক্ষকাণ্ডে তরণী বন্ধন করিয়া যেন কথঞ্চিত নিরাপদ হইল। চারিদিকে সুমহান্ রাজত্ব

আর অপরটি যে তাহার জীবনসঙ্গিনী সুকুমারীর স্বামী জ্যোতিষ বাবু। জগদীশ! একি স্বপ্ন! না, তাহার স্বপ্ন-জাগরণের জাগ্রত দেবতাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া এই বিপদ-সাগরে কূল প্রদান করিলে? দাসীর চির-আকাঙ্ক্ষিত নিধি মিলাইয়া দিয়া—হে বিধি! ও বিপদ সমুদ্রের অতল জল হইতে তাহাকে উদ্ধার করিলে! ধন্য তোমার দয়া! দয়াময় দাসীর পক্ষে এরূপ বিপদপাৎ ত চিরবাঞ্ছনীয়! পাঠক! ভগবানের বিচিত্র লীলার বিষয় চিন্তা করিয়া, আসুন—আমরা তাঁহার মোক্ষ-মূলাধার পাদপদ্মে কোটি কোটি প্রণাম করি।

নলিনাক্ষ ও জ্যোতিষপ্রসাদ মহামায়ার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। জ্যোতিষপ্রসাদ নিরুপমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, -"নিরু! আর কোন চিন্তা নাই; বিপদভঞ্জন আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, এক্ষণে এস, হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা তাঁহার পাদপদ্মে অর্পণ করি।"

* * * *

নিরুপমা লজ্জায় বস্ত্রাঞ্চলে ঈষৎ বদন আবৃত করিয়া রহিলেন এবং মনে মনে বলিলেন,—"আমার দেবতা কে?—নলিনাক্ষ! এ হৃদয়-সিংহাসন কাহার জন্য এতদিন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে? নলিনাক্ষই ত আমার সব, ইহ ও পরকালের দেবতা।"

কিয়ৎক্ষণ পরে মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা! বড়ই বিস্ময়ের বিষয়, কেমন করিয়া তোমরা আমাদের বিপদ জানিয়া এখানে উপস্থিত হইলে?"

নলিনাক্ষ। মা! জগতের সমস্তই অত্যাশ্চর্য্য, ভগবান যাকে রক্ষা করেন, তাহার উপায় এইরূপেই হইয়া থাকে।

পরশু তারিখে বাসুদেবপুরে আমাদের মোকর্দ্দমার দিন ছিল হাজির না হইলে পাছে খারিজ হইয়া যায়—এইজন্য উভয়েই অপরাহ্ণ সময়ে তথায় যাইবার জন্য বহির্গত হইয়াছিলাম। রাত্রে পথ অতিবাহিত করিয়া এই নিদারুণ দুর্য্যোগে যে কি কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে—তাহা বর্ণনাতীত; কিন্তু না আসিলে নয়, এইজন্য সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইলাম। সঙ্গে আর কিছুই ছিল না, কেবল এই রিভলভারটি মাত্র সম্বল। দারুণ দুর্য্যোগে ঘাটে আসিয়া কোনও তরণী না পাইয়া হতাশভাবে ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময়ে আপনাদের ক্রন্দন কর্ণগোচর হইল। তারপরে যাহা যাহা হইয়াছিল সমস্তই দেখিয়াছেন।

জ্যোতিষপ্রসাদকে লক্ষ্য করিয়া মহামায়া বলিলেন,—"জ্যোতিষ! রুদ্রপুরে গিয়াছিলে?"

জ্যোতিষ। আজ্ঞে হ্যাঁ! আপনার বধূমাতাকে বাটীতে রাখিয়া, বন্ধুর জন্য পুনরায় এই দূরদেশে আসিয়াছিলাম।

নিরুপমা মনে মনে বলিলেন,—"ধন্য জ্যোতিষ! ধন্য তোমার বন্ধুর প্রতি অনুরাগ।"

এমন সময়ে অদূরে গোঁ গোঁ শব্দ শ্রুত হইল। জ্যোৎস্নালোকে দেখিতে পাওয়া গেল, একব্যক্তি গড়াইতেছে। নলিনাক্ষ নিকটে গিয়া দেখিলেন এবং দেখিয়া তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সে আর কেহই নহে, প্রবোধচন্দ্রের প্রাণের বন্ধু রমেশ। রমেশ তীব্র কটূক্তি করিয়া বলিল,—"ইহার প্রতিফল শীঘ্রই পাইবে।"

* * * *

নলিনাক্ষ বলিলেন,—"এখন বাঁচ ত, পরে দেখা যাইবে।"

প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া রমেশ যত ছটফট্ করিতে লাগিল, ক্ষতস্থান হইতে তত প্রবলবেগে শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল; নলিনাক্ষ ও জ্যোতিষ কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে রক্তপ্রবাহ বন্ধ করিতে পারিলেন না। একে একে মৃত্যুলক্ষণ সমস্ত দেখা দিল দেখিয়া, তাঁহারা তথায় আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া নৌকা খুলিয়া দিলেন। নিজেরাই নাবিকের কার্য্য করিতে লাগিলেন।

মহামায়া যুবকদ্বয়ের অমানুষিক পরোপকার ব্রতধারণের আসক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত ও মোহিত হইলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—"যদি গৃহে পৌঁছাইতে পারি, তাহা হইলে আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া নলিনাক্ষের করে প্রাণের ভ্রাতুষ্পুত্রী নিরুপমাকে সম্প্রদান করিব। নলিনাক্ষ মহাদরিদ্র হইলেও তাহার সহিত বৃক্ষতলায় থাকিয়া নিরুপমা স্বর্গের সুখানুভব করিবে।"

"মরি মরি কি সৌম্য-মূর্ত্তি! কোন পোষাক পরিচ্ছদ নাই, তথাপি যেন রূপ ফাটিয়া বাহির হইতেছে! আমি বহুদিন হইল নলিনাক্ষকে দেখি নাই, মনে করিয়াছিলাম সে সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে; এখন দেখিতেছি নলিনাক্ষ প্রকৃত ধার্ম্মিক, ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ তাহার মুখমণ্ডলকে যেরূপ জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছে, তাহাতে তাহাকে একজন মহাপুরুষ বলিয়াই বোধ হয়। এমন মহাপুরুষের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিব তাহাতে আর বিচিত্র কি? আজ চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিল, এক্ষণে এ সুবর্ণলতিকা রসালে বিজড়িত করিতে পারিলেই মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। ভগবান্! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" মহামায়া

উদ্দেশে ভগবানের চরণে প্রণাম করিয়া যাহাতে নলিনাক্ষ ও নিরুপমার মিলন শীঘ্র সম্পাদিত হয়—মনে মনে তাহাই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এতদিনে মহামায়ার মোহ-ঘোর কাটিয়াছে, ভ্রাতষ্পুত্রীকে ধনীর করে সম্প্রদান করিবার ইচ্ছা বিদূরিত হইয়াছে।

নলিনাক্ষ একবার হাল ধরেন, জ্যোতিষ দাঁড় টানেন। আবার জ্যোতিষ হাল ধরেন, নলিনাক্ষ দাঁড় টানেন। এই অবলা-পীড়নের মূল কারণ যে প্রবোধচন্দ্র, তাহা আর কাহারও জানিতে বাকি রহিল না। তাই নলিনাক্ষ জ্যোতিষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ভাই জ্যোতিষ! জগতের কার্য্য এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে? নিষ্পাপ জীবন ধ্বংস করিতে পাপীর প্রবল ক্ষমতা কেন থাকে? দুর্ব্বলকে পদদলিত করিতে সবলের চরণ কেন পক্ষাঘাতে অসাড় না হয়? দয়াময়ের দয়ার রাজত্বে এরূপ বৈষম্যের কারণ কি?"

জ্যোতিষ বলিলেন—"ভাই! ইহার বিচার করা, তোমার আমার সাধ্য নাই। তবে পাপীর ধ্বংস যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা ত দেখিলে। এখন যাহাতে তাঁহারই প্রিয়কার্য্যে আমাদের চিত্ত সংযত হয়, এস—তাহারই প্রার্থনা করি।"

এইরূপ ধর্ম্ম-সম্বলিত মধুময় বচনাবলীর আলোচনা করিতে করিতে দুইটী ধর্ম্মপ্রাণ শিক্ষিত যুবক, দুইটী নিরাশ্রয়া স্ত্রীজাতির সহিত নদীবক্ষ ভেদ করিয়া নিজ গন্তব্যপথে প্রধাবিত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

গৃহ কথা।

মানুষ যতদিন নিজের অজ্ঞানতা বুঝিতে না পারে, ততদিন তাহাকে নানারূপ মনস্তাপ সহ্য করিতে হয়। ভ্রান্তি মানুষের প্রকৃতিগত; ইহাতে অনেক সময়ে মানুষ বুদ্ধিহীন হইয়া যায়, ভ্রমই অজ্ঞানতার সহচর। যখন বিদ্যা-বৈভবশালী কত শত মহাপুরুষকে হাসায় নাচায়, তখন হীনমতী রমণী কোন্ ছার, তাহার ভ্রম ত হইবারই কথা। মহামায়া এত-দিন বুঝিতে পারেন নাই, যে অজ্ঞানতা বশতঃ তাঁহার পদে তিনি নিজেই কুঠারাঘাত করিতেছিলেন। এখন ভ্রম নাশ হইয়াছে, অজ্ঞানতা ঘুচিয়াছে, তিনি এখন বুঝিতে পারিয়াছেন --তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইলে, কি ঘোর অনর্থপাতই হইত!

তরণী মাঝিবিহনে যেমন বান্‌চাল্ হয়, সংসার-তরণী সেইরূপ গৃহিণী বিহনে বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, কেবলমাত্র দাস দাসীর দ্বারা এ তরণী চলিতে পারে না। তাই গৃহলক্ষ্মী বিনা ৺নীলরতনের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ এতদিন অন্ধকারময় হইয়াছিল। এক্ষণে মহামায়া ও নিরুপমার আগমনে আবার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইল। তাঁহারা আসিবামাত্রই সমস্ত বিশৃঙ্খলা বিদূরিত হইল। দাস দাসী সকলেই আবার নিজ নিজ কার্য্য মনোযোগের সহিত নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ গোমস্তা

ত্রিলোচন কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিকট এই কয়দিনের অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিলেন এবং ইতিকর্ত্তব্যতা যাহা স্থির করিয়াছিলেন, তাহার সৎ পরামর্শ ও অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

মহামায়া বুদ্ধিমতী এবং বিদুষী হইলেও এখনকার স্ত্রীলোকের মত তাঁহাতে লজ্জাহীনতা, বাচালতা বা অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না। বৃদ্ধ ত্রিলোচন বিশ্বাসকে তিনি বড়ই মান্য করিতেন। ত্রিলোচন আজ বহুদিবস হইল এই সংসারে দাসত্ব করিতেছেন; কিন্তু অদ্যাবধি তাহাকে কোনরূপ অবিশ্বাসের কার্য্য বা প্রভুর কার্য্যে কোনও প্রকার অবহেলা করিতে কেহ দেখে নাই। ত্রিলোচন কাহারও সহিত কথা কহিতে হইলে সাত বুড়ি "ওর নাম কি" "বুঝেছেন" ইত্যাদি মুদ্রাদোষ ছড়াইয়া মিষ্ট কথায় সকলকে মোহিত করিতে পারিতেন। এক কথায় ত্রিলোচন বেশ নিরীহপ্রকৃতির লোক ছিলেন। মৃত নীলরতন বাবু তাঁহার কার্য্যে একদিনের জন্যও কোন প্রকার দোষ প্রাপ্ত হন নাই। এখন না হউক, একদিন তাঁহার হস্তে তাঁহার সমস্ত জমীদারীর ভার অর্পিত ছিল; কিন্তু ত্রিলোচন কখন এক কপর্দ্দকও অপলাপ করেন নাই। এইজন্য নীলরতন, তাঁহার উপর সমস্ত ভারার্পণ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। ত্রিলোচনও ধর্ম্মভাবে ও ধর্ম্মবুদ্ধি অনুসারে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তবে যে তাঁহার কিছু লওয়া অভ্যাস ছিল না—তাহা নহে। এ সংসারে প্রবেশ করিয়া অবধি ত্রিলোচন নানাপ্রকারে গুণবান হইলেও—তিনি নিষ্পাপী নহেন। এ সংসারে কে পাপী নহে? কে বলিতে পারে

আমি পাপ করি নাই? কে বলিতে পারে - আমি নিষ্কলঙ্ক— নিরপরাধী? তবে প্রভুকে এবং প্রজাবর্গকে বজায় করিয়া নিজের সামান্য স্বার্থসিদ্ধি ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যেটুকু আবশ্যক, সেইটুকু লইয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন। প্রভুর তহবিল তছরুপ করিয়া বা প্রজাবর্গকে পীড়ন করিয়া কিছু গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া প্রজাবর্গ যাহা দিত, তিনি তাহাই ধর্ম্মভাবে উপার্জ্জিত বলিয়া গ্রহণ করিতেন। এখন আর সেরূপ পাইবার প্রত্যাশা না থাকিলেও ত্রিলোচন এখনও ধর্ম্মভাবেই কার্য্য করিয়া থাকেন; কোন-রূপ অধর্ম্মাচরণ করেন না। এই বৃদ্ধ বয়সে পুরাতন প্রভুর আশ্রয় ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন। তিনি ছাড়িয়া গেলে, তাঁহার প্রভু-কন্যার যৎসামান্য জীবনোপায়টুকু নষ্ট হইবে, এইজন্য তিনি পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া ঠিক সমভাবেই অবস্থান করিতেছেন। জাতি-শ্রেষ্ঠ বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের প্রতি কায়স্থের যেরূপ ভক্তি থাকা আবশ্যক, ত্রিলোচনের তাহা ছিল, নিজের স্বভাবগুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া-ছিলেন। নিরুপমাকে তিনি বাল্যকাল হইতে দেখিতেছেন; নিজ কন্যার ন্যায় পালন করিয়া আসিতেছেন। নীল-রতন বাবুর মৃত্যুর পর হইতে অভিভাবকরূপে তিনি এই ব্রাহ্মণ পরিবারের তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন। মহামায়া স্ত্রীলোক, তিনি ত আর বাটীর বাহির হন না? নিরুপমাও বাল্যকাল হইতে ত্রিলোচন বিশ্বাসকে জ্যেঠা মহাশয় বলিয়া ডাকিত, কারণ ত্রিলোচন বিশ্বাস তাঁহার পিতা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ- সেকালের মানুষ। তিনি এখন আর এই সংসার

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র নিরুপমা বেশ ভালরূপ অভ্যাস করিয়াছিল। নিজেই তিনি কন্যার শিক্ষা বিধানে মনোযোগী হইয়া তাহাকে এইরূপ বিদুষী করিয়াছিলেন। স্ত্রীবিয়োগের পর হইতে তাই সমস্ত জীবন তিনি কন্যার সহিত এইরূপ ধর্ম্মলোচনাতেই কাটাইতেন। সংসার ও বিষয়-বৈভবের ভার তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মহামায়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ কার্য্যে ত্রিলোচন বিশ্বাস তাঁহার সহায়রূপে কার্য্য করিতেন। বহির্ব্বাটীর সুবৃহৎ সুসজ্জিত গৃহে মুখোপাধ্যায় মহাশয় একাই অবস্থান করিতেন। এই গৃহটী অন্দর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত। আহারের সময় কেবলমাত্র একবার অন্দর মধ্যে গমন করিতেন এবং চকিতের ন্যায় সমস্ত দেখিয়া আসিতেন। সমস্ত দিন ধর্ম্মকর্ম্মে কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় তিনি নিজ কন্যাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে বসিতেন। নিরুপমাও নিবিষ্ট-চিত্তে এই সকল শ্রবণ করিয়া নিজ মেধাবলে সামান্য দিনের মধ্যেই তাহার অধিকাংশ আয়ত্ত করিয়াছিল।

রূপচাঁদ—বাবুর প্রিয় ভৃত্য। রূপোর সহিত পরামর্শ না করিয়া নীলরতন বাবু কোন কাজই করিতেন না। এখন রূপচাঁদের বয়স বেশী হইলেও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন প্রণালী এরূপ সুদৃঢ় ও মাংসল যে, তাহার শুভ্রবর্ণ মস্তকের প্রতি লক্ষ্য না করিলে তাহাকে যুবা বলিয়াই প্রতীতি হইত। রূপচাঁদ একজন প্রসিদ্ধ খেলোয়াড়, দরিদ্রতার সূত্রপাত সময়ে নীলরতন বাবু এক রূপচাঁদকে বাহাল রাখিয়া অপর সকলকেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। নীলরতন বাবুর সংসারে আত্মীয়ের মধ্যে কেবল কন্যা ও বিধবা ভগ্নী; কিন্তু অনেক দূর-সম্পর্কীয়া

নিরাশ্রয়া বিধবাগণকে তিনি অকাতরে অন্নপ্রদান করিতেন। দরিদ্রতা তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে বলিয়া, তিনি এরূপ মহৎ অথচ কর্ত্তব্য কার্য্যে জলাঞ্জলি দিতে পারেন নাই। নিরুপমার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব সাতিশয় প্রবল হইয়াছিল, সমস্ত দিন ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়াই তিনি কাটাইতেন, খেলার সময় তিনি ধর্ম্মের খেলা খেলিতেন। এইরূপ পত্নী-লাভে নলিনাক্ষের ন্যায় সাধকের গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম যে সম্যক্ প্রকারে রক্ষিত হইবে--তাহা সহজেই বিবেচ্য।

মুখোপাধ্যায় পরিবারে দরিদ্রতার ছায়া পতিত হইলে নীলরতন বাবুকে সকলেই ত্যাগ করিয়াছিল। রূপচাঁদ কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা প্রাণপণ করিয়া, এই সংসার বজায় রাখিতে চেষ্টা করিত। তাহার ন্যায় বিশ্বাসী ভৃত্য দুর্লভ, কর্ত্তা যাহা করিতে না পারিতেন বা বিস্মৃত হইতেন, রূপচাঁদ তাহা যথাসময়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া কর্ত্তাকে সন্তোষ প্রদান করিত। যশোহর জেলা—রূপোর জন্মস্থান। এক দূর-সম্পর্কীয়া আত্মী তাহার বাস্তু জাগাইয়া অবস্থান করিত এবং যে সামান্য আবাদ আওলাৎ ছিল, তাহাতেই সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। রূপো কখনও দেশে যাইত না, নীলরতন বাবুর মৃত্যুর পর হইতে সে স্বদেশ গমন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিল। মুখোপাধ্যায় পরিবারের তত্ত্বাবধানে রূপচাঁদ নিযুক্ত ছিল বলিয়াই, তাহার প্রতি শক্রর প্রকোপদৃষ্টি কখন কার্য্যকারী হয় নাই।

নিরুপমা এতদিন ছত্রপুরে গিয়াছিল, রূপচাঁদ তাহাকে না দেখিয়া আহারে বিহারে বড়ই অশান্তি বোধ করিতেছিল,

আজ নিরুকে গৃহে দেখিয়া তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। অন্দরে আসিয়া একগাল হাসি হাসিয়া বলিল— "হ্যাগা মা! এতদিন কি দেরী ক'র্ত্তে হয়, আমার এ কয়দিন পেট ভ'রে খাওয়া হয় নাই।" নিরুপমা রূপচাঁদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাহিরে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,— "সর্দ্দার কাকা! তুমি কি খাবে বল না?"

এইবার মহামায়া রূপচাঁদকে দেখিয়া বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন—"সর্দ্দার! তোমার কথাই ঠিক হইল। নলিনাক্ষের সহিত নিরুর বিবাহ দিতে তোমার যে জেদ ছিল, তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল দেখিতেছি। আগামী আষাঢ় মাসে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিতেই হইবে; নলিনাক্ষ বোধ হয়—পুনরায় নদীয়ায় গিয়াছেন, তুমি কল্য তাঁহার সংবাদ লইবে।"

রূপচাঁদ বলিল—"ঠাকরুণ! কল্য কেন আজই যাইব কি?"

মহামায়া। না, এখনও দিন আছে; উতলা হইবার আবশ্যক নাই।

রূপচাঁদ। ঠাকরুণ! আমি ত বলিয়াছিলাম—নলিনাক্ষই নিরুপমার বর, অন্য পাত্রে নিরুর বিয়ে হ'লে, সে সুখে কাল কাটাইতে পারিবে না; আজীবন দুঃখ পাইবে, মা আমার যেমনি সরল—নলিও সেইরূপ, আমি তাহার চালচালন আজ অনেক দিন ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছি!

রূপচাঁদকে অনেক কথা কহিতে দেখিয়া মহামায়া একটু অপ্রতিভ হইলেন। ভৃত্যের সহিত এরূপভাবে কথা কহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। দাস দাসীকে তিনি করতলগত

রাখিতে চেষ্টা করিতেন। মহামায়া রূপচাঁদের কথা শুনিয়া বলিলেন "রূপচাঁদ! অদ্য আর কাজ নাই। সমস্ত দিনরাত্রি জলপথে আসিয়া আমার শরীর এখনও বড়ই অসুস্থ রহিয়াছে। কল্য প্রাতঃকালে তোমায় একবার নলিনাক্ষবাবুর সন্ধানে পাঠাইব, অদ্যকার মত তুমি স্বকার্য্যে প্রস্থান কর।

রূপচাঁদ সম্মতি প্রদর্শন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

বিবাহের কথা হইতেছে দেখিয়া, নিরুপমা তথা হইতে চলিয়া গেল, রূপোও নিজের কার্য্যে গমন করিল। ত্রিলোচন কর্ত্রীর কথামত কার্য্যস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। মহামায়া সকলকে বিদায় দিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক সমাপন করিতে পূজাগৃহে গমন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সম্পত্তি অপহরণ।

মরজগতে বসিয়া অমরার সুখানুভব কাহারও ভাগ্যে চিরকাল ঘটে না। সর্ব্বপ্রথম নীলরতন বাবু নবাবের অধীনে বর্দ্ধমান জেলার ফৌজদারের কার্য্য করিতেন, কার্য্যে তাঁহার সুযশ ও মহত্ত্ব বাড়িয়াছিল এবং তথায় তাঁহার প্রসার, প্রতিপত্তিও বেশ ছিল, উপার্জ্জনও যথেষ্ট হইত। পূর্ব্বে তাঁহার পিতার যৎসামান্য ভূসম্পত্তি ছিল বটে; কিন্তু স্বকৃত-উপায়ে ঐ সম্পত্তি পরে সুবৃহৎ জমিদারীতে পরিণত করিয়াছিলেন। নীলরতন বাবুর গৃহিনী যথার্থ সুলক্ষণা, লক্ষ্মীস্বরূপিণী ছিলেন, তাঁহারই গুণে এ সংসার এত অল্পদিনের মধ্যে উথলিয়া উঠিয়াছিল। পুত্রাদি হইবে না দেখিয়া নীলরতন বাবু সৎকার্য্যে অনেক টাকা ব্যয় করিতেন। পূজা-পার্ব্বণে নীলরতন বাবু নিজ জন্মভূমি দর্শন করিতে রুদ্রপুরে আসিতেন; নতুবা কর্ম্মস্থান বর্দ্ধমানেই অবস্থান করিতেন। কয়েকজন দাস দাসী ও বৃদ্ধ গোমস্তা ত্রিলোচন বিশ্বাস রুদ্রপুরে নীলরতনের সেই সুবৃহৎ অট্টালিকা অধিকার করিয়া অবস্থান করিত। প্রভুর আবশ্যক হইলে বা কোনও বিষয় নিষ্পত্তি করিতে হইলে, তাহারা সময়ে সময়ে বর্দ্ধমানে গমন করিত। রুদ্রপুরে শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমিদারী ইঁহার অপেক্ষা বহু পরিমাণে অধিক হইলেও সুযশ ও মহত্ত্বে নীলরতন বাবু তাঁহার অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায় পিতার ধনে ধনবান, বৃহৎ জমিদারীর একমাত্র কর্ত্তা, সৎকার্য্য যত করুন আর নাই করুন—প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল। মামলা মোকর্দ্দমায় তিনি যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেন। প্রকারান্তরে লোকের বিষয়-সম্পত্তি নিজ করতলগত করা, তাঁহার বড়ই অভ্যাস ছিল। এইজন্য মামলা মোকর্দ্দমা প্রায় লাগিয়াই থাকিত। কূটবুদ্ধি তাঁহার অতিশয় প্রখর ছিল। এইরূপে তিনি নানাস্থানে আপনার জমিদারী বিস্তৃত করিতে পারিয়াছেন। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে সময় দেশ একপ্রকার অরাজক বলিলেই হয়, নবাবের অত্যাচারে অনেকেই ইংরাজের শরণাপন্ন হইতেছে। কে কাহাকে দেখে, সকলেই নিজের ধন-প্রাণ-মান লইয়া ব্যস্ত, শ্রীধরও সময় বুঝিয়া এই সময় লোকের বিষয়-সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল! একবার বর্দ্ধমানে কোনও একটা বিষয়-সম্পত্তি লইয়া শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মামলা উপস্থিত করেন। তাহাতে একটী ভদ্রপরিবারের সর্ব্বস্বান্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। দৈবক্রমে সেই মোকর্দ্দমা ফৌজদার নীলরতন বাবুর এজলাসেই দায়ের হইয়াছিল। নীলরতন বাবু পূর্ব্ব হইতেই শ্রীধরকে বিশেষরূপে চিনিতেন। তিনি বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক এই মোকর্দ্দমার সুবিচার করিলেন। সে ক্ষেত্রে শ্রীধরের মোকর্দ্দমা হার হইয়া গেল। শ্রীধর বড় ভয়ানক লোক, ছাড়িবার পাত্র নহেন, এই সময় হইতে তাঁহার হৃদয়ে প্রতিহিংসা-বৃত্তি পোষিত হইতে লাগিল। কিসে নীলরতন বাবুর মন্দ করিতে পারিবেন, এই চিন্তাই তাঁহার মহাচিন্তা হইল। এই সময় হইতেই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষণের সূত্রপাত; কিন্তু নীলরতনের সহিত সহজে কিছু

করিতে পারিলেন না। নীলরতন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্, ধার্ম্মিক ও আইনজ্ঞ, মোকর্দ্দমায় তাঁহার সহিত পারিয়া উঠা বড় সহজ ব্যাপার নহে; কিন্তু শ্রীধর ভয়ানক চরিত্রের লোক, নানা প্রকার ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া পুনঃপুনঃ মোকর্দ্দমায় নীলরতনকে ব্যতিব্যস্ত করিতে, তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইলেন না। শ্রীধরের ত অর্থের অভাব নাই; সংসারও অতি অল্প; ইহাতেও তাঁহার ধন-পিপাসা নিবৃত্তি হয় না। সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করিতে তাঁহার ন্যায় কৃপণ, তদঞ্চলে আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইত না।

শিক্ষায় জ্ঞানলাভ হইলে চরিত্র গঠন হয়, অশিক্ষিত ব্যক্তি নষ্ট-চরিত্র হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? শিক্ষায় জ্ঞানলাভ না হইলে, চরিত্র রক্ষা করা অতীব কঠিন। শ্রীধর বাবু সামান্য শিক্ষিত হইলেও তাহাতে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন,—তাহা বিভিন্ন পথে ধাবিত। আর নীলরতন বাবুর জ্ঞানলাভ স্বতন্ত্র, মতিগতি স্বতন্ত্র। নীলরতন বাবু সাত্ত্বিক প্রকৃতি ও শিক্ষিত হইলেও, বহুদায়িত্বপূর্ণ বিচারকের কাজে ব্যাপৃত থাকিলেও নিজের ব্রাহ্মণ্যে জলাঞ্জলি প্রদান করেন নাই। তিনি ব্রাহ্মণের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলি সমস্ত বজায় রাখিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। স্ত্রীও লক্ষ্মীস্বরূপিণী, প্রভাবতী যেন সাক্ষাৎ কমলা। এই জন্যই তাঁহার সংসার এত অল্পদিনে উজ্জ্বল শ্রীধারণ করিয়াছিল; বর্দ্ধমানে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহাদের সুখ্যাতি করিত। রুদ্রপুরে দুইটী জমীদার হইলেও নীলরতন বাবুর নাম স্বদেশে অপেক্ষা বিদেশেই অধিক, তাহার কারণ তিনি স্বদেশে থাকিতেন না, কর্ম্মস্থানেই থাকিতেন। সৎপথে থাকিয়া যেরূপ

বিষয় বৈভব থাকা সত্ত্ব—তাঁহার সেইটুকু ছিল, তাহাতে তিনি আবার অনেক সদ্ব্যয় করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অনেক ছাত্রকে তিনি নিজে ভরণপোষণ করিতেন। দরিদ্রের কাতর ক্রন্দন শুনিলে তাঁহার নিদ্রা হইত না,—যে কোন প্রকারে হউক, তাহাকে সাহায্য করিতেন। শিক্ষায় জ্ঞান লাভ করিলে এই-রূপই হৃদয়ের বিকাশ হয়। হৃদয় বিকাশই মনুষ্যত্ব, যাহার যেমন হৃদয় সে তেমনি মানুষ, যাহার যতটুকু হৃদয়, তাহার ভিতর ঠিক সেইটুকু পরিমাণে মনুষ্যত্বের বিকাশ। নীলরতন হৃদয়বান্ ব্যক্তি বলিয়া তাঁহাতে তদুপযুক্ত মনুষ্যত্ব বজায় ছিল। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সময় হইতে দুঃখের পর সুখ, অভাবের পর সচ্ছলতা হইয়াছিল বলিয়া ক্ষুদ্র-হৃদয় ব্যক্তির মত তাঁহার হৃদয়ে অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না। সহধর্ম্মিণী প্রভাবতীও সেইরূপ —ধর্ম্মের সংসারে সুখের ভাতি প্রতিফলিত করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান হইতে নদীয়ায় আসিয়া তিন চারি বৎসর পরে নিরুপমার জন্ম হয়। সেই হইতে তাঁহাদের আর কোনও পুত্র কন্যা হয় নাই; অধিকন্তু নানাবিধ জটিল রোগে প্রভাবতীকে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলিল, তথাপি নিজ স্বামী পুত্রের কার্য্য অন্য কাহাকে দিয়া করাইলে তাঁহার মনঃপূত হইত না,—তিনি যত-দূর পারিতেন স্বহস্তে এ সকল কার্য্য করিতেন; নীলরতন কত নিষেধ করিতেন, স্ত্রীস্বভাব-সুলভ নীরবতা গুণে যতদূর সম্ভব তিনি আপনার ব্যাধির বিষয় চাপিয়া রাখিয়াছিলেন; ছাত্রবর্গ ও আত্মীয়বর্গের আহারাদি হইল কি না, লোক দ্বারা তিনি প্রত্যহ বিশেষ করিয়া সন্ধান লইতেন। সময় ভাল হইলে লোকেরও অভাব হয় না, তখন সকলেই আত্মীয়। জমিদারী

প্রভৃতিতে নীলরতনের চারি পাঁচ শত টাকা আয় হইলেও খরচ যথেষ্ট ছিল। অল্প বয়সে মাতৃহীন হওয়ায়, পিতৃভক্ত নীলরতন পিতার সঙ্গ ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। পিতাকে তিনি সাক্ষাৎ দেবতার মত ভক্তি করিতেন।

আজকাল প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে এবং তদ্দ্বারা সরকারের কোন উচ্চপদাভিষিক্ত হইলে অনেকেরই স্বধর্ম্মে মতি থাকে না, প্রায়ই মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া আসুরিকভাবে গঠিত হইয়া থাকে, অহঙ্কারে তাহাদের দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন হইয়া তাহারা যেন কিরূপ এক অপার্থিব জীবরূপে পরিণত হইতে থাকে; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, যে ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি লাভ হউক না কেন, যে শিক্ষায় শিক্ষিত হউক না কেন, যদি সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা হয় এবং তাহাতে যদি যথার্থ জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইলেই যে স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, ইহার কোনও অর্থ আছে কি? নীলরতন সকল ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহার সারভাগটুকু গ্রহণ করিতেন, আপনার ধর্ম্মে তিনি প্রগাঢ় আস্থাবান ছিলেন, "স্বধর্ম্মে মরণং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহ" এ কথার তাৎপর্য্য তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় নীলরতনের আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। তাঁহার পিতার যে যৎসামান্য ভূসম্পত্তি ছিল, তদ্দ্বারাই গ্রাসাচ্ছাদন কষ্টে চলিয়া যাইত। তিনি একজন ধীশক্তিসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন, নিজের অধ্যবসায় গুণে তিনি যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। হিন্দুমাত্রেই অদৃষ্টবাদী, তিনিও একজন ঘোর

দৃষ্টবাদী ছিলেন। এই সময় প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে কোনও রিদ্রার একমাত্র কন্যার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। ধবার কষ্ট দেখিয়া, তাঁহার দয়ালু পিতা তাহার কন্যার সহিত জ পুত্রের বিবাহ দিয়া বিধবাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করেন। ই সময় হইতে প্রভাবতী তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী হইলেন। বিধবার ার কেহ ছিল না বলিয়া, তিনিও জামাতার গলগ্রহ হইলেন বং প্রাণপণে যাহাতে জামাতার সংসারের উন্নতি হয়, তাহার চষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু এ চেষ্টা তাঁহাকে বেশীদিন রিতে হয় নাই। কন্যার বিবাহের এক বৎসর পরেই, তিনি কল যন্ত্রণা তুচ্ছ করিয়া ভবলোক পরিত্যাগ করেন। প্রভাবতী ননীবিয়োগজনিত দুঃখে কয়দিন মুহ্যমানা ছিলেন, আহার বহার কিছুতেই তিনি সুখভোগ করিতে পারিতেন না, স্বামীর তাদৃশ আদর ভালবাসায়ও তিনি জননীর অভাব অনুভব রিয়া অশেষবিধ শোক করিতেন।

শোকে মানুষ পাগল হয় সত্য, কিন্তু ইহা যদি চিরদিন মভাবে থাকিত, তাহা হইলে বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্য কি এরূপ সুন্দরভাবে পরিচালিত হইতে পারিত? শোক চিরকাল মান থাকে না, নবীন শোকে মনুষ্য আত্মহারা হয়, আবার দনের পর দিন, মাসের পর মাস গেলে সেই শোকাগ্নি সান্ত্বনা-লিল-পাতে ক্রমশঃ নির্ব্বাপিত হইতে থাকে—ইহাই প্রকৃতির বিধিবদ্ধ নিয়ম। প্রতিবেশী রমণীগণের সান্ত্বনায়, স্বামীর ভালবাসায় প্রভাবতী ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিলেন। প্রথমাবস্থায় তাঁহাকে নীলরতনের সংসারে যারপর নাই কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। নীলরতন ফৌজদারী পদ পাইয়া

বর্দ্ধমানে আসিলে, ক্রমে তাঁহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল।

জগতে রমণীজাতিই সহিষ্ণুতার আধার, বিধাতা সহ্য করিবার জন্যই নারীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরুষে যাহা পারে না—সামান্য কষ্টে একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়ে, রমণী তাহা অম্লানবদনে সহ্য করিয়া থাকে। নীলরতন পাছে কোনও প্রকারে নিরুৎসাহ হইয়া যান, এইজন্য প্রভাবতী শ্বশুরের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিতেন। কোনপ্রকার অভাব অভিযোগের বিষয় স্বামীকে জানাইয়া তাঁহাকে মনমরা বা দিশেহারা করিতেন না। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে বলিয়া ভগবানের সৃষ্ট, হস্তপদবিশিষ্ট মানবের নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা উচিত নহে। কেবল অদৃষ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি নিশ্চেষ্ট-ভাবে বসিয়া থাকাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি মানবকে হস্তপদাদি বিশিষ্ট করিয়া সৃজন করিতেন না। আত্মোন্নতির জন্য চেষ্টা করা মানুষ মাত্রেরই উচিত। চেষ্টা সফল হউক আর না হউক, যতদিন চেষ্টা ততদিন আশা, এই আশাই জীবনের সার, যতদিন এই আশা মানুষের সঙ্গে থাকে, ততদিন জীবন দুর্ব্বহনীয় হয় না। এ জগতে আশার আশ্বাসে আশ্বাসিত হয় না, আশার মোহিনীমন্ত্রে প্রলোভিত হয় না, এমন জীব কয়জন আছে? অতএব চেষ্টা থাকিলেই উন্নতির আশা থাকিবে, নীলরতনের উন্নতির চেষ্টা বড়ই প্রবল ছিল, তাই তিনি আজ নিজ প্রতিভাবলে—একজন গণ্যমান্য ফৌজদার, তাই তাঁহার যশঃ সৌরভ আজ চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

বর্দ্ধমানে দুর্দ্দমনীয় বসন্তরোগে তাঁহার পিতার স্বর্গলাভ হওয়ায়, নীলরতন আর তথায় থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না; সে স্থান আর তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি স্থানান্তরিত হইবার জন্য দরখাস্ত করিলে, সরকার বাহাদুর তাঁহাকে নদীয়ায় বদলী করিয়া দিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রভাবতী নানাবিধ জটিলরোগে ভুগিতেছিলেন। এখানে আসিয়া জলবায়ু তাহার সহ্য হইল না, রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নীলরতনের অর্থের অভাব নাই, লোকজনের অভাব নাই, অজস্র অর্থব্যয় করিয়া বড় বড় চিকিৎসক দ্বারা তিনি পত্নীর চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু চিকিৎসায় কি হইবে? যে রোগ অসাধ্য—জীবন গ্রহণ করাই যে রোগের উদ্দেশ্য, অজস্র অর্থব্যয় করিয়া চিকিৎসক আনিলেই কি তাহা সুসাধ্য হইতে পারে? তাহা হইলে ত ধনীগণ কৃতান্ত কবল হইতে অনায়াসেই রক্ষা পাইত। কৃতান্তের নিকট ধনী দরিদ্র নাই, শিশু বৃদ্ধ নাই, সময় হইলেই সে তাহাকে আত্মসাৎ করিবে, ইহার অন্যথা করিবার সাধ্য কাহারও নাই। মৃত্যুর হস্ত অতিক্রম করা নর-জগতের অসাধ্য! নীলরতনের সকল আশায় ছাই পড়িল, প্রভাবতী তাঁহাকে অকূল শোক-সাগরে ভাসাইয়া এই সুখের সময় চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। নীলরতন সংসার অন্ধকার দেখিলেন। এতদিন যে সংসার তাঁহার নিকট আনন্দ নিকেতন ছিল, যে নর-জগতে বসিয়া তিনি এতদিন অমরার সুখানুভব করিতেছিলেন, আজ তাহা ফুরাইল। একের বিহনে নীলরতন আজ সমস্ত শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। সমস্তই আছে,—

দাস, দাসী, বিষয় বৈভব কিছুই সঙ্গে যায় নাই, তথাপি যাঁহার গুণে এ সকল এত নয়ন-মনোহর দেখাইত, যাঁহার গুণে আঁধারে আলো ফুটিত,—সে কই? সে যে চিরতরে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। যাঁহার সৌন্দর্য্যে সমস্ত সৌন্দর্য্যময় ছিল, অতি কষ্টের সময় যাঁহার সুমিষ্ট বচনসুধা পান করিয়া নীলরতন অদম্য উৎসাহে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য করিয়াছিলেন, সমস্ত দুঃখ কষ্ট, বিষাদ অবসাদ ভুলিয়া গিয়াছিলেন—আজ সে কই? নীলরতন পতিব্রতা স্ত্রীর শোকে অন্তরে পুড়িতে লাগিলেন বটে; কিন্তু বাহিরে তাঁহাকে কেহ শোকার্ত্ত বলিয়া জানিতে পারিল না। তিনি প্রভাবতীর জীবনধন নিরুপমাকে ক্রোড়ে করিয়া যেন সমস্ত ভুলিলেন, অসীম শোক-সাগরে নিরুপমাই যেন তাঁহার ভেলা স্বরূপ হইল। গভীর অন্ধকারে নিরুই যেন তাঁহাকে আলোক প্রদর্শন করিতে লাগিল। প্রভুভক্ত রূপচাঁদ এখন আর কি করিবে। সে কর্ত্তার কাছে কাছে থাকিয়া কত বুঝাইত, কত দৃষ্টান্ত দেখাইত—যদি কর্ত্তা তাহাতে কিছু সুস্থ বোধ করেন।

প্রভাবতীর মৃত্যুর পর হইতেই নীলরতনের অবনতির সূত্রপাত হইল। স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভগ্ন হইতে লাগিল। নিরুপমাকে লইয়া রূপো প্রথম প্রথম বড়ই বিব্রতে পড়িয়াছিল, কিন্তু সে ভাব বেশী দিন থাকে নাই। রূপচাঁদ ক্রমশঃ তাহাকে আয়ত্তাধীন করিয়া আনিয়াছিল। সংসারের কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া রূপচাঁদ যেটুকু সময় পাইত, সেটুকু প্রভুর কাজেই অতিবাহিত করিত, প্রভুভক্ত ভৃত্য অহরহঃ প্রভুর কাছে

কাছে থাকিয়া তাঁহার মনের মত কার্য্য করিতে লাগিল। হুকুমানুসারে কার্য্য করিয়া নীলরতনকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে, রূপচাঁদ আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিত।

শরীরের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে দেখিয়া, নীলরতন পেন্‌সীয়ানের জন্য দরখাস্ত করিলেন—তাহা মঞ্জুর হইল। এইবার তিনি কিয়দ্দিন তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবার বাসনা করিয়া রুদ্রপুরে আসিলেন, মহামায়াকে সংসারের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া তিনি প্রায় বৎসরকাল এ তীর্থ, সে তীর্থ করিয়া দেশে আসিলেন। দেখিলেন বালিকা নিরুপমা রূপের পসরা লইয়া পিসীমাতার আদর-যত্নে জননীর শোক বিস্মৃত হইয়াছে, এখন বেশ হাসি খেলায় দিন কাটাইতেছে, সে পিতাকে পাইয়া আর ছাড়িতে চাহিল না; কিন্তু নীলরতন গৃহবাসে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া ভগ্নীর প্রতি সমস্ত ভারার্পণ করতঃ কন্যার সহিত গুরুগৃহে গমন করিলেন। এই সময় হইতেই নিরুপমার সহিত নলিনাক্ষের প্রণয় দৃঢ় হয়।

গঙ্গাতীরে বালক বালিকার সেই সরল মধুর ভালবাসা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিত—এই দুইটি প্রাণ একত্র মিলিত হইলে, ইহাদের দ্বারা জগতের অনেক মঙ্গল-কার্য্য সাধিত হইবে। কিন্তু প্রণয় কি পদার্থ তখন উভয়ে কিছুই বুঝিত না। গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ফুল তুলিত, গঙ্গা হইতে জল আনিত। নীলরতন এ দৃশ্য দেখিয়া একবার আনন্দ, পরক্ষণে আবার বিষাদ-সাগরে নিমজ্জিত হইতেন—মনে করিতেন—হায়! এ দৃশ্য যদি প্রভাবতী দেখিত, যাহার জন্য তিনি নলিনাক্ষকে মানুষ করিয়া গুরুগৃহে রাখিয়াছেন, তাহা হইলে

তাহার কত আনন্দ হইত। নলিনাক্ষ যখন পড়ায় রত থাকিত তখন নিরুপমা একাই সমস্ত করিত। ইহা দেখিয়া নীলরতন সত্বর তাহাদের মিলনের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু নলিনাক্ষের পাঠে অসুবিধা হইবে বলিয়া, তিনি এ কার্য্য এত শীঘ্র সম্পন্ন হইতে দেন নাই। তার পর নীলরতন গুরুর আদেশে কাশী গমন করিয়া তথায় ইহলীলা সম্বরণ করেন। এইজন্য তাহাদের মিলনেও নানা প্রকার বিঘ্ন ঘটিতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—যখন উদাসভাবে নীলরতন সতী-বিহনে সতীকান্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, সেই সময়ে অবসর পাইয়া পাপিষ্ঠ শ্রীধর বাঁড়ুয্যে বৈর-নির্য্যাতন কামনায় নিজ কূটমন্ত্রণা বলে নীলরতনের জমীদারী আত্মসাৎ করিল। বৎসরান্তে তিনি গুরুর আদেশে স্বদেশে আসিয়া উক্ত জমীদারী উদ্ধারের আর কোন উপায় বিধান করিতে পারিলেন না। আর সে সময় তাঁহার মতি এত ধর্ম্মপথের পথিক হইয়াছিল, যে সে বৃথা বিষয়ে তাঁহার আর চেষ্টা রহিল না। তাঁহার বিষয় উপভোগ করিবার মধ্যে কেবল নিরুপমা, কিন্তু এখনও যে খাজনা আদায় হয়, তাহাতেই তাহার বেশ চলিয়া যাইবে। অসার বিষয়ে মজিয়া আর তিনি পরকাল হারাইতে ইচ্ছা করিলেন না।

নীলরতন কন্যাকে নয়নের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। নিরুপমার জন্যই তাঁহার যত কিছু ভাবনা, কিন্তু এখনও যাহা আছে তাহাতে বেশ সুখে চলিয়া যাইবে। আর নলিনাক্ষ যেরূপ শিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আর তাহার জন্য ভাবনার কারণ নাই। তবে আর কেন বৃথা

অর্থ অর্থ করিয়া সময় নষ্ট করি। এই জন্য তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠে, ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে কন্যাকে লইয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। গুরুদেব সময় সময় আসিয়া তাঁহার পরকাল নিস্তারের পথ প্রশস্ত করিবার উপদেশ প্রদান করিতেন। নিরুপমা ক্রমশঃ বড় হইতেছে, এইবার তাহার বিবাহ দিয়া সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন—ইহাই তাঁহার মনোগত ইচ্ছা ছিল।

পাত্র ত বহুদিন হইতে স্থির করাই আছে। নলিনাক্ষ তাঁহাদের স্ববর ও সুশিক্ষিত, এইবার তাহাদের মিলন করাইয়া দিতে পারিলেই সমস্ত গোল মিটিয়া যায়। জামাতার নামে সমস্ত উইল পত্র করিয়া দিয়া তিনি গুরুর সহিত মিলিত হইবেন এরূপ স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু ভাগ্যে তাহা ঘটিল না—মানুষ যাহা মনে ভাবে, ভগবান তাহা সম্পন্ন হইতে দেন না। নীলরতনের মনের সঙ্কল্প মনেই মিলাইল। জগতের সহিত ধার্ম্মিকবর নীলরতনের সমস্ত সম্বন্ধ চিরতরে ঘুচিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পাপের প্রতিফল।

পাপ করিলেই ভুগিতে হইবে—ইহা ভগবানের অকাট্য নিয়ম – এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। তবে কাহাকেও বা দুই দিন অগ্রে, আর কাহাকেও বা দুই দিন পশ্চাতে, তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। অনেকেই আপাত-মধুর পাপ-কার্য্যে রত হইয়া মনে করে—বুঝি এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম। অর্থ হইয়াছে, এখন আর তাহার কার্য্যে বাধা দেয় বা তাহার কার্য্যকে অন্যায় প্রতিপন্ন করে—এমন আর কে আছে। জগতে অর্থবলে এরূপ অনেক অসাধ্য সাধন হইতে পারে। মানুষ অর্থের দাস, অর্থ থাকিলেই জগতে সকল কাজ করিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। তুমি যেরূপ দোষ করিয়াই অর্থ-সংগ্রহ কর না কেন, একবার ধনবান হইতে পারিলে, তোমার সে দোষ ঢাকিয়া যাইবে, কেহ আর সে দোষ ধরিবে না - কেহ তাহার প্রতিবাদও করিবে না। স্বার্থপর, অর্থলোলুপ মানবের নিকট তখন তুমি খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পার, মর-জগতের চক্ষে তখন তুমি ধূলি দিতে পার বটে—কিন্তু সেই সর্ব্বদর্শী চক্ষু, যে চক্ষে নিদ্রা নাই, যে চক্ষু চিরজাগ্রত—যিনি চৈতন্যময়, সেই বিশ্ব-বিধাতা নিকট কাহারও নিস্তার নাই। তিনি তোমার অর্থ দেখিয়া ভুলিবেন না সেই ভাগ্য বিধাতা, অদৃষ্টদেব তাহার প্রতিফল প্রদান করিবেনই করিবেন

সেই পরম-বিচারীর নিকট সকল বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার হইবেই হইবে।

শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায় যৌবনে অনেক পাপ সঞ্চয় করিয়াছেন। অনেকের অনেক ব্রহ্মোত্তর কাড়িয়া লইয়াছেন. অনেককে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছেন, একদিন না একদিন যে তাহার প্রতিফল ভুগিতে হইবে, কার্য্যকালে তিনি একবারমাত্রও এ বিষয়ের চিন্তা করেন নাই ; অর্থ তাঁহার সে লক্ষ্য ব্যর্থ করিয়াছিল।

যখন মানুষ পাপপঙ্কে লিপ্ত হয়—তখন তাহার দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না ভাবে এমনি দিনই বুঝি চিরকাল যাইবে। পাপপুণ্যের যে একজন বিচারকর্ত্তা আছেন—সে বিষয় তখন আর তাহার মনে থাকে না। অতি গোপনে পাপ সঞ্চয় করিয়া সকল স্থান হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, কিন্তু ভগবানের নিকট অব্যাহতি লাভ কিছুতেই করিতে পারিবে না—তাহার প্রতিফল অবশ্যই ভুগিতে হইবে।

সময়ে তাহার সূত্রপাত হইল। শ্রীধর হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। অজস্র অর্থ-ব্যয় করিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন, কিন্তু এ রোগ কিছুতেই উপশম হইল না, রোগ ক্রমশঃ ভীষণাকার ধারণ করিতে লাগিল। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী দেখিয়া, শ্রীধর পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন ; তাঁহার বলবতী অর্থলালসার প্রকোপ কমিয়া আসিতে লাগিল। তিনি এই দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগের সহিত বুঝিতে পারিলেন, অমৃত ভ্রমে তিনি কি হলাহল পান করিয়াছেন। কিন্তু সে সময় আর অনুতাপ করিলে কি হইবে। এখন যে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন, ফিরিবার ত আর উপায় নাই।

এ রোগে সত্বর মৃত্যু না হইলেও যার পর নাই যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয়, এ রোগ সুরূপকে কুরূপ করিয়া ফেলে, সুন্দর ললাম-ভূত-গঠন-প্রণালীকেও বিকৃতাঙ্গ করিয়া দেয়। শ্রীধরের যে অমন তপ্তকাঞ্চন-সন্নিভ সুগঠিত বরবপু; আজ দুই বৎসর এই ভীষণ রোগ ভোগে—তাহা বিকৃত হইয়াছে, সে সুন্দর গৌরবর্ণ কালিমাময় হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে অর্থের দ্বারা যে সকল রোগের সহজ আবির্ভাব হইতে পারে, সে সকল পীড়া ত হইয়াইছিল। তবে তাহার উপর এই পক্ষাঘাত মহৎ এবং তাহাতেই তিনি এখন শয্যাশায়ী হইয়া জীর্ণশীর্ণ ও দিন দিন মলিনত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। শয্যায় পড়িয়া যখন তিনি পূর্ব্বকৃত পাপের অনুশোচনা করিতেন, তখন সকল পাপ অপেক্ষা নীলরতনের জমিদারী প্রকারান্তরে অপহরণ করারূপ পাপকার্য্যটী তাঁহাকে ভীষণভাবে যন্ত্রণা প্রদান করিত। এই গুরুতর পাপকার্য্যটীই যে তাঁহার পাপের মাত্রা সম্যক্ প্রকারে বৃদ্ধি করিয়াছিল ইহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই পরিত্রাণের জন্য শেষ দশায় নীলরতনের পরিবারবর্গের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। নীলরতনের ভাগ্য-হীনা কন্যার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য মনন করিয়াছিলেন।

নীলরতন একজন বিশিষ্ট কুলীন ছিলেন। এখনকার কুলীনের মত তিনি কু-লীন হন নাই; যে সকল লক্ষণ থাকিলে কুলীন পদবাচ্য হওয়া যায়, নীলরতনে সেই আচার-বিনয়-বিদ্যা প্রভৃতি নবধা কুললক্ষণ সম্যক্‌রূপে বর্ত্তমান ছিল; তিনি যথার্থ মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া কুলীন হইয়াছিলেন—পিতৃ

নাম অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। তাই তাঁহাদের স্বঘর-পাত্র পাওয়া বড়ই দুর্লভ হইয়াছিল, বিশেষতঃ তিনি কেবল কুলমর্য্যাদা দেখিয়াই পাত্র স্থির করিতে রাজি ছিলেন না, এইজন্য তিনি নলিনাক্ষের ন্যায় চরিত্রবান্ কুলীন পাত্রেই কন্যাদান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। নলিনাক্ষ তাঁহার অপেক্ষা কুলমর্য্যাদায় সামান্য হীন হইলেও স্ব-ঘর ও সুশিক্ষিত বলিয়া, তিনি নলিনাক্ষকেই নিরুপমা দানে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কুল-মর্য্যাদার একটু লাঘব হইলে কি হইবে, নিরুপমাকে নলিনাক্ষের করে সম্প্রদান করিলে নিরুপমা সুখী হইবে; কন্যার জন্য আর তাঁহাকে কোন ভাবনাই ভাবিতে হইবে না; কারণ নলিনাক্ষ দরিদ্রের পুত্র হইলেও সকল বিষয়েই তাহার উপযুক্ত; শুধু শিক্ষায় কেন, নলিনাক্ষ যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যে পারদর্শী হইয়াছে, কালে তাহার দ্বারা যে অনেক অসাধ্য সাধন হইবে, তাহা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নলিনাক্ষের ভিতরে যে মহত্বটুকু ছিল, তাহা তিনি মানস-চক্ষে দেখিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি নলিনাক্ষকেই ভাবী-জামাতা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং একটু সুযোগ ঘটিলেই কন্যা পাত্রস্থ করিবেন, এই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল।

মহামায়া এ সকল বিষয় কিছুই জানিতেন না এবং কেহ বলিলেও বিশ্বাস করিতেন না, কাজেই মহামায়া সহোদরের মৃত্যুর পর নিরুপমার বিবাহের জন্য বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এই সময় রোগ-শয্যাশায়ী শ্রীধর বাঁড়ুয্যে তদীয় কর্ম্মচারী ভুবনেশ্বর বাবুর দ্বারা প্রবোধচন্দ্রের সহিত নিরুপমার পরিণয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার দেবর আসিয়া

প্রস্তাব করিয়াছেন, তখন আর আপত্তি কি? মহামায়া স্ত্রী-লোক, শ্রীধরের ন্যায় ধনবানের সহিত আত্মীয়তা করিতে স্বীকৃত হইলেন, নিরুপমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইলেন। প্রাণের নিরুপমা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইবে—চিরকাল সুখে থাকিবে। আর শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায় জাত্যংশে তাঁহাদেরই স্ব-ঘর এবং অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, কন্যা সম্প্রদানে কুলের কোন অনিষ্ট হইবে না। এই ভাবিয়াই প্রথমে তিনি এ বিষয়ে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কেবল নিরুপমার জন্যই কার্য্য হয় নাই। তার পর যাহা ঘটিয়াছিল, পাঠক-গণ অবগত আছেন। এখন মহামায়া আর কোনক্রমেই প্রবোধের সহিত নিরুপমার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন না, প্রবোধ অধঃপাতে গিয়াছে দেখিয়া—ভুবনেশ্বরও আর এ বিষয়ে মহামায়াকে কোন কথা বলিলেন না। প্রভুপুত্র হইলে কি হইবে, সেইদিন হইতে বরং তিনি মহামায়াকে এ কার্য্য করিতে প্রকারান্তরে নিষেধ করিয়াছিলেন। ধন থাকিলে কি হইবে, নষ্ট-চরিত্র লোকের নিকট বিষয়-বৈভব কতদিন থাকিতে পারে, আর বিষয় থাকিলেই কি মানুষ সুখী হইতে পারে? নিরুপমার ন্যায় রমণীরত্ন কেবল বিষয় দেখিয়া, অর্থ লইয়া এ জগতে সুখী হইতে পারিবে না। এই জন্য তিনি এ বিষয়ে এক প্রকার উদাস হইয়াছিলেন। শ্রীধর বাবু সময়ে সময়ে তাহাকে বলিতেন, "ভুবন! আমি আর বেশীদিন বাঁচিব না, তুমি প্রবোধের বিবাহের চেষ্টা কর, শেষ দশায় পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া মরিতে পারিলেও সুখে মরিতে পারিব। নীলরতনের কন্যার সহিত বিবাহ হইলেই ভাল হয়।"

ভুবনেশ্বর নানাপ্রকার কথা বলিয়া, সে সকল কথা উড়াইয়া দিতেন। অন্য সময় হইলে এরূপ কার্য্যে হয়ত ভুবনেশ্বর শ্রীধরের বিষনয়নে পড়িতেন, কিন্তু এখন ভুবনেশ্বর বাবুর ন্যায় পুরাতন কর্ম্মচারীকে পরিত্যাগ করিলে—পাছে সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, এই জন্য কিছু করিতে পারেন নাই। ভুবনেশ্বর বাবু আর এ সংসারে দাসত্ব করিতে ইচ্ছা করেন না, তবে শ্রীধর বাবু যে কয়েকটী দিন জীবিত আছেন, কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহাকে সে কয়টি দিন থাকিতে হইবে।

শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও প্রবোধের সহিত নিরুপমার বিবাহ সংঘটনের চেষ্টা, আর কেহই করে না। ইচ্ছা থাকিলেও শ্রীধর তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছেন না। সুস্থ থাকিলে যে স্থানে হউক, তিনি এতদিন তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিতে পারিতেন, বধূ-মুখ-দর্শন-লালসা, আরও কত লালসা মিটাইতে পারিতেন; কিন্তু পক্ষাঘাতে তাঁহার উত্থানশক্তি রহিত, কাজেই মনের বাসনা, সমুদ্রে ঊর্ম্মিমালার ন্যায় মনে আপনি উদ্ভূত হইয়া আপনিই মিলাইতে লাগিল।

শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এতদিন প্রবোধকে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র বলিয়া জানিতেন। তিনি শয্যাশায়ী হইয়া বৎসরাবধি প্রবোধের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে লাগিলেন। সমস্ত বিষয়ের এক মাত্র কর্ত্তাই এখন প্রবোধ; অর্থ থাকিলে এবং তাহার সদ্ব্যবহার করিতে না জানিলে—চরিত্র যে সকল কলঙ্কে কলুষিত হওয়ার সম্ভব, প্রবোধের তাহা হইয়াছিল। প্রবোধ এখন প্রায়ই বাটীতে আসে না; পিতার সহিত প্রায়ই দেখা করে না, আপনার আমোদ আহ্লাদ লইয়াই ব্যস্ত থাকে।

নিজের বুদ্ধিদোষে পত্নীর সহিতও শ্রীধরের তাদৃশ সদ্ভাব নাই; তবে তিনি পাতিব্রত্য বজায় রাখিবার জন্য অসহ্যও সহ্য করিয়া পতি-অনুগামিনী ছিলেন। প্রবোধের ন্যায় একেবারে হতশ্রদ্ধা করেন নাই, পতিসেবায় অবহেলা করেন নাই। অনেক সময় তিনি তাঁহার পাপের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন;—লোকের মনঃকষ্ট দিলে এক সময় না এক সময় যে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে এ সকল বিষয় তিনি স্বামীর স্মৃতি-পথে আনিয়া দিতেন, কিন্তু "চোর না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" উদ্দাম যৌবনের প্রবল তরঙ্গে অর্থ-মোহে মোহিত হইয়া, তাহা তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেন না, অবাধে কত পাপ কাজ করিয়াছেন। এখন তাহার অনুশোচনা বা অনুতাপ করিলে কি হইবে? অনুতাপে কি পাপের ভার লাঘব হইতে পারে। প্রবাদ আছে, "অজ্ঞানের পাপ জ্ঞানে খণ্ডায়, জ্ঞানের পাপ তীর্থে খণ্ডায়, তীর্থের পাপের খণ্ডন কোথাও নাই।" বাল্য-কালে অজ্ঞান বশতঃ কোনও পাপ করিলে, অনুতাপ দ্বারা সে পাপের গতিরোধ হইতে পারে! পাপের মাত্রা আর বৃদ্ধি না হইলে আজীবন জীবন-ভার তত দুর্ব্বহ হয় না। অনুতাপ দ্বারা এইটুকু মাত্র উপকার হইতে পারে, নতুবা কৃতকর্ম্মের ফলভোগ তোমাকে করিতেই হইবে। এই জন্য ধার্ম্মিকবর পুণ্য-শ্লোক রাজা যুধিষ্ঠিরের ভাগ্যেও নরক দর্শন হইয়াছিল। কৃতকর্ম্মের ফলভোগের পর তুমি পুণ্যময় হইতে পার, সুখের অধিকারী হইয়া আজীবন সুখভোগে কাটাইতে পার। চির-কাল পাপ করিয়া, কে কবে জগতে সুখী হইয়াছে। পাপীর হৃদয়ে সুখ ক্ষণস্থায়ী, দুঃখের আকর; পুণ্যাত্মার নির্ম্মল হৃদয়-মুকুরে

চিরকাল সুখের জ্যোতিঃ প্রতিফলিত—সে জ্যোতিঃ নির্ব্বাণ হইবার নহে।

শ্রীধর অর্থলোভে চিরদিনই পাপ সঞ্চয় করিয়াছেন। প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়াও সৎপথে অর্থব্যয় করিয়া, অর্থের সফলতা লাভ করেন নাই। দরিদ্রের দুঃখে তাঁহার হৃদয় এক দিনের জন্যও কাঁদে নাই, স্বদেশবাসীর দুঃখ দেখিয়া তিনি এক দিনের জন্যও দুঃখ প্রকাশ করেন নাই, কেবল অসৎ উপায়ে কতকগুলা অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং অসৎ উপায়ে খরচ করিয়াছেন; শেষ দশায় তাঁহার এরূপ দুর্গতি হইবে না ত কাহার হইবে? প্রভূত অর্থের অধিকারী হইয়া স্বদেশ সেবায় যাহার অর্থ ব্যয়িত না হয়, পুণ্যময় কার্য্যে অর্থদানে যিনি কৃপণ হন, তাঁহার অর্থলাভে ফল কি? প্রবোধের চরিত্র দেখিয়া এবং শ্রীধরের পূর্ব্ব ব্যবহার স্মরণ করিয়া এখন আর কেহ তাঁহাদের তাদৃশ আনুগত্য স্বীকার করিতে চাহে না, এমন কি প্রজাবর্গও তাঁহার প্রতি ততদূর শ্রদ্ধা ভক্তি করে না। শ্রীধরের আয় ক্রমশঃ কমিতে লাগিল, প্রবোধও এ দিকে খরচের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছে। তবে শ্রীধর যেরূপ বিষয় করিয়াছেন, তাহা সহজে যাইবার নহে। প্রবোধের আচার ব্যবহার দেখিয়া, ভুবনেশ্বর তাহাদের কার্য্য ত্যাগ করিলেন। শ্রীধর এরূপ দেখিয়া শুনিয়া এবং তাঁহার পরিণাম চিন্তা করিয়া ক্রমশঃ নানাপ্রকার রোগে আরও দৃঢ়রূপে জড়িত হইতে লাগিলেন। রোগ ক্রমশঃ ভীষণ ভাব ধারণ করিয়া একদিন মস্তিষ্কের পীড়ায় ধনুষ্টঙ্কার রোগে, তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এতদিনে তিনি সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে

পরিত্রাণ পাইলেন। পরজন্মে যাহা হইবার তাহা হইবে,' এখন ত কিছু দিনের জন্য সর্ব্বাপদের শান্তি হইল!

সাধ্বী পতিরতা কাত্যায়নী, কিন্তু পতি-বিয়োগে জগৎ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। ইহজীবনের সমস্ত সুখ, সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট হইল। পতি-বিয়োগের পর জগতে অবস্থান করা অপেক্ষা—জীবন ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু অপমৃত্যু ত কোন ক্রমেই উচিত নহে। এই জন্য প্রবোধের মুখ চাহিয়া তিনি এক প্রকার জীবন্মৃত হইয়া রহিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চৈতন্যোদয়।

ভগবানের কৃপা কখন কাহার প্রতি কিরূপ ভাবে পতিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে। সেই দয়াল ঠাকুর জগজ্জীবের প্রতি কৃপা প্রদর্শন না করিলে পৃথিবী এতদিন মরুভূমিতে পরিণত হইত, বিশেষতঃ পাপীর প্রতি তাঁহার কৃপা সর্ব্বতোমুখী, পতিতকে উদ্ধার করাই তাঁহার কাজ, পাপীকে তিনি নাকি বড় ভালবাসেন, তাই তাঁহার অপার করুণায় চোর রত্নাকর মুনিশিরোমণি বাল্মিকী—যাঁহার সুমধুর রামায়ণ গুণগানে আজ আপৃথিবী মুখরিত; পাপাত্মা বিল্বমঙ্গলের পাপ-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিবার একমাত্র কর্ত্তাই শ্রীভগবান; মহাপাপী জগাই মাধাই যে মহাপাপ হইতে উদ্ধার হইয়াছিল, পতিতপাবনের অপার করুণা-কণার সাহায্য ব্যতীত আর কিছুতেই নহে। এই জন্যই বলিতে হয় পতিতকে তিনি যতদূর ভালবাসেন, ততদূর আর কাহাকেও নহে। যাহার কেহ নাই, তাহার ভগবান্ আছেন। জগতে পাপীকে ত কেহ দেখিতে পারে না, কেহ তাহাকে আশ্রয় প্রদান করে না, তাই পতিতের আশ্রয়দাতা পতিতপাবন ভিন্ন আর কে আছে? পাপ করিতে করিতে পাপীর যখন চৈতন্য হয়, যখন সে ক্ষণেকের জন্য বুঝিতে পারে—যে কি করিতে আসিয়া কি কাজে মত্ত হইয়াছি, আমি কি করিতেছি, তখন তাহার পূর্ণ জ্ঞানোদয়

হয়, তখন সে নিজের হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখে, তথায় গুরুত্ব বলিয়া কোন পদার্থই নাই; হায়! সময়ে জগতের একটা সামান্য ফুৎকারে আমি কোথায় উড়িয়া যাইব; গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে পুণ্য সঞ্চয় নিতান্ত আবশ্যক, পুণ্য ভিন্ন মানব দেহে গুরুত্ব লাভের আর অন্য উপায় নাই; পাপীর কিছুমাত্র গুরুত্ব নাই, সমস্ত অসার লঘুত্বে পরিপূর্ণ, চৈতন্যোদয়ে পাপী তখন বেশ বুঝিতে পারে, রত্নাকর রত্ন আহরণ করিতে আসিয়া কেবল কাদা ঘাঁটিয়া সময় নষ্ট করিয়াছে; সার বস্তু পায়ে ঠেলিয়া কেবল অসার লইয়া কাল কাটাইয়াছে এবং তখন হইতে সে আপনার গন্তব্য পথ চিনিয়া লইতে আরম্ভ করে।

পিতৃ-বিয়োগের পর হইতে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে প্রবোধচন্দ্রের যে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সকল কার্য্যেরই সীমা নির্দ্ধারিত আছে—সীমা পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়া, আবার সে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে—ইহাই জগতের নিয়ম। প্রবোধ এখন আর তত বাটীর বাহির হয় না! জননীর শোচনীয় অবস্থা, তাঁহার মর্ম্মভেদী ক্রন্দন, হঠাৎ তাহাদের এরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন, প্রবোধচন্দ্রকে প্রকৃতই ভাবান্তর করিয়া দিয়াছিল। সে এখন সর্ব্বদাই চিন্তাকুলিত চিত্ত, সর্ব্বদাই ম্রিয়মান। যদিও অর্থাদি এখনও বেশ আছে, কিছুরই তাদৃশ অসদ্ভাব নাই—তত্রাচ সে ধনে আর মানের লেশ মাত্র নাই। যাহার ধন দেখিয়া যাহার কূট-মন্ত্রণা জাল হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য লোকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দূর হইতে আপ্যায়িত করিত—আজ তাহার হঠাৎ

পথে আর কেহই ফিরিয়া চাহে না—কেহ মুখ তুলিয়া কথা কয় না—কেহ স্বাগত প্রশ্ন করে না—প্রবোধ এই কয় দিনের মধ্যে প্রতিবাসীদিগের এইরূপ আচরণ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছে—জগতের সহিত তুমি যেরূপ ব্যবহার করিবে—জগতের নিকট হইতে তোমার সেইরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করা উচিত। এইরূপ বুঝিতে পারিয়াই, প্রবোধের যেন কিছু কিছু চৈতন্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সে এখন সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া জননীর কাছে কাছে থাকে, প্রাণপণে জননীর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করে। শ্রীধরের মৃত্যুর পরদিন কাত্যায়নী যখন রক্তবর্ণ, অশ্রুপূর্ণ লোচনে প্রবোধের দিকে তাকাইয়া শোক-বিজড়িত গুরু-গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন "প্রবোধ! এইবার সাবধান, এইবার যাবতীয় ভার তোমার উপর ন্যস্ত হইল, তুমি উপযুক্ত পুত্র, নিতান্ত বালক নহ; এতদিন তিনি বর্ত্তমান ছিলেন—তিনি আমার গুরুর গুরু, তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করা বা তাঁহার উপর কথা কহা আমার সাধ্য ছিল না, তাই কোনও কথা বলি নাই। এখন তিনি নাই; এখন আমি আর তোমাকে যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে দিতে বাধ্য নহি। এখন এ সমস্ত সম্পত্তি আমার—মৃত্যু সময়ে তিনি এ সমস্ত বিষয় আমার নামেই লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন—তাহা বোধ হয় তুমি জান। আমি তোমায় সকল বিষয়ে বঞ্চিত করিলেও করিতে পারি। কিন্তু তুমি উপযুক্ত পুত্র তোমাকে ন্যায্য বিষয়ে বঞ্চিত করিতে আমার ইচ্ছা নাই; এখন আর আমার কোনও বিষয়ে আস্থা নাই, স্ত্রীজাতির যাহা সর্ব্বস্ব, তাহা যখন কাল-কবলে

কবলিত হইল, তখন আর কিসের ভরসা। তবে তুমি যদি সাবধান হইয়া চলিতে পার, তাহা হইলে এখনও আমি সংসার পরিচালনে বদ্ধপরিকর হইতে পারি, নতুবা এই আমার শেষ। তুমি সাবধান হইয়া বুঝিয়া চল—তোমার ন্যায় উপযুক্ত পুত্রের প্রতি আমার যেন বিরূপ হইতে না হয়। স্ত্রীজাতি কখনই স্বাধীনা হইতে পারে না। বৃদ্ধ বয়সেও তাহাদিগকে উপযুক্ত পুত্রের অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। এই জন্য বলি, তুমি বজায় থাকিলে, চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারিলে, এখনও সমস্ত বজায় থাকে, চেষ্টা থাকিলে এখনও মানুষ হইতে পারিবে, এবং মান সম্ভ্রম অক্ষুন্ন রাখিতে পারিবে।" প্রবোধ সেই বিষাদ-ময়ী ভীমা-মূর্ত্তির জলদগম্ভীর বচনাবলী শ্রবণ করিয়া মস্তক অবনত করিল। যে বিষধর সর্প সদাই উর্দ্ধফণ; সদাই আশীবিষে সকলকে জর্জ্জরিত করিত; আজ জানি না কোন্ কুহক মন্ত্রে সে শির নত করিল। সেই শোকদগ্ধ জননীর তেজোদৃপ্ত বচন-বহ্নি প্রবোধকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিল। সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ভয়-বিহ্বল চিত্তে, ছল ছল নেত্রে সম্মতি জ্ঞাপনচ্ছলে একবার জননীর মুখের প্রতি চাহিয়া আনত আননে নিরুত্তর হইল। সেইদিন হইতে প্রবোধ কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার মোহ-মদিরা-ঘোর কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাঘব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সে যে মহাভ্রমে পতিত হইয়া বিপথগামী হইতেছিল, এক্ষণ তাহা বুঝিতে পারিয়া সুপথ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। জননীর সেই হৃদয়ভেদী উপদেশ-বাণী এখনও তাহার হৃদয়-তন্ত্রী প্রতিধ্বনিত করিতেছে। প্রবোধ কি সেই উপদেশ, সেই ধর্ম্মময় বচনাবলী এ জীবনে

ভুলিতে পারিবে? তাই তাহার চৈতন্য সঞ্চার হইয়াছে, তাই সে কুপথ হইতে সুপথে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে।

কাত্যায়নী এতদূর গম্ভীর-প্রকৃতি-সম্পন্না ছিলেন যে, এক একদিন শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ব্যাঘ্র-প্রকৃতি-সম্পন্ন পুরুষকেও তাঁহার ভয়ে কাঁপিতে হইত। তাই বলিয়া তিনি যে পতিভক্তিবিহীনা ছিলেন—তাহা নহে। পতি-ভক্তি তাঁহার সাতিশয় প্রগাঢ় ছিল, তিনি সেই পাপাত্মা স্বামীকে প্রত্যক্ষ দেবতার মত ভক্তি করিতেন, প্রত্যহ তাঁহার পাদোদক পান না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। স্বামীকে অগ্রে পান ভোজন না করাইয়া, তিনি পান ভোজন করিতেন না; স্বামী নিদ্রা না যাইলে, তিনি নিদ্রিতা হইতেন না। যেদিন শ্রীধর না বলিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিতেন, কাত্যায়নী সেদিন আহার করিতেন না, নিদ্রা যাইতেন না। কেবল প্রাণ ধারণের জন্য নিত্য-পূজান্তে গৃহদেবতার চরণামৃত পান করিয়া দিন কাটাইতেন এবং শ্রীধর বাটী আসিলে তাঁহাকে ভক্তি-বিজড়িত তীব্র ভাষায় বেশ দুই চারিটী কথা শুনাইয়া তবে ক্ষান্ত হইতেন। ধর্ম্মে অবহেলা করিলে—কাত্যায়নীর নিকট কাহারও অব্যাহতি ছিল না, অধর্ম্মচারীকে তিনি দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। অন্য হইলে তিনি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিতেন, কিন্তু স্বামীর প্রতি—দেবতার প্রতি ত সে ব্যবহার চলিবে না—অসহ্য হইলেও তাহা সহ্য করিতে হইবে। দেবতা কখন পতিত হন না—ভাবিয়া, তিনি ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পাদোদক পান করিতেন। পাড়ার সকলে জমীদার গৃহিণীকে বড়ই মান্য করিত। সকলেই বলিত ধার্ম্মিকা রমণী

কাত্যায়নীর ধর্ম্মবলেই শ্রীধর সমস্ত আপদ বিপদ হইতে মুক্তি-লাভ করিতেছে। নতুবা মহাপাপী শ্রীধর কি কখন জগতে এত উন্নতিলাভ করিতে পারিত? শ্রীধর জীবিতাবস্থায় এমন ধর্ম্ম-পরায়ণা রমণীকে একদিনের জন্যও সুখী করিতে পারেন নাই; ইহাতে তাঁহাকে ভাগ্যহীন ব্যতীত আর কি বলিব? কাত্যায়নী কিন্তু অন্য সুখকে সুখ বলিয়া মানিতেন না—পতি সেবাই রমণী জীবনে সকল সুখের আকর বলিয়া মানিতেন—এই সুখে বঞ্চিত হইলেই, তিনি স্বামীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন।

প্রবোধ যখন ক্রমশঃ স্ববশে আসিতে লাগিল। কাত্যায়নী যখন দেখিলেন—প্রবোধ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছে, তখন প্রবোধকে জমীদারীসংক্রান্ত বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য নিজ ভ্রাতা শ্যামসুন্দর বাবুকে পত্র লিখিয়া তথায় আনয়ন করিলেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী জমীদারী কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী। জ্যেষ্ঠ ভগ্নীর উপকারার্থ তিনি রুদ্রপুরে আসিয়া সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন এবং প্রবোধকে তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। প্রবোধও মাতুল মহাশয়ের অধীনে থাকিয়া একে একে সমস্ত আয়ত্ত করিতে লাগিল বটে; কিন্তু যেন কোন বিষয়েই তাদৃশ লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করিল না—তাহার মনপ্রাণ যেন আরও কোন উচ্চ বস্তু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় মত্ত হইতে চায়, মন যেন এসকল অসার দ্রব্যে তাদৃশ সুখী হইতে চায় না। সে এতদিন মনুষ্যত্ব হারাইয়াছিল—এখন মানুষ হইতে চায়—প্রকৃত সুখের পথ অন্বেষণে তাহার মন বড়ই ব্যগ্র হইয়াছে। তাহার মনোগত ইচ্ছা কিন্তু এখন কেহ ভালরূপ

জানিতে পারিল না। হায়! আমি এতদিন কি করিতে কি করিয়াছি। পাপসঙ্গে পরিভ্রমণ করিয়া কেবল লোকের মন্দ চেষ্টায় এ দুর্লভ মানব-জন্মের অমূল্য সময় হেলায় হারাইয়াছি, নলিনাক্ষের ন্যায় সাধুভক্তের সর্ব্বনাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। নলিনাক্ষ কি যে সে যুবক! নবাবের নিকট সে যে আত্মপরিচয় দিয়াছে, তাহা কি সাধারণ মানুষের ক্ষমতায় হইতে পারে? গুরুদেব যোগানন্দও স্পষ্ট বলিয়াছেন, নলিনাক্ষ কালে একজন মহাপুরুষ হইবে। পরের প্ররোচনায় আমি এতদিন নিরুপমার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম কিন্তু তাহা কি আমার সাধ্য হইতে পারে, দেবী মূর্ত্তিকে কলঙ্কিত করিতে যাইলে ত নিজেকেই মরিতে হইবে। সে যে নলিনাক্ষের অঙ্কলক্ষ্মী হই-বারই উপযুক্ত; দেবভোগ্য বস্তু কি বায়সের উচ্ছিষ্ট হইতে পারে?

ভগবানের বিভূতি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে, এ জগতে তাহার অসাধ্য কি আছে? জাগতিক যাবতীয় দুষ্কর কার্য্য, সে অম্লান-বদনে এবং অবলীলাক্রমে সমাধা করিতে পারে। জমী-দারী-সংক্রান্ত কার্য্যকলাপ শিক্ষা করা ত কোন্ ছার; প্রবোধ সামান্য দিনের মধ্যে মাতুল মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া জমীদারী- সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় আয়ত্ত করিয়া লইল। কাত্যায়নী ভ্রাতার নিকট পুত্রের প্রখর বুদ্ধি-শক্তির বিষয় শুনিয়া এবং পুত্রকে বিষয়-কার্য্যে সম্যকরূপে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে দেখিয়া, হৃদয়ে যারপর নাই আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন।

স্বামী বিয়োগের পর, তিনি যে জীবনভার দুর্ব্বহ মনে করিয়াছিলেন এবং যাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে

অপসৃত হইবার জন্য ক্ষণে ক্ষণে প্রার্থনা করিতেন, এক্ষণে প্রবোধের চরিত্র পরিবর্ত্তনে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে আরও সে ভাব কিছু দিনের জন্য বহন করিতে প্রয়াস পাইলেন। ধর্ম্মপথগামী হইয়া আত্মীয় স্বজনকে বিশেষতঃ পুত্র কন্যাকে ধর্ম্মভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে দেখিলে কে না এ দুঃখভারাক্রান্ত জগৎকে সুখের বলিয়া মনে করে? কে না তাহাতে সুখে বাস করিতে ভালবাসে?—এ জগতে ধর্ম্মই যে সুখের আস্পদ স্বরূপ—ধর্ম্ম ভিন্ন মনে কিছুতেই নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে পারা যায় না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—— *:*:* — —

জ্যোতিষের পীড়া।

সংসারী হইতে হইলে সংসারের সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। নতুবা সন্ন্যাসীর মত ব্যবহার করিলে তোমার এ সংসারে সংসারী হওয়া মহাদায়। তোমার গালে একটী চড় মারিলে, অপর গালটী পাতিয়া দিলে চলিবে না তাহার প্রতিশোধ দেওয়াই তোমার কার্য্য, কিন্তু নলিনাক্ষের ন্যায় ধর্ম্মভীরু সাধকের সে বিষয় প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অসার বিষয়ে মজিয়া কি তিনি মামলা মোকর্দ্দমায় বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারেন? নলিনাক্ষ সাত্বিক ভাবাপন্ন- কেমন করিয়া তাহা আসুরিক ভাবে পরিবর্ত্তিত হইবে? তিনি নির্লিপ্ত ভাবে সংসার করিতে চাহেন। মায়ের সুসন্তান শাক্তভক্ত শ্রীরামপ্রসাদ যে ভাবে সংসারী হইয়াছেন। একদিন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় তাঁহাকে দেখিয়া তিনি কি ভাবের সাধক, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই দিন তাঁহারই মুখে কালী-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অবধি তিনি প্রত্যহ সেই নামে নেত্রনীর ফেলিয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেন। সেই জন্য শক্তির কৃপায় নলিনাক্ষ কথঞ্চিৎ শক্তিমন্ত হইয়া একদিন নবাব-সভায় অসীম শক্তির পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুদেব প্রথমে শক্তির কণা মাত্র হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিয়া অহঙ্কারবশে যে প্রসাদকে

উপহাস করিয়াছিলেন, পরিশেষে প্রসাদের ধর্ম্মবলের নিকট পরাস্ত হইয়া আবার তাঁহারই নিকট কন্যাভাবে ভগবতীর সাধনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন, এবং নলিনাক্ষের নিকট সেই কন্যা-অন্বেষণ গুরুদক্ষিণা চাহিয়াছেন। শিষ্য নলিনাক্ষের অহঙ্কারশূন্য নির্ম্মল হৃদয়ে একদিনেই যে জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়াছিল—তাই তিনি মায়ের নামে কাঁদিয়া আকুল হইয়া থাকেন, তাই তিনি ভগবতীর কৃপা বলে এত শীঘ্র অসাধ্য সাধন করিতে পারিয়াছেন। সেই ধর্ম্মপ্রাণ নলিনাক্ষ কি সামান্য বিষয়ের জন্য বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারেন? কেবল বন্ধুবর জ্যোতিষপ্রসাদ এই সকল ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার বিষয় সম্পত্তির উদ্ধার সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে জ্যোতিষপ্রসাদ নিজের অত্যধিক পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিতে অনুমাত্র ক্রটী করেন নাই। চতুর্থ দিবস মোকর্দ্দমার দিন জ্যোতিষপ্রসাদ আদালতে গিয়া শুনিলেন - প্রবোধচন্দ্র স্ব ইচ্ছায় মোকর্দ্দমা তুলিয়া লইয়াছেন। তিনি আর নলি-নাক্ষের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা করিতে রাজী নহেন।

জ্যোতিষপ্রসাদ হঠাৎ প্রবোধচন্দ্রের এতাদৃশ মতি পরিবর্ত্তন ও উদারতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মোকর্দ্দমা তুলিয়া লইবার কোন বিশিষ্ট কারণও দেখিতে পাইলেন না, তবে প্রবোধচন্দ্র মোকর্দ্দমা চালাইল না কেন? তাহার পক্ষে মোকর্দ্দমাও কিছু মন্দ ভাব ধারণ করে নাই—এখন ত তাহার হারিয়া যাইবার কোন ভাব দেখা যায় নাই, তবে সে মোকর্দ্দমা হঠাৎ তুলিয়া লইল কেন?

যাহা হউক, জ্যোতিষপ্রসাদ আনন্দিত চিত্তে নানা প্রকার

চিন্তা করিতে করিতে বাটী ফিরিলেন এবং বন্ধুকে এই শুভ-সংবাদ দানে সুখী করিলেন। নলিনাক্ষ ভাল-মন্দ কিছুই বুঝিলেন না—তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "ভাই! মহামায়ার মহদিচ্ছাই পূর্ণ হইয়াছে। তিনি তোমার ন্যায় নিঃস্বার্থ পরোপকারী বন্ধুর মুখ রক্ষা করিয়াছেন। এস - আজ আমরা এই আনন্দের দিনে সেই আনন্দময়ীর নামে আত্ম-সমর্পণ করিয়া ধন্য হই। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত ভাই! এ জগতে কি কোন কার্য্য হইতে পারে?" জ্যোতিষপ্রসাদ অবনত মস্তকে সেই মধুর উপদেশ শুনিতে লাগিলেন। এই গুণেই যে জ্যোতিষপ্রসাদ নলিনাক্ষের এত বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই মোকর্দ্দমার পর জ্যোতিষপ্রসাদ শারীরিক পীড়িত হইয়া পড়িলেন। প্রায় এক পক্ষ হইল তাঁহাকে আদালতের গতায়াত বন্ধ করিতে হইল। সুকুমারী অনন্যকর্ম্মা হইয়া প্রাণপণ সেবায় তাঁহাকে আরোগ্য করিলেন। যতদিন পীড়া আরোগ্য না হইল, ততদিন নলিনাক্ষ প্রত্যহই তাঁহার নিকট থাকিতেন।

ওকালতী যদিও জ্যোতিষের ব্যবসায় ছিল, তথাপি দরিদ্রের উপকার করিতে, আবশ্যক হইলে বিনা পারিশ্রমিকে সৎপরামর্শ দিতে জ্যোতিষপ্রসাদ কখন কুণ্ঠিত হইতেন না। পরার্থপরতার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তবে যতটুকু স্বার্থ না রাখিলে চলে না, তিনি তাহার অধিক রাখিতে চাহিতেন না। এরূপ করিয়া তিনি যে টাকা উপার্জ্জন করিতেন, বোধ হয় তাঁহার ন্যায় একজন ব্যবহারজীবী সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও তাহা উপার্জ্জন করিতে পারেন কি না সন্দেহ।

স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি মায়া মমতা তাঁহার, এইরূপ প্রগাঢ় ছিল, এইরূপ স্বার্থত্যাগী ব্যক্তিই দেশের অলঙ্কার। তিনি যথার্থ স্বদেশভক্ত, তাঁহার হৃদয় যথার্থ স্বদেশভাবে পূর্ণ। নতুবা ক্ষণিক উত্তেজনায় বা কাহারও বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া যিনি স্বদেশভক্ত বলিয়া পরিচয় দেন; বক্তৃতা ফুরাইলে ও উত্তেজনার নিবৃত্তি হইলে আর তাঁহার সেরূপ ভাব থাকে না, এরূপ ব্যক্তি স্বদেশভক্ত নহে— স্বদেশদ্রোহী।

জ্যোতিষপ্রসাদ স্বদেশ-ভাবের ভাবুক, তাঁহার হৃদয় স্বদেশ-ভাবে বিভোর; পরোপকার করিতে তিনি কিছু-মাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। বন্ধু নলিনাক্ষের জন্য যে তিনি এরূপ ত্যাগ স্বীকার করিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? নলিনাক্ষের ন্যায় স্বধর্ম্মনিরত, অকৃত্রিম দেবচরিত্র বন্ধু এ জগতে নিতান্ত দুর্লভ।

সংসার-দাবদগ্ধ জ্যোতিষপ্রসাদ অনেক সময় নলিনাক্ষের ধর্ম্ম উপদেশ শ্রবণে আত্মহারা হইতেন, কায়মনে তাহা প্রতিপালন করিয়া ধন্য হইতেন, সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইয়া ক্ষণেকের জন্য শান্তি সুখানুভব করিতেন। এ হেন ধার্ম্মিক বন্ধুর উপকার করিতে পারিলে কাহার হৃদয় না আনন্দে উৎফুল্ল হয়, কে না আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে। অত্যাধিক পরিশ্রমজনিত শিরঃপীড়ায় জ্যোতিষপ্রসাদ যদিও শয্যাগত, তথাপি নলিনাক্ষের জয়লাভে তাঁহার ও সুকুমারীর আনন্দের সীমা নাই। এইবার নলিনাক্ষের সহিত নিরুপমার বিবাহ-কার্য্য সমাধা হইলেই তাঁহাদের আনন্দের পূর্ণতা লাভ হয়, জ্যোতিষ পীড়িত বলিয়াই সে শুভকার্য্যে এত বিলম্ব হইতেছে।

মহামায়া এ শুভ মিলন-সংঘটনের জন্য বড়ই ব্যস্ত, সত্বর যাহাতে এ কার্য্য সমাধা হয়, মহামায়া তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু নলিনাক্ষ তাহাতে স্বীকৃত হইতে পারিতেছেন না। যখন এতদিন গত হইয়াছে, তখন জ্যোতিষ-প্রসাদ নিরাময় হওয়া অবধি এ কার্য্য স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য; বন্ধু শয্যাগত থাকিবেন, আর তিনি বিবাহের আনন্দে মত্ত হইবেন; একজন পীড়ায় কষ্ট পাইবে, আর একজন আনন্দে উৎফুল্ল হইবে—ইহাই কি প্রকৃত বন্ধুত্ব। সমভাব, সমবেদনা অনুভব না করিলে বন্ধুত্ব হয় না। দুইটীতে একটী না হইতে পারিলে প্রকৃত সখ্যতা জন্মায় না। প্রকৃত বন্ধুত্বের ইহাই মহত্ব।

সুদীর্ঘ পক্ষান্তে জ্যোতিষ ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এখন আর তাঁহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হয় না, বাটীর ভিতর এদিক ওদিক পদচারণা করিয়া তিনি অনেকটা সুখানুভব করিতে লাগিলেন। জ্যোতিষপ্রসাদের পীড়ায় মহামায়া ও নিরুপমার উদ্বেগ বড়ই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মহামায়া জ্যোতিষের আরোগ্য কামনায় দেবতার স্থানে কত মানসিক করিয়াছেন। আর নিরুপমার ত কথাই নাই, জ্যোতিষের অসুস্থতা ও সইয়ের কাতরতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইত; গৃহদেবতার নিকট তাঁহাদের কল্যাণার্থ প্রায় প্রহরেক কাল ভজনা করিয়া, তবে জলগ্রহণ করিতেন। এখন জ্যোতিষকে সুস্থ হইতে দেখিয়া তাঁহাদের সাতিশয় আনন্দলাভ হইল। নলিনাক্ষ এতদিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুর সেবায় প্রাণপাত করিতেছিলেন।

আজ দুই দিবস তাঁহাকে একটু সুস্থ হইতে দেখিয়া বলিলেন,—"জ্যোতিষ! আজ তুমি কেমন আছ?"

জ্যোতিষ। ভাই! আমি এখন বেশ সুস্থ আছি। তোমার ন্যায় মহাপ্রাণ বন্ধু যাহার রোগমুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছেন, ভগবান তাহাকে সত্বর নিরাময় করিবেন। ভাই! ধর্ম্মবল যে মহাবল।

নলিনাক্ষ আত্মপ্রশংসা শুনিতে আদৌ ভালবাসিতেন না। অন্য কথার উত্থাপন করিয়া, তিনি বলিলেন—"আজ বহুদিন আশ্রমে যাই নাই এবং গুরুদেবেরও কোনও সংবাদ পাই নাই; যদি বল, তাহা হইলে দুই চারিদিনের জন্য একবার আশ্রমে যাই।"

জ্যোতিষ। এখন তুমি একবার তথায় যাও, তথাকার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া যত শীঘ্র পার চলিয়া আসিও, তোমার জন্য আমরা সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকি। ইহা যেন মনে থাকে।

বহুদিবস নলিনাক্ষ জ্যোতিষের প্রসন্ন বদন নিরীক্ষণ করেন নাই, আজ বিশুষ্ক অধরে হাসির রেখা দেখিয়া তাঁহার মনপ্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। নলিনাক্ষ জ্যোতিষের পিতাকে ঔষধ ব্যবহারের নিয়মাদি সম্যক্ প্রকারে বুঝাইয়া দিয়া, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করতঃ কয়েকদিনের জন্য নদীয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

জ্যোতিষের পিতা আদ্যনাথ বাবু নীলরতনের বন্ধু ছিলেন। মৃত্যুর সময় নীলরতন তাঁহাকে নিজ সংসারে নিঃসহায় কন্যার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। সেই অবধি

তাহাদের এরূপ হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ও অভিভাবক আর কেহই ছিল না; তিনি সামান্য বিষয়েও তাহাদের সহায়তা করিতে ত্রুটী করিতেন না, এই জন্য মহামায়া তাঁহাকে বড়ই মান্য করিতেন।

রূপচাঁদ আজ মাসাবধি হইল, তাহার বৃদ্ধা আত্মীর পীড়ার জন্য দেশে গিয়াছে। বৎসরের শেষে জমীদারের খাজানা চুক্তি করা ও গৃহাদি সংস্কার করা পল্লীগ্রামবাসীর একটী মহৎ কার্য্য। পুরাতন দাসীর মধ্যে এখন শ্যামার মাই গৃহের হর্ত্তাকর্ত্তা, বৃদ্ধ ত্রিলোচন গৃহে থাকিতেন বটে; কিন্তু শ্যামার মা তাঁহাকে গ্রাহ্যই করিত না। ত্রিলোচন একদিন বহির্বাটীতে বসিয়া হিসাব দেখিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, শ্যামার মা একজন অপরিচিত লোকের সহিত চুপে চুপে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিয়া বাটীর কত কি দেখাইতে লাগিল। তাহার পর তাহাকে খিড়কীর দরজা খুলিয়া বাহির করিয়া দিল! ত্রিলোচন শ্যামার মাকে অনেক সময় নানাপ্রকার সন্দেহ করিতেন, আজ তাহার এই ব্যাপার দেখিয়া সন্দেহ আরও বর্দ্ধিত হইল।

শ্যামার মা যখন এই সংসারে প্রথম দাসীত্ব করিতে আসে, তখন তাহার বয়স অতি অল্প ছিল; ভাদ্রের ভরা নদী কূলে কূলে ভরা ছিল, যদিও তাহার একটী কন্যা জন্মিয়াছিল এবং তাহার পর সে বিধবা হইয়া এখানে আশ্রয় লইয়াছে, তথাপি তাহার যৌবনোচিত হাবভাবের কিছু কম হয় নাই। ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোক, পাছে কুলের বাহির হইয়া ইহকাল পরকাল নষ্ট করে, এই জন্য নীলরতনবাবু তাহাকে অন্দরে স্থান দিয়া

রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন। এখন কর্ত্তা মারা গিয়াছেন, তাহাকে দেখিবার আর কেহই নাই, কাজেই সে পূর্ব্ব স্বভাব পাইয়াছে, প্রথমতঃ সে রূপচাঁদকে হস্তগত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল; রূপচাঁদের মত একজন নামজাদা পাইককে হস্তগত করিতে পারিলে, সে সহজে অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে। কিন্তু রূপচাঁদ সে প্রকৃতির লোক নহে; শ্যামার মার প্ররোচনায় সে ভুলিল না, ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হইয়া সে আপন কর্ত্তব্যকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিল না। সেই দিন হইতেই রূপচাঁদের সহিত—শ্যামার মার মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল! রূপচাঁদ কিন্তু একটা স্ত্রীলোকের দুরভিসন্ধি গ্রাহ্য করিল না। রূপচাঁদ জানিত যতদিন সে জীবিত থাকিয়া এ বাটীর তত্ত্বাবধারণ করিবে, ততদিন এ বাটীর ছিদ্রান্বেষণে বা অনিষ্ট সাধনে কেহই কৃতকার্য্য হইবে না।

এখন রূপচাঁদ দেশে গিয়াছে; সময় বুঝিয়া শ্যামার মা তাহার প্রেমাধীনকে মুখুর্য্যে বাটীর গুপ্ত সন্ধান বলিয়া দিবার জন্য আজ মধ্যাহ্নে এ বাটীর মধ্যে আনিয়াছিল, মহামায়া ও নিরুপমা বেড়াইতে গিয়াছেন, শ্যামার মার কার্য্যের উপর দোষারোপ করা অপর দাসীর সাধ্য নাই; কেবল ত্রিলোচন আজ প্রথম দিবস তাহার এই গর্হিত আচরণ দেখিয়া, তাহার প্রতিকার্য্যে কটাক্ষ করিতে লাগিলেন।

অন্যান্য দিনের মত আজও মহামায়া ও নিরুপমা আহারাদির পর সুকুমারী ও জ্যোতিষকে দেখিতে আসিয়াছেন। নিরুপমা সইয়ের সহিত ভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করিল। মহামায়া জ্যোতিষের নিকট বসিয়া নানাপ্রকার কথাবার্ত্তার পর

বলিলেন—"তোমার পিতা বলিতেছেন, আর শুভকার্য্যে বিলম্ব কেন? আগামী মাসের শেষে অকাল পড়িবে, তাহা হইলে আর এ বৎসর বিবাহের দিন নাই, যাহাতে এই মাসেই বিবাহ হয় তাহা করিতে হইবে, ইহাতে তোমার মত কি, জ্যোতিষ?"

জ্যোতিষ। তাহাতে আর ক্ষতি কি, যদি ওমাসে অকাল পড়ে, তাহা হইলে শুভকার্য্য এই মাসেই শেষ করা ভাল। আপনি পুরোহিত মহাশয়ের দ্বারা একটা ভাল দিন স্থির করুন, আমি নলিকে আসিতে পত্র লিখিয়া দিই।

মহামায়া। এ বিষয়ে তাঁহার কোন মতামত জানা হইল না, তিনি বিরক্ত হইবেন না ত?

জ্যোতিষ। সে জন্য আপনার চিন্তা নাই, কথা ত সমস্ত ঠিকই হইয়াছে, কেবল আমার পীড়ার জন্য সে বিবাহ করিতে রাজী হয় নাই। যখন আমি একটু ভাল হইয়াছি, আর দিনও নাই, তখন সে নিশ্চয়ই সম্মত হইবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে দৈবক্রমে পুরো-হিত মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলেন। জ্যোতিষের পীড়ার সংবাদ শুনিয়া, তিনি তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। এই সময় মহামায়া নিরুপমার বিবাহের একটী শুভদিন দেখিতে বলিলেন। পুরোহিত সর্ব্বানন্দ ভট্টাচার্য্য পঞ্জিকা লইয়া আষাঢ়ের শুক্লা চতুর্থীতিথিতে বিবাহের দিন স্থির করিয়া দিলেন। জ্যোতিষ আর কাল বিলম্ব না করিয়া সেই দিনই লোক দ্বারা নলিনাক্ষকে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়া দিলেন। বিবাহের পাকা দিন হইল দেখিয়া সুকুমারী সইকে বলিলেন,

"ভাই!—এইবার বরের ঘরে যাবার দিন হইল, আর কি আমাদের মনে থাকিবে?"

নিরু। সই! বিয়ে হলে কি, সঙ্গীদের ভুলে যেতে হয়?

সুকু। তা নয় ভাই। তবে কি জান, পুরাতন সঙ্গী ছাড়িয়া নূতন সঙ্গী পাইলে, পুরাতন আর ভাল লাগে না। মানুষের স্বভাবই ওই।

নিরু। ভয় নেই সই! আমি যখন ঘর ক'র্ত্তে যাব, তোমাকে না হয় সঙ্গে নিয়ে যাব।

সুকু। ভাই! অমন কথা অনেকেই বলে, কিন্তু কাজের সময় তা হয় না।

এইরূপে দুই সইয়ে নানাপ্রকার রহস্য হইতেছে, এমন সময় মহামায়া ডাকিলেন—"নিরু! বেলা যায়—এস বাটী যাই।"

নিরুপমা পিসীমাতার আহ্বান শুনিয়া সে দিনকার মত সইয়ের নিকট বিদায় লইয়া গৃহে গমন করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

——০ঃ)*(ঃ০——

বিবাহের পরামর্শ।

এখন জমীদার গৃহিণী কাত্যায়নীর সহিত আর মহামায়ার কোন মনোমালিন্য নাই, বেশ সদ্ভাব হইয়াছে। কাত্যায়নী গম্ভীরা প্রকৃতির স্ত্রীলোক, লোকে তাঁহাকে দেখিলে অহঙ্কারের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিত, কিন্তু যে একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে কাত্যায়নীর স্বভাব কিরূপ মধুর। তিনি ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি, কেবল স্বামীর আচার ব্যবহার দেখিয়া তিনি মনমরা হইয়া থাকিতেন; কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতেন না, এই জন্য সচরাচর লোকে বলিত —কাত্যায়নী ধনীর ঘরণী বলিয়া বড় অহঙ্কার করে—কিন্তু যে তাহাকে বুঝিয়াছে, সেই মজিয়াছে। মহামায়া তাহাকে বুঝিয়াছিলেন—তাই বিবাহের পূর্ব্বে একদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে এবং বিবাহ বিষয়ে পরামর্শ করিতে জমীদার বাটী যাত্রা করিবার ইচ্ছা করিলেন।

শ্রীধরের বড় ইচ্ছা ছিল—সত্বর পুত্রের বিবাহ দিবেন, কিন্তু তাঁহার মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল—পূর্ণ হইল না। নিরুপমার ন্যায় কন্যারত্নকে বধূরূপে গৃহে আনিয়া ধন্য হইতে কাহার না ইচ্ছা, কিন্তু মানবের সকল ইচ্ছাই কি পূর্ণ হয়?

স্বামীর ইচ্ছা থাকিলেও—কাত্যায়নী কিন্তু একদিনের জন্যও পুত্রের বিবাহ দিবার কল্পনা করেন নাই। তিনি জানিতেন—

প্রবোধের বর্ত্তমান অবস্থা বড়ই ভয়ানক, এ সময় বিবাহরূপ মহাদায়িত্বপূর্ণ কার্য্য প্রবোধের দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে পারে না; কারণ স্বামীই স্ত্রীজাতির ইহ-পরকালের সহায়, নিজের নষ্টচরিত্র পুত্রের সহিত একটী সংসার-জ্ঞানশূন্যা বালিকার বিবাহ দিয়া তাহাকে আজীবন দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করাইতে, তিনি আদৌ ইচ্ছা করিতেন না। হিন্দুর বিবাহ-বন্ধন বড় কঠিন, একবার ইহাতে আবদ্ধ হইলে আর পরিত্রাণের উপায় নাই, আজীবন এমন কি পরজন্ম পর্য্যন্ত তাহার সুফল বা কুফল ভোগ করিতেই হইবে।

স্ত্রীলোকের যদি স্বামী-সুখ না হইল, হিন্দুরমণী যদি পতির পদতলে বসিয়া ধর্ম্মের বিমল সুখানুভব করিতে না পারিল, তবে তাহার নিকট অন্য পার্থিব সুখ কি সুখ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? নারীজাতি ত অন্য সুখ চাহে না, পতি-সুখে সুখিনী হইলে পতিব্রতা রমণী অরণ্যে বাস করিয়াও স্বর্গসুখানুভব করিতে পারে। তদ্বিনিময়ে স্বর্ণ অট্টালিকায় দুগ্ধফেননিভ শয্যাও তাহার পক্ষে কণ্টকাকীর্ণ, সকল দুঃখের আস্পদ।

স্বামী নষ্টচরিত্র হইলে স্ত্রীকে কিরূপ মর্ম্মযাতনা সহ্য করিতে হয়, কাত্যায়নী তাহা বিশেষরূপে জানিতেন, এই জন্য তিনি কাহাকেও সে যন্ত্রণা ভোগ করাইতে রাজী নহেন। তাঁহার ইচ্ছা—প্রবোধ চরিত্রবান্ হউক, তারপর বিবাহ দিবেন, কারণ তাঁহাদের ন্যায় কৌলিন্যসম্পন্ন, ধনী পুত্রের বিবাহের জন্য কন্যার ত অভাব হইবে না।

একদিন মধ্যাহ্নে একখানি পাল্কী জমীদার বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহামায়া আসিয়াছেন দেখিয়া,

কাত্যায়নী তাঁহাকে হাসিমুখে আদর অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। নিরুপমার বিবাহের সমস্ত ঠিক হইয়াছে ও আগামী আষাঢ় মাসে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে ইত্যাদি সমস্ত কথা বলিয়া, তাঁহার পরামর্শের জন্য মহামায়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

নিরুপমার বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়াছে শুনিয়া, জমীদার গৃহিণী অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন—"মা! বেশ হয়েছে, আমি শুনে বড় সুখী হলুম, মেয়েটী বড়ও হয়েছে।"

মহা। তাত ঠিক, কিন্তু কি ক'র্‌বো মা! ও'র বাপ বেঁচে থাক্‌লে কি আর এত দেরী হ'তো?

কাত্যা। আমাদের কুলীনের ঘর বলেই তাই রক্ষা, অন্য ঘরের হইলে এতদিন কত কথা উঠ্‌তো।

মহা। সে কথা মা একবার ক'রে ব'ল্‌তে।

কাত্যা। মা! তাতে আর হয়েছে কি? বিবাহ ত আর মানুষের হাত নয়—ভবিতব্য; যেখানে হবার—ঠিক সেই পাত্রটী না জুটলে কিছুতেই হইবে না।

মহা। হাঁ মা! সে ত ঠিক। বিবাহ ঈশ্বরাধীন কার্য্য, কিন্তু আমরা সামান্য মানব, ঈশ্বরের উপর আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই বলিয়াই ত আমাদের দিন দিন এত দুর্দ্দশা ও অবনতি হইতেছে।

কাত্যা। আর এই বিয়ের ঠিক সময় হয়েছে, খুব ছোট বেলায় বিবাহ দেওয়া আমার মত নয়। তবে পাত্রটী ভাল দেখিয়া শুনিয়া দিবেন। আহা! ওর বাপ মা নেই, এখন আপনারই সমস্ত ভার।

মহা। হাঁ মা! ওর বাবা একটী ভাল পাত্র ঠিক করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, আমি জানিতাম না; এক্ষণে গুরুদেবের পত্রে সমস্ত জানিতে পারিলাম। পাত্রটী জানা ঘর, বেশ লেখাপড়া জানে, চরিত্রও খুব ভাল।

কাত্যা। মা! সুখ দুঃখ মেয়ের বরাত। বিষয় আশয় যত থাক আর না থাক, পাত্রটীর চরিত্র আর শিক্ষিত দেখে দিলেই মেয়ের সুখ হবে। তারপর দেনাপাওনার কিরূপ স্থির হইল?

মহা। মা! নিরুর মায়ের যাহা আছে এবং দাদা তাহার বিয়ের জন্য যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, সে সমস্তই দিব। আমার নিজের যাহা কিছু আছে, যতদিন বেঁচে থাকিব— আমার কাছে থাকিবে, তারপর সে সবও ওদের দিয়ে যাব, আমি আর কি ক'র্ব্বো মা?

কাত্যা। আপনার দেশের সম্পত্তি?

মহা। পাছে দেবর কিছু মনে করেন, এই জন্য দেশের সম্পত্তি সমস্ত, তাঁহার পুত্রের নামে উইল করিয়া দিয়াছি।

কাত্যা। আপনার দেবর কি এখন দেশেই থাকেন, আর কি কোন কাজকর্ম্ম করেন না?

মহা। না মা! তোমাদের জমিদারীর কাজ ছাড়িয়া এখন ঘরেই থাকেন। আর এদেশ ওদেশ করা কেন, একটী ছেলে, যাহা আছে রাখিয়া খাইলে এক রকম চ'লে যাবে।

কাত্যা। আর বৃদ্ধ বয়সে একটু বিশ্রাম ও ঈশ্বরের নাম জপ করাও আবশ্যক।

মহা। মা! তুমি ত জান, আমাদের দেখিবার ও শুনিবার লোক নাই। তোমারই উপর আমাদের পূর্ণ ভরসা। তোমাকে যাইয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

"মা! তাহাতে কোন আপত্তি নাই, তবে আমি বোধ হয় শীঘ্রই প্রবোধকে লইয়া ৺কাশীধামে গুরুদর্শনে যাইব। প্রবোধ মন্ত্র-গ্রহণের জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়েছে, এইবার যদি প্রবোধের একটু সুমতি হয়, তবেই আমার ঘর-সংসার, তা না হইলে আর কিসের জন্য এ যন্ত্রণা ভোগ!" এই বলিয়া কাত্যায়নী ছল ছল নেত্রে অধোবদন হইলেন।

মহামায়া অনেক বুঝাইলেন—"মা! তোমার একা প্রবোধ এক সহস্র হউক, এবার তোমার প্রবোধ বুঝিতে পারিয়াছে। আর সে কোন প্রকার অন্যায় কর্ম্ম করিবে না। যখন তাহার ধর্ম্মে মতি হ'য়েছে, তখন আর ভাবনা নেই; তোমার মন ভাল, মা তোমার মন্দ হবে না।"

মহামায়া কাত্যায়নীর অপেক্ষা বয়সে বড় এবং সংসারধর্ম্মে সুদক্ষা। আনুপূর্ব্বিক তাঁহার ধর্ম্মময় জীবন-কাহিনী শুনিয়া বড়ই সুখী হইলেন এবং তাঁহার পদধূলী গ্রহণ করিলেন। মহামায়া বিদায় হইবার সময় কাত্যায়নীকে বিবাহের দিন যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

নিজে ভাল হইলে তাহার সমস্তই ভাল হয়, প্রবোধ এতদিন পিতার অপরিমিত স্নেহে অধঃপাতে যাইতেছিল; পিতার অনুকরণ করিয়া সে চরিত্র হারাইয়াছিল। এখন পিতা নাই; মাতার একদিনকার সেই ভীষণ ভাব, ধর্ম্মের

সেই জ্বলন্ত উৎস দেখিয়া প্রবোধ বুঝিতে পারিয়াছে, আর মাতার মনে কষ্ট দেওয়া হইবে না। এখন তাঁহার কথাই শিরোধার্য্য। প্রবোধ এখন ধর্ম্মের আহ্বান শুনিতে পাই-য়াছে বলিয়াই, কুপথ হইতে সুপথে আসিলেও আসিতে পারে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—০ঃ)*)ঃ০—

এই কি সেই।

সংসারে পিতামাতার জীবদ্দশায় পুত্রের কোন প্রকার কষ্ট থাকে না! পুত্রকে সুখে রাখিয়া যাবতীয় দুঃখ কষ্ট পিতামাতাই সহ্য করিয়া থাকেন। বাৎসল্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি জনক জননীর তুল্য হিতকারী বন্ধু এ জগতে পুত্রের আর কেহ নাই। পর্ব্বতের অন্তরালে থাকিয়া তুমি সুখে কালাতিপাত কর, সংসারের সমস্ত ঝঞ্ঝা, তাহার ঘাত প্রতিঘাত পাষাণ গাত্রেই অনবরত লাগিয়া তাহাকেই ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করিবে, তুমি অন্তরালে আছ—তোমার ভয় কিসের! পিতামাতার এরূপ অকৃত্রিম স্নেহ না হইলে কি নিঃসহায় বাল্যকালে কেহ জীবন লাভ করিতে পারিত? পুত্রকে সুখে রাখিব বলিয়া—তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি উদাস থাকা—কোন পিতামাতারই উচিত নহে, পুত্রকন্যা আদরের ধন বলিয়া তাহাদিগকে অনবরত আদর দেওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি অবনতি সম্পূর্ণরূপে পিতামাতার উপর নির্ভর করে, তাঁহারা সে বিষয়ে দৃষ্টিহীন হইলে পুত্রকন্যার পরিণাম ভয়াবহ হইবেই, হইবে।

কাত্যায়নী যদিও পুত্র প্রতিপালনে স্থির দৃষ্টি রাখিতেন; কিন্তু পিতার অপরিমিত স্নেহই প্রবোধের কালস্বরূপ হইল। অসীম ধনের অধীশ্বর শ্রীধরের জন্যই যে প্রবোধের চরিত্র

কলুষিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। সে যখন যাহা আকাঙ্ক্ষা করিত—ভাল হউক, মন্দ হউক, পিতার দ্বারা তাহা তৎক্ষণাৎ পূরণ হইত বলিয়া—প্রবোধ জননীর নিকট বড় যাইত না, তাঁহার অনুরোধও তত মানিত না। পুত্রও বুঝিত—এমনি দিনই বুঝি যাইবে. তাই সে ক্রমশঃ দুষ্প্রবৃত্তিতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছিল, অন্যান্য গুরুজনবর্গের সদুপদেশ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিত না। পিতার জীবিতাবস্থায় প্রবোধ বড়ই দাম্ভিক ও অধীর প্রকৃতিসম্পন্ন ছিল। এখন পিতা নাই, সে দিনও চলিয়া গিয়াছে, জননীর মুখে একদিনকার শোকপূর্ণ তীব্র তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রবোধের জীবনস্রোত বিভিন্ন গতি ধারণ করিয়াছে। এতদিন সে কি করিয়া আসিয়াছে, আর এখন তাহাকে কি করিতে হইবে—প্রবোধ বুঝিতে পারিয়াছে। অল্প বয়সে পিতৃহীন হইলাম, সেই করুণাময় জনকের ত কিছুই করিতে পারিলাম না, যৌবনমদে মত্ত হইয়া একদিনের জন্যও তাঁহার তিলমাত্র সেবা করিতে পারি নাই। এখন কি করিলে আরাধ্য দেবী জননীর সন্তোষ সাধন করিতে পারি, এইরূপ চিন্তা করিয়াই প্রবোধ আপন চরিত্র সংশোধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। পাছে তাহার সঙ্গীগণের সহিত মিশিয়া পুনরায় পাপপঙ্কে ডুবিতে হয়, এই জন্য সে এখন আর বড় একটা বাটীর বাহির হয় না, যদি একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া অনেক সন্তর্পণে সে কার্য্য সমাধা করে। প্রবোধের হৃদয়াকাশ হইতে এখন মোহমেঘ বিদূরিত হইয়া বিমল-চৈতন্য-চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। সে জননীর উপদেশে মাতুল মহাশয়ের সহিত

যোগদান করিয়া সাংসারিক আচার-ব্যবহারে, বিনয়-নম্রতা শিক্ষা করিতে লাগিল।

পাষণ্ডের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির উদ্রেক সত্বর হইয়া থাকে। পাষাণে মূর্ত্তি অঙ্কিত হইলে তাহা যেমন সহজে নষ্ট করা যায় না, কূটতর্কহীন সরল বিশ্বাসে পাষণ্ডের পাষাণ হৃদয়ে যে দাগ একবার পতিত হয়—তাহা আর সহজে নষ্ট হয় না। ভক্তি-ভাবের উদয় হইলে হৃদয়ও কোমল হইয়া থাকে। প্রবোধের জ্ঞানশশীর আবির্ভাব হইল—প্রগাঢ় মেঘ অপসারিত হইয়াছে, সহজে আর অন্ধকারে আবৃত হইবার আশঙ্কা নাই। গুরুমন্ত্র না হইলে জীবের উদ্ধারের উপায় নাই। তাই প্রবোধ এখন মন্ত্র গ্রহণের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছে। পুত্রের সদিচ্ছা পূরণের জন্য কাত্যায়নীও বড়ই ব্যগ্র হইয়াছেন; কিন্তু বৎসরের শেষ, এই সময় জমীদারী সংক্রান্ত খাজনা পত্র আদায়ের সময়, এখন টাকা কড়ি আদায় করিয়া লাটবন্দি করিতে পারিলে, তবে জমিদারী রক্ষা হইবে, কাজেই পুত্রের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে কিছু বিলম্ব হইতেছে।

৺বারাণসী ধামে তাহাদের যে মহল আছে, তথাকার নায়েব মহাশয় আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া কাত্যায়নীর নিকট যোগানন্দ ব্রহ্মচারীর নাম করিয়াছেন। সে সময় যোগানন্দের মত শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ আর কেহ ছিল না। তিনি বৎসর বৎসর শুভ বৈশাখ মাসে সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে বা অন্য কোন তীর্থ হইতে ৺কাশীধামে আসিয়া শ্রীধরের মহলে বা নিজ আশ্রমে বাস করিতেন। মন্ত্র প্রদান বিষয়ে তাঁহাকে রাজী করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যোগানন্দ

যদিও শ্রীধরের কুলগুরু—তথাপি তিনিও বিরূপ। যাহাই হউক প্রবোধের যদি অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এরূপ সদ্‌গুরু লাভ হইবে। এখন একবার তাঁহার চরণ দর্শন করিতে পারিলে জীবন সার্থক হয়। এই সুযোগে মাতা পুত্রে একবার তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইবেন, এইরূপ ইচ্ছা—তাহার পর অদৃষ্টে যদি শুভফল থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার ন্যায় যোগী পুরুষের কৃপা লাভে বঞ্চিত হইবেন না। এইরূপ মনে করিয়া তিনি শুভবৈশাখ মাসের প্রথমেই পুত্রের সহিত শুভযাত্রা করিবেন, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া নায়েব মহাশয়কে বিদায় দিয়াছিলেন।

প্রবোধ এখন যোগানন্দের আশায় আশান্বিত। জমীদারী সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম সত্বর সমাধা করিতে লাগিলেন। মাতুল মহাশয়ও ভাগিনেয়ের এই শুভ উদ্দেশ্যে প্রাণপণে সাহায্য করিতে লাগিলেন। প্রবোধ এখন মাতুলকে সাতিশয় মান্য করে, কদাচ তাঁহার কথার অবাধ্য হয় না। বৈশাখমাস কবে শেষ হইয়া গিয়াছে। আর অপেক্ষা করা বিধেয় নহে। অদ্য মাতুল মহাশয় বাকী খাজনা সকল আদায় করিতে স্থানান্তরে গিয়াছেন। প্রবোধ একাকী সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া আহারাদির পর অধিক রাত্রে নিজকক্ষে শয়ন করিতে গমন করিলেন।

মধ্য রাত্রি, চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল অসংখ্য তারকারাজি সমভিব্যাহারে চন্দ্রদেব গগনে রাজত্ব বিস্তার করিয়াছেন। চকোর চকোরী আনন্দে মাতোয়ারা, শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে; স্বীয় ইচ্ছামত সুধাপান করিয়া

ধন্য হইতেছে। শান্ত বসন্ত বাতাস ধীর ভাবে প্রবাহিত হইয়া প্রকৃতির ক্রোড়ে মিশিয়া যাইতেছে ও কচিৎ গবাক্ষ দিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বালকের ন্যায় এটা-ওটা-সেটা নাড়িয়া আবার পলায়ন করিতেছে। প্রবোধ শয্যায় শয়ন করিয়া প্রথমেই তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিল। বাতাসে গৃহে দোদুল্যমান ঝাড়ের কলমগুলি দুই একবার "ঠন্ ঠন্" করিয়া নড়িয়া উঠিল; সেই সামান্য শব্দেই প্রবোধের তন্দ্রাপনোদিত হইল। প্রবোধের এখন আহার নিদ্রায় সুখ নাই। কবে কাশীধামে যাইবেন; কবে যোগানন্দের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন; এখন কেবল এই চিন্তাতেই প্রবোধ সদা-সর্ব্বদা বিভোর থাকেন। সময়ে সময়ে মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন—"হে দেব! যোগানন্দ যেন অধমকে শ্রীচরণে স্থান দিয়া ধন্য করেন।" নিদ্রাভঙ্গের পর আবার সেই চিন্তা! এখন যে সুবিমল চন্দ্রকরোদ্ভাসিত স্নিগ্ধ মলয় সমীরণ বাতায়নপথ প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত গৃহ সুধাময় করিয়াছে, সে দিকে যুবকের দৃষ্টি নাই। তাহার মানস পটে যে চিন্তার উদয় হইয়াছে, হৃদয়ে যে ভাব সমুদিত, পার্থিব কোন বিষয় কি তাহার নিকট তুলনা হইতে পারে? প্রবোধ! ধন্য হইতে আর বিলম্ব নাই—সাবধান পার্থিব চিন্তায় অপার্থিব ধন হারাইও না। বোধ মনের আনন্দে গৃহ মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় দুইজন যমদূতাকৃতি পুরুষমূর্ত্তি প্রবোধের প্রতি রক্তিমচক্ষে কটাক্ষ করিয়া একজন অপরকে বলিতেছে; "এই কি সেই?"

অপর বলিল—"সে বিষয়ে আর সন্দেহ আছে?"

কথা শুনিয়া সেই যমদূতাকৃতি ব্যক্তি ডাকিল;—"প্রবোধ!"

সহসা চমকিত হইয়া প্রবোধ তৎক্ষণাৎ গবাক্ষ নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"কে তুমি?"

আগন্তুক। আমি যে হই না কেন, প্রতি বৎসরের ন্যায় দল রক্ষার্থ এই সময় কিছু টাকার আবশ্যক—টাকা দিতেই হইবে।

প্রবোধ। কিছু বাধ্যবাধকতা আছে কি?

আগন্তুক। নিশ্চয়!

প্রবোধ। অসদ্বিষয়ে আর আমি টাকার অপব্যয় করিব না।

আগন্তুক। অনেকবার বলিয়াছি, কোন ফল হয় নাই; কিন্তু এখন না দিলে বিপদের সম্ভাবনা।

প্রবোধ। কা'র, তোমাদের না আমার?

আগন্তুক। তোমার।

প্রবোধ। বিষয় আর আমার হাতে নাই; মার উপর সমস্ত ভার।

আগন্তুক। সে সব আমরা জানি না, অনেকবার নৈরাশ হইয়াও পুনরায় আজ আসিয়াছি, না দিলে বিপদে পড়িবে।

প্রবোধ বহির্বাটীর দ্বিতলের উপর শয়ন করিয়াছিলেন, পশ্চাৎভাগে অবচ্ছায়া সম্পন্ন বাগানের দিকে কেই বা দেখিতে ও শুনিতে পাইবে? আর রজনীও অধিক হইয়াছে এ সময় গোলমাল করিলে সুষুপ্ত ব্যক্তিগণের নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে—

এই জন্য কোন প্রকার চীৎকার না করিয়া রোষ কষায়িত-লোচনে "ক্ষতি নাই" বলিয়া প্রবোধ তথা হইতে অন্য কক্ষে চলিয়া গেলেন।

"আচ্ছা থাক" বলিয়া যমদূতাকৃতি মনুষ্যদ্বয় প্রস্থান করিল।

এই ঘটনার পর প্রবোধের আর সে রজনী নিদ্রা হইল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শুভ কার্য্যে অশুভ।

আজ নিরুপমার শুভ-বিবাহ। এতদিন পরে ভাগ্য-দেবতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ফুল ফুটিল, ইপ্সিত বস্তু পাইবেন বলিয়া নিরুপমা ও নলিনাক্ষ আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। বহুদিন পরে নদী আজ সাগরে মিশিবে, তাই এত স্ফীত - আনন্দে উৎফুল্ল। হিন্দুর বিবাহে পবিত্র আমোদ বড়ই ধর্ম্মময়। দুইটী অজানা, অচেনা প্রাণকে আজীবনের এমন কি পরজীবনের জন্য দৃঢ়তররূপে একতা সূত্রে আবদ্ধ করিতে কেবল হিন্দুর বিবাহ সূত্রই পারে। অন্য জাতির সূত্র তত দৃঢ় নয়, ধর্ম্মের সংমিশ্রণে তত কঠিন নয়—তাই ক্ষণভঙ্গুর। বিবাহ তাহাদের জীবন মরণের সম্বন্ধ নয় বলিয়া এত শীঘ্র ছিঁড়িয়া যায়। হিন্দুর তাহা নয় বলিয়াই ইহা সকলের আদর্শ, ইহা ছিন্ন করিতে প্রাণ সংশয় হয়। আজ নিরুপমা ও নলিনাক্ষের এ বিবাহে সকলেই আনন্দিত, সকলেই বলিতেছে—আহা! মুখুয্যে মহাশয়ের কন্যা সৎপাত্রে পড়িয়া সুখী হউক।

মহামায়া আজ দুইদিন প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া পীড়িত হইয়াছেন, তাঁহার উঠিবার ক্ষমতা নাই, কাজেই জ্যোতিষের পিতা ও ভুবনেশ্বর ঠাকুরের উপর সমস্ত ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তজ্জন্য জ্যোতিষের পিতা আজ দুইদিন নীলরতনের বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছেন। তিন চারিখানি গ্রাম নিমন্ত্রণ হইয়াছে,

ব্যাপার গুরুতর—তার পর বরযাত্রী আছে। নলিনাক্ষ খুড়ী মাতার সহিত জ্যোতিষের বাটী আসিয়াছেন; এই স্থান হইতেই তাঁহার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। জ্যোতিষ রুগ্ন হইলেও আজ তাঁহাকে বন্ধুর বিবাহে কিছু পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, এজন্য বৈকাল হইতে তাঁহারও শরীর ভাল নয়, তথাপি বর বিদায়ের প্রতীক্ষায় আছেন, বর যাত্রা করিলেই তিনি শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম লাভ করিবেন। বর সহ বিবাহ ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া আজ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এই শুভদিনে চারিদিক আনন্দে মুখরিত হইত, যদি মহামায়া ও জ্যোতিষ সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া এই আনন্দে যোগদান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এ আনন্দের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত হইত।

আষাঢ়ের বেলা পড়িয়া আসিল। সূর্য্যদেব সমস্তদিন প্রখর রূপেই ধরাকে উত্তাপ প্রদান করিয়া পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িলেন। গোধূলি লগ্নেই বিবাহ, কাজেই বারবেলা পড়িবার ভয়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বর আসিয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাঁকা পার হওয়াই ভাল। কারণ কালমাহাত্ম্যে সেদিন সেই সময় হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও বায়ু প্রবল হইয়াছিল, রজনীযোগে যে দুর্য্যোগ হইবে, ইহার দ্বারা তাহা বেশ প্রতীয়মান হইয়াছিল। জ্যোতিষের বাটী ও নিরুপমার বাটী আধক্রোশ মাত্র ব্যবধান, তাহার মধ্যে কেবল বাঁকা নদী প্রবাহিত। দেখিতে দেখিতে শুভ গোধূলী উপস্থিত—বর বিবাহ স্থলে নীত হইলেন। আজ বিবাহ শীঘ্র সম্পন্ন হইবে জানিয়া নিমন্ত্রিতগণ সকলেই আসিয়া জুটিয়াছেন। কেবল জমীদার গৃহিণী কাত্যায়নী আসিতে পারেন নাই। কিছুদিন

হইল কাত্যায়নী পুত্রসহ কাশী যাত্রা করিয়াছেন। কাত্যায়নী আসিলেন না বলিয়া মহামায়া একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, কিন্তু কি করিবেন—তিনি যখন এখানে নাই, তখন আর কি হইবে। নীলরতন যেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার কন্যার বিবাহে সেইরূপ সাত্বিক ভাবেই ব্যয় বাহুল্য হইয়াছে। বাহ্যাড়ম্বরে নীলরতন বড়ই বিরক্ত ছিলেন—তাঁহার কন্যার বিবাহে যাহা ব্যয় হইল, দীয়তাং ভুজ্যাং এবং কাঙ্গালী বিদায় ইত্যাদির সদ্ব্যয়েই তাহা পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ক্রমে গোধূলী লগ্নে বিবাহ কার্য্য আরম্ভ হইল।

এ বিবাহের আর বর্ণনার প্রয়োজন নাই—কারণ এ বিবাহ বহুদিন পূর্ব্বেই সম্পাদিত হইয়াছে, বাকী ছিল একটী সামাজিক ক্রিয়া মাত্র, তাহা আজ সম্পন্ন হইয়া গেল। মহামায়া বহু কষ্টে আসিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেন বটে; কিন্তু তিনি বহুক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। সন্ধ্যার পর শীতল বায়ু বহিতে লাগিল, কাজেই সকলে তাঁহাকে গৃহের ভিতর আবদ্ধ থাকিতে বলিলেন। আর যখন তাঁহার ভ্রাতা ও আশুনাথ বাবু রহিয়াছেন, তখন আর ভাবনা কিসের? রমণী মহলে রহিয়াছেন, তাঁহার ভ্রাতৃজায়া ও সুকুমারী; তাহার উপর দাসদাসীও আছে। কেবল রূপচাঁদ এখানে নাই, এজন্য তাহাকে দেশে পত্র দেওয়া হইয়াছে। যে নিরুপমাকে মানুষ করিয়াছে—সে নাই, মহামায়া এইজন্য কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। বিধির বিধানে পরিণয় কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল। নলিনাক্ষ বিবাহের পর সেই রাত্রে একবার জ্যোতিষকে দেখিতে গমন করিলেন। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া জ্যোতিষ পীড়িত হইয়া

গৃহেই ছিলেন। রাত্রি যত বেশী হইবে দুর্য্যোগ ততই বাড়িবে, এই জন্য নলিনাক্ষ বড়ই উদ্বিগ্ন ছিলেন বলিয়া একবার দেখিতে গেলেন—দূর ত বেশী নয়! তারপর নিমন্ত্রিতগণের ও অনিমন্ত্রিত আগন্তুকগণের ভোজন ব্যাপার আরম্ভ হইল, স্থানাভাব নাই, ৺নীলরতনের সুবৃহৎ অট্টালিকা আজ আনন্দ-মুখরিত। নীলরতন! তোমার আদরে পালিতা, স্নেহনীর-মাখা বংশলতিকা আজ তমালে বিজড়িত হইল, দুইটী চির-উৎসুক-হৃদয় আজ এক হইল—তোমার অভীপ্সিত পাত্রেই সমর্পিত হইয়া আজ দুইটী বিভিন্ন স্রোত একত্রে মিলিত হইল! স্বর্গ হইতে তুমি তোমার চির আদরের জামাতা দুহিতার উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর!

যতই বড় লোক হওনা কেন, কোন কাজ কর্ম্মে একটু বিধি বিপর্য্যয় হইলে বিপদাপন্ন হইতেই হয়, ইহার উপর ত আর মানুষের হাত নাই। যত রাত্রি হইতে লাগিল, প্রকৃতির ভীষণতাও তত বাড়ীতে লাগিল।—ঘোর ঝঞ্ঝা বায়ুসহ বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। জনতা তখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। বাগানের পার্শ্বের একটী নিভৃত কক্ষে মহামায়া শায়িতা, সময়ে সময়ে নিরুপমা তাঁহার সেবা করিতেছেন। শ্যামার মা আজ বড়ই ব্যস্ত, তাহাকে দুইদিক দেখিতে হইতেছে, প্রতিবাসী রমণীগণের ভোজন আরম্ভ হইয়াছে। এইজন্য সুকুমারী, মনোরমা ও নিরুপমা বড়ই ব্যস্ত, মহামায়ার কক্ষে কেবল শ্যামার মা বসিয়া কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে, আর এক একবার রোগিনীর তত্ত্বাবধারণ করিতেছে, মহামায়া অচৈতন্য—জ্বর প্রবল হইয়াছে।

এ দিকে মুষলধারে বৃষ্টি, ক্ষণমাত্র বিরাম নাই। চঞ্চলা চপলার অট্টহাস্যে সময়ে সময়ে অন্ধকারের গভীরতা দূর হইতেছে, বিপন্ন পথিক এই অবসরে অপরিচিত পন্থা নিরীক্ষণ করিয়া লইতেছে। মেঘের কঠোর শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে, প্রকৃতি আজ যেন প্রলয়কালীন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিক গ্রাস করিতে উদ্যত। এ হেন সময়ে উদ্যানের পশ্চাদ্দিক হইতে ভয়ানক শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। মানবের কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সকলেই মনে করিল, এই ভীষণ দুর্য্যোগে বিবাহ বাটীতে ডাকাত পড়িয়াছে, সকলেই ভোজন ব্যাপার পরিসমাপ্ত করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল। আহারের জন্য ত আর প্রাণের মায়া ছাড়িতে পারা যায় না?

নিরুপমা আর কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া বিপুল সাহসে মহামায়ার গৃহাভিমুখে ছুটিলেন, তাড়াতাড়ি গৃহ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—গৃহে আলো নাই, শ্যামার মাকে ডাকিলেন—সাড়া পাইলেন না, গৃহের মধ্যে যেন কাহার "গোয়ানী" শব্দ শুনিতে পাইলেন। নিরুপমা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সত্বর আলোক লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। মহামায়া খাটের নীচে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন, তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে তীরবেগে রুধির নির্গত হইতেছে, বক্ষে একখানি ছোরা বিদ্ধ রহিয়াছে। গৃহ হইতে একটী লোহার সিন্দুক অপহৃত হইয়াছে। নিরুপমা চীৎকার করিতে যাইবেন এমন সময়ে একজন ভীমাকৃতি পুরুষ আসিয়া তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিল এবং নাসিকার সন্নিকটে একটী উগ্রগন্ধ

বিশিষ্ট শিশি ধরিবামাত্র নিরুপমা হত-চেতন হইয়া লুটিয়া পড়িলেন। তিন চারি জন দস্যু ধরাধরি করিয়া সেইরূপ অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া যেমন বাগানের বাহির হইবে, কোথা হইতে কয়েক জন ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী আসিয়া তাহাদের আক্রমণ করিল। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া ডাকাতগণ অচৈতন্য অবস্থায় নিরুপমাকে ফেলিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। ইত্যবসরে শ্যামার মা কোথায় ছিল, বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে বাগানের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া যথায় মহামায়া রক্তাক্ত কলেবরে পড়িয়াছিল, তথায় আসিয়া কৃত্রিম স্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"ওগো তোমরা কে কোথায় আছ, দৌড়িয়া এস, মাঠাকুরাণীকে খুন করিয়া ডাকাতেরা সর্ব্বস্ব লইয়া প্রস্থান করিল।" এই কথা শুনিয়া আত্মনাথ বাবু, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি সকলেই দৌড়িয়া উপরের গৃহে গিয়া মহামায়ার শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিলেন। মহামায়ার ন্যায় ধার্ম্মিকা রমণীর এতাদৃশ ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়া সকলেই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলেন। আত্মনাথ বাবু তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনিলেন। ডাক্তারকে ডাকিতে হইল না, তিনি সে দিন তথায় উপস্থিত ছিলেন। আত্মীয় স্বজন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—এখনও মৃত্যু হয় নাই,—তবে দুর্ব্বলের উপর অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইয়া মহামায়া অচৈতন্য হইয়াছেন। ডাক্তার খুব বিচক্ষণ, সত্বর ঔষধ দ্বারা ক্ষত স্থানের রক্ত বন্ধ করিয়া দিলেন, নাড়ী আসিল বটে—কিন্তু সে দিন চৈতন্য হইল না। ডাক্তার বলিলেন,—"এখন বাঁচিবার আশা হইয়াছে।"

তখন রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত, পূর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃতি কিঞ্চিৎ পরিমাণে সাম্যভাব ধারণ করিয়াছে, ঝড় বৃষ্টির প্রকোপ কিছু কমিয়াছে। ক্রমশঃ এই দুঃসংবাদ চারিদিকে প্রচার হইল। নলিনাক্ষ এই ব্যাপার শুনিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিলেন। তিনি যেমন বাঁকা পার হইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইবেন অমনি "গুড়ুম" করিয়া একটী ভীষণ বন্দুকের গুলি তাঁহার মস্তকের নিকট দিয়া চলিয়া গেল; লক্ষ ব্যর্থ হইয়াছে, দস্যুগণ নলিনাক্ষকেও শমন সদনের অতিথি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আয়ু থাকিলে কাহার সাধ্য বিনাশ করে। নলিনাক্ষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন, অথবা নলিনাক্ষের অপমৃত্যু সংঘটন করিতে পারে, এমন সাধ্য কার আছে? তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া মহামায়ার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সেই শোচনীয় অবস্থা সন্দর্শনে কাঁদিয়া ফেলি-লেন। তারপর নিরুপমার খোঁজ পড়িল, এ ঘর, সে ঘর, গৃহ প্রাঙ্গন, উদ্যান বাটি ইত্যাদি তন্নতন্ন করিয়া দেখা হইল, কোথাও তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। নলিনাক্ষ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, নিরুপমার পরিণাম চিন্তা করিয়া তিনি প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। আদ্যনাথ বাবু ও ভুবনেশ্বর বাবু বলিলেন,—"আর কালবিলম্ব করা বিধেয় নহে, কোত-য়ালীতে সংবাদ প্রেরণ করা আশু কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড ও ডাকাতির নায়ক যে শ্রীধরের পুত্র পাষণ্ড প্রবোধ তাহা অনেকেই সন্দেহ করিল। কেহ কেহ বলিল— ইহাতে আর সন্দেহ কি? যখন প্রবোধের সহিত নিরুপমার সম্বন্ধ হইয়াছিল, তখন ইহা নিশ্চয়ই প্রবোধ করিয়াছে।

মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়ায়—সে এইরূপ প্রতিশোধ লইয়াছে!

নলিনাক্ষের কিন্তু সে কথায় বিশ্বাস হইল না। তবে সকলে যখন বলিতে লাগিল, তখন তিনি আর কি করিবেন। তিনি ত সংসারের রীতিনীতি ভাল জানেন না। কোতওয়ালীতে সংবাদ দিতে লোক পাঠান হইল, এমন সময় রূপচাঁদ কয়েক জন সঙ্গীসহ অচৈতন্য-নিরুপমাকে কাঁধে করিয়া উপস্থিত হইল এবং উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। নিরুপমার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সকলে কাঁদিয়া আকুল।

ডাক্তার নরহরি বাবু তৎক্ষণাৎ ঔষধের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সামান্য চৈতন্য হইল, কিন্তু সমস্ত দিবস উপবাস ও অতিরিক্ত বৃষ্টিতে ভিজিয়া বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। ডাক্তার তাঁহাকে ও মহামায়াকে অদ্যকার মত শয্যার আশ্রয় গ্রহণের ব্যবস্থা করিলেন। ভুবনেশ্বর গৃহিণী, সুকুমারী ও ভুবনেশ্বরের কন্যা সৌদামিনী তাঁহাদের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

কোন একটী বীভৎস কাণ্ড সংঘটিত হইলেই অগ্রে তথাকার দুষ্ট-চরিত্র লোকের প্রতি সন্দেহ হয়, ইহা মানবের স্বভাব-সিদ্ধ ভাব।

ভুবনেশ্বর বাবু বলিলেন,—"যখন আমার কন্যার বিবাহ সময়ে প্রবোধ বন্ধুবান্ধব সহ মত্তাবস্থায় তথায় গিয়াছিল, তখন বড় বৌ তাহার সেই ঘৃণিত অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, —"মেয়ের বিবাহ যদি নাও হয়, তথাপি দেখিয়া শুনিয়া এ

পাত্রে বিবাহ দিতে পারিব না। প্রবোধ সে কথা শুনিতে পাইয়া ঘৃণার সহিত বেশ একটু তীব্রহাসি হাসিয়াছিল। এখন এই ঘটনা দেখিয়া তাহার উপর আমারও বিশেষ সন্দেহ হয়।"

আত্মনাথ বাবু বলিলেন,—"আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহাদের সন্ধান লইয়াছিলাম। তাহারা আজ চারি পাঁচদিন হইল, বারাণসী ধামে গমন করিয়াছে, তাহার বাটীতে দাস দাসী-গণ ও তাহার মাতুল মহাশয় সপরিবারে আছেন—আর কেহই নাই।"

ভুবনেশ্বর। উহা ভাণ মাত্র, এই ঘটনা ঘটাইবার জন্য এবং নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার জন্য—সে এরূপ কাণ্ড করিয়াছে। হইতে পারে কাশীর বাটীতে জননীকে রাখিয়া আসিয়াছে; কিন্তু এ কাণ্ড যে তাহার দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আমার ত কিছুমাত্র সন্দেহ হয় না।

শ্যামার মা বলিল,—"আমি আজ সন্ধ্যার সময় প্রবোধকে সেই ঝড় বৃষ্টিতে ভিজিয়া আসিতে দেখিয়াছি; তবে ইহার সহিত ঘরের শত্রু আছে; ছুঁড়ীরও কি এ বিবাহে মত ছিল? শেষে সে প্রবোধকে বিবাহ করিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা করিয়াছিল। তার আশা মিটে নাই বলে সেও এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছে। ছুঁড়ী দস্যুদের সহিত পলাইবার জন্য নিজের রক্তমাখা কাপড়খানি ছাড়িয়া অন্য কাপড় পরিয়াছিল—সে কাপড়খানি মেঝের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। ভাগ্যে রূপো দেশে থেকে আজি এসে পৌঁছেছিল, তাই ত তাকে ধরে আনলে।"

এইবার সুকুমারী দন্ত কড়মড় করিয়া বলিল—"পোড়ার মুখি! তুমি নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক দিচ্ছ? আমার বোধ হয় তুমিই এই কাজের গোড়া, এ সর্ব্বনাশ তুমিই করিয়াছ।"

বৃদ্ধ ত্রিলোচন এতক্ষণ কি কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল, এইবার সাহসে ভর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল;—"মা ঠাকরুণ! তোমার কথাই সত্য, আমারও ঐরূপ সন্দেহ হয়।" এইরূপ কত লোকে কত কথা বলিতে লাগিল।

বিবাহের আমোদ আহ্লাদ শেষে গভীর শোক-সাগরে পরিণত হইল!. মহামায়ার সাঙ্ঘাতিক প্রহার এবং নিরুপমার দুর্দ্দশা দর্শনে সকলেই হা হতোস্মি করিতে লাগিল; পর্জ্জন্য-দেব বারি বর্ষণে ক্ষান্ত হইলেও সৌদামিনীর কটাক্ষপাত তখনও তিরোহিত হয় নাই। সে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা নিরুপমার শুভ বিবাহের এই অশুভ পরিণাম দর্শন করিয়া ক্ষণে ক্ষণে চক্ষু মুদিত করিতেছে ও ক্ষণে ক্ষণে কটাক্ষ করিয়া আপনার অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে ক্ষীণতোয়া বাঁকা নদীর মূর্ত্তি বড়ই প্রখর হইয়াছিল। বাঁকার বাঁকা-স্রোতে পারাপারের বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। এখন সে শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। ৺নীলরতন বাঁকার তীরে দেবালয় ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া তাহার মহত্ত্ব বাড়াইয়াছিলেন। এই জন্য নদী বুঝি আজ মুখোপাধ্যায় বাটীর শোচনীয় পরিণাম, আনন্দে নিরানন্দ দেখিয়া দুঃখে ম্রিয়মান হইতে লাগিল।

কোতওয়ালীতে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। যত শীঘ্র ইহার

তদন্ত হয়, ততই মঙ্গল, কিন্তু কোতওয়ালীর কর্ত্তাদের ত আর কিছু হয় নাই, তাহারা এ দুর্য্যোগে সুখে নিদ্রা যাইতেছে, কে কার কথা শুনে। যথা সময়ে যাইবে বলিয়া তাহারা সংবাদ-দাতাকে বিদায় প্রদান করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

তদন্তের ফল।

পরদিন প্রভাতে কোতওয়াল্ ঘটনা স্থলে উপনীত হইলেন। একজন বিশিষ্ট লোকের বাটীতে এরূপ ডাকাতী আদালতের পক্ষে বড়ই নিন্দার বিষয়। যথা সময়ে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু রাত্রিকালে তাহারা আসিতে পারেন নাই। দূরত্ব হেতু সে দুর্য্যোগে আসাও অসম্ভব, এই জন্য অতি প্রত্যুষেই কোতওয়াল কয়েকজন বরকন্দাজ সহ আসিয়া উপস্থিত। তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়াছে, বালার্কের লোহিত কিরণ সৌধ চূড়ায়, বৃক্ষ শীর্ষে শোভা পাইতেছে। ফতেউল্লা দারোগা, স্বর্গীয় নীলরতনের বাটীর এই শোচনীয় অবস্থা, দুর্ব্বৃত্ত ডাকাতগণের এই বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া বাস্তবিক অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিলেকের জন্য তাঁহার কঠিন হিয়াও বিচলিত হইল। তিনি পূর্ব্বে নীলরতন বাবুর জীবিতাবস্থায় অনেকবার এ বাটীতে আসিয়াছিলেন। তখন যেন এই বাটীর বেশ পবিত্র শ্রী ছিল, এখন যেন ইহা শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। তাহার উপর অদ্য আবার এই দৃশ্য অতি ভয়ানক, অতি বিস্ময়কর, অতি লোমহর্ষণ। তিনি যেন জগতের পরিবর্ত্তন এই স্থানে পরিপুষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। নীলরতন হইতেই তাঁহার পদোন্নতি হইয়াছে। নীলরতনকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন, ফতেউল্লা দারোগার হৃদয় ঠিক পুলিশের ধাতুতে

গঠিত ছিল না বলিয়া, তাঁহার হৃদয় পুলিশের ন্যায় কঠিন হইতে পারে নাই।

দারোগা মহাশয় আসিয়া ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিলেন। প্রত্যেক স্থান, এমন কি বাগান বাটীকা হইতে খিড়কীর দরজা পর্য্যন্ত সমস্ত তন্নতন্ন করিয়া দেখিলেন, প্রত্যেক গৃহ বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। তার পর বহির্বাটীর দপ্তরখানায় আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং বাটীর চারিদিকে প্রহরী বেষ্টিত করিয়া রাখিলেন।

প্রথমে তিনি বৃদ্ধ আত্মনাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "আপনি এই ডাকাতী সম্বন্ধে কি জানেন—তাহা বলুন ?"

আত্মনাথ। আমি ইহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না, কারণ আমি বহির্বাটীতে লোকজন খাওয়াইতেছিলাম ; পরে শ্যামার মার চীৎকার শুনিয়া যেমন সকলে দৌড়িয়া আসিল, আমিও তেমনি আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং দেখিলাম—মহামায়া ছোরার আঘাতে অচৈতন্য হইয়াছে, এবং একটী লোহার সিন্দুক চুরি গিয়াছে।

দারোগা। কে করিল, কাহার প্রতি আপনার সন্দেহ হইল ;

আত্মনাথ। আমার কাহারও প্রতি সন্দেহ হয় না ; স্থানীয় লোক বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।

দারোগা মহাশয় শ্যামার মাকে ডাকিলেন, শ্যামার মা ছল ছল নেত্রে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ত উপস্থিত ছিলে, ডাকাতদের কাহাকেও চিনিতে পারিয়াছ কি ?"

শ্যামার মা। আমি কাহাকেও ভাল চিনিতে পারি নাই,

তখন বড় দুর্য্যোগে; তবে সেই দুর্য্যোগে সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রবোধকে এই রাস্তা দিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম। প্রবোধের সহিত নিরুপমার বিবাহ হইবার কথা হইয়া পরে অপরের সহিত বিবাহ হইয়াছে। এত অপমান কি বড় লোকের ছেলে সহ্য করিতে পারে? প্রবোধকেই আমার বেশী সন্দেহ হয়।

দারোগা মহাশয় এই বিবাহের বিষয় সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সকলেই বলিলেন;—"হাঁ বিবাহের কথা সকলই সত্য।"

দারোগা। আপনাদের কি তবে প্রবোধকে সন্দেহ হয়?

তাহাদের মধ্যে অনেকেই বলিল—"কতকটা সন্দেহ হইতে পারে।"

ফতেউল্লা দারোগা তার পর নলিনাক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কাহার উপর সন্দেহ হয়?"

তিনি বলিলেন—"আমার প্রবোধের উপর সন্দেহ হয় না, স্থানীয় কেহ নয় বলিয়াই আমার বিশ্বাস।"

জ্যোতিষ বাবুও পরদিন প্রাতে বহুকষ্টে এই দুর্ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন; "আমার সন্দেহ কোনও দুর্ব্বৃত্ত লোকের উপরই হয়। সে জীবিত, কি মৃত বলিতে পারি না। পূর্ব্বে রমেশ নামক এক ভয়ানক প্রকৃতির যুবক প্রবোধের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিল, বোধ হয় সেই দুরাত্মাই ইহার নায়ক।"

দারোগা মহাশয়ের যেন প্রবোধের উপর সন্দেহ বেশী দৃঢ় হইল। সেই যে নিরুপমাকে হরণ করিবার জন্য মহামায়াকে হনন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, ইহাই যেন বিশেষ প্রমাণ-

যোগ্য। বড় লোকের ছেলে অর্থের দ্বারা কি না করিতে পারে? পরে দারোগা মহাশয় মহামায়ার ও নিরুপমার জবানবন্দী লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের জবানবন্দীতে প্রবোধের উপর কোন সন্দেহই প্রকাশ পাইল না। তবে ফতেউল্লার প্রবোধের উপরই সন্দেহ সুদৃঢ় হইল, সে কাজি সাহেবের নিকট এই মোকর্দ্দমা সোপরদ্দ করিয়া দিল।

ক্রমে বেলা হইল, এই ভীষণ সংবাদ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। এরূপ একজন বিশিষ্ট ভদ্র পরিবারের মধ্যে হঠাৎ এরূপ একটী দুর্ঘটনা বড়ই দুঃখের বিষয়, এ বিষয় লইয়া নানা জনে জল্পনা, কল্পনা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে নব সাজে সজ্জিত হইয়া কোতয়ালীর কতকগুলি বরকন্দাজ জমীদার ৺শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী অবরোধ করিল। প্রবোধ এই আকস্মিক বিপদে ভীত না হইয়া আত্ম সমর্পণ করিলেন এবং বাহিরে আসিয়া দারোগা সাহেবের নিকট হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিলেন --"আমার উপর এ পরওয়ানা কেন জারী হইল?"

দারোগা সাহেব পুলিশোচিত গাম্ভীর্য্যে কহিলেন,—"ফৌজদার বাবুর বাটীর ডাকাতী বিষয়ে তুমি লিপ্ত আছ বলিয়া, তোমায় গ্রেপ্তার করিব।"

মাতুল শ্যামসুন্দর বাবু পূর্ব্ব হইতেই প্রবোধের চরিত্র বেশ বুঝিয়াছিলেন। এ কার্য্য যে প্রবোধের দ্বারা সমাহিত হয় নাই, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। আর প্রবোধ ত এখানে ছিল না। তবে কি গ্রামস্থ বিপক্ষদলের প্ররোচনায়, ইহারা আজ তাহাদিগকে অপদস্থ করিতে আসিয়াছে? প্রবোধ আমারই অসুস্থ সংবাদ শুনিয়া আসিয়াছে, প্রবোধ ত বাস্ত-

বিক কাশী গিয়াছিল, তবে কি সে আসিবার সময় এই কীর্ত্তি করিয়া আসিয়াছে, তবে কি তার কলুষিত চরিত্র এখনও সংশোধিত হয় নাই। শ্যামসুন্দরের মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। কই—বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মারা যাইবার পর অনেক দিন হইল, প্রবোধের চরিত্রে ত কোন প্রকার কলঙ্ক দেখা যায় নাই। একি বিষম কুহেলিকা! তথাপি তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; কারণ আইন বিষয়ে শ্যাম-সুন্দরের বেশ আয়ত্ত ছিল। সেই জন্য দারোগা সাহেবের নিকট আসিয়া ভাগিনেয়ের সাপক্ষে নানা কথা বলিয়াছিলেন।

জমীদার বাটীতে আজ প্রতিবাসী অনেক ভদ্রলোক মিলিত হইয়াছেন। দারোগা জমীদারের বাটী অবরোধ করিবার সময় গ্রামস্থ ভদ্রলোক কয়েক জনকে আহ্বানও করিয়াছিলেন। দারোগার কথায় যাহার যাহা অভিমত তাহা প্রকাশ করিল। যাহারা প্রবোধের কাশী যাইবার সংবাদ জানিত—তাহারা বলিল—প্রবোধ বাস্তবিকই কাশী গিয়াছিল, আমরা তাহাকে জননীর সহিত কাশী যাত্রা করিতে দেখিয়াছি; তাহার পর গত কল্য বৈকালেও আমরা তাহার বিশেষ সন্ধান জানিতাম—সে গৃহে নাই; কিন্তু কখন আসিয়া একাজ করিয়াছে, তাহা আমরা জানি না।

ফতেউল্লা দারোগাও সমস্ত বিষয় জানিতেন। তিনি বলিলেন—ঐ কন্যার বিবাহের পূর্ব্বে প্রবোধের সহিত সম্বন্ধ ঠিক হইয়াছিল এবং গুণ্ডার দলে মিশিয়া সে চরিত্র হারাইয়াছিল কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই প্রায় সে কথা স্বীকার করিল।

বিবাহের সমস্ত স্থির হইলে মহামায়ার আজ্ঞায় ত্রিলোচন বাবু রূপচাঁদকে পত্রপাঠ আসিবার জন্য লিখিয়াছিলেন। রূপচাঁদ পত্র পাইয়াই রওনা হইয়াছিল। বিবাহের দিন অপরাহ্লে তাহার আসিয়া পৌঁছিবার কথা ছিল, কিন্তু বিষম দুর্য্যোগে ঠিক সময়ে আসিতে পারে নাই। তাহার আয়ীর ভয়ানক পীড়ার জন্য, সে অনিচ্ছা সত্বেও দেশে গিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে তাহার বাসস্থান, রূপচাঁদের কয়েক দিনের শুশ্রূষায় তাহার আয়ী বেশ সুস্থ হইয়াছিল। বৃদ্ধা রূপচাঁদের মুখে তাহার প্রভু-কন্যার শুভ পরিণয় সংসাধিত হইবে এবং সে বিবাহে রূপচাঁদের বেশ দুপয়সা প্রাপ্য হইবে শুনিয়া, তাহাকে সেই দিনই রুদ্রপুরাভিমুখে যাত্রা করিবার অনুমতি দিয়াছিল। রূপচাঁদ পূর্ব্বে জমীদারের খাজনা পরিশোধ এবং গৃহ-সংস্কার কার্য্য শেষ করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে তাহার আয়ীর অনুমতি পাইয়া, সে হর্ষচিত্তে কয়েকজন সঙ্গীসহ গৃহ হইতে নিস্ক্রান্ত হইল এবং কয়েক দিন অবিশ্রান্ত পথ অতিবাহিত করিয়া একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌঁছিল। তখন প্রবল বায়ু সহ বৃষ্টিপতন আরম্ভ হইয়াছে। বর্দ্ধমানে আসিয়া তাহারা একটী দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিল, ভয়ানক দুর্য্যোগের জন্য তথা হইতে আর একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না। সেখান হইতে রুদ্রপুর প্রায় দুই দিনের পথ, একে ভীষণ অন্ধকার রজনী, তাহার উপর অতিশয় বারিবর্ষণ হইতেছে। পথে জন মানবের সমাগম নাই, রূপচাঁদ সঙ্গীগণসহ হতাশভাবে তথায় অবস্থান করিতে বাধ্য হইল। সমস্ত দিন পথশ্রমে তাহারা বড়ই কাতর হইয়া-

ছিল, সামান্য জলযোগ করিয়া শয়ন করিবামাত্র নিদ্রাকর্ষণ হইল।

দুই তিন ঘণ্টা অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর আকাশ নির্ম্মল হইলে তাহারা আর কাল বিলম্ব না করিয়া রুদ্রপুরাভিমুখে প্রস্থান করিল এবং তৃতীয় দিবস অর্থাৎ বিবাহের দিন রাত্রি প্রায় দশটার সময় সে প্রভু-বাটীর নিকট উপস্থিত হইল। সেই সময় কয়েকজন যমদূতাকৃতি পুরুষ একটী স্ত্রীলোককে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া, রূপচাঁদ সঙ্গীগণ সহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। ডাকাতগণ ইহাদের ভীষণ পরাক্রমে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। বলা বাহুল্য যে দস্যুগণ প্রাণভয়ে স্ত্রীলোকটীকে ফেলিয়াই পলায়ন করিয়াছিল। রূপচাঁদ সেই চৈতন্যহীনা রমণীর নিকট অগ্রসর হইল এবং মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া যাহা দেখিল -তাহাতে তাহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিল—কিন্তু আর কাঁদিয়া ফল কি? যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার ত আর কোনও উপায় নাই। রূপচাঁদ নিরুপমাকে শশব্যস্তে কাঁদে তুলিয়া লইল এবং ধীরে ধীরে গৃহের মধ্যে লইয়া আসিল। তাহার পর চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষায় নিরুপমা ও মহামায়া এখন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন। শ্যামার মা, প্রবোধ ও নিরুপমার উপর এই দোষ চাপাইতেছে—পরদিন তাহার এজাহারে রূপচাঁদ কিন্তু এ কথায় কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। ইহার ভিতরে অন্য কোনও গুপ্ত রহস্য আছে—ইহা সে বেশ বুঝিতে পারিল। নানা স্থানে শ্যামার মাকে অন্বেষণ করিল,

তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না, তাই সে প্রবোধের বাটী অভিমুখে চলিয়া আসিয়াছে, তখনও তদন্ত শেষ হয় নাই। রূপচাঁদ তথায় আসিয়া কিয়ৎক্ষণ সকলের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল। রূপচাঁদের মন আজ বড়ই চঞ্চল, মহামায়ার ও নিরুপমার শোচনীয় অবস্থাদর্শনে তাহার প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়াছে। হায়! কেন আমি দেশে গিয়াছিলাম, আমি থাকিলে কি এ দুর্ঘটনা ঘটিতে পারিত? রূপচাঁদ যখন প্রবোধের বাটীতে উপস্থিত হইল, তখন দারোগা সাহেব প্রবোধকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"আচ্ছা! তোমার সহিত আর কে ছিল বল দেখি—তাহা হইলে তোমার বিষয় আমি বিবেচনা করিব।"

প্রবোধ। মহাশয়! আমি এ ঘটনার বিন্দু বিসর্গও জানি না। আমি মাতুল মহাশয়ের অসুস্থ-সম্বাদ পাইয়া পত্র পাঠ মাত্র কাশী হইতে চলিয়া আসিয়াছি। আমার জন্য লোকজন বর্দ্ধমানে অপেক্ষা করিবার কথা ছিল, কিন্তু অতিশয় দুর্য্যোগ উপস্থিত হওয়ায় তাহারা চলিয়া আসিয়াছিল। আমি তথায় উপস্থিত হইয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সেই দুর্য্যোগে পদব্রজেই আসিয়াছিলাম। মন্ত্র গ্রহণের পর গুরুদেব আমাকে বলিয়াছিলেন রৌদ্র ও বৃষ্টি সহ্য করিতে না শিখিলে, কষ্ট সহ্য করিয়া শরীর দৃঢ় করিতে না পারিলে, ঈশ্বর সাধনা হয় না। আমি এখন আর গাড়ী পাল্কী প্রভৃতির তত আকাঙ্ক্ষা করি না।

"আর করিতেও হইবে না" বলিয়া, দারোগা প্রহরী বেষ্টিত করিলেন এবং প্রবোধকে লইয়া কাজি সাহেবের কুঠিতে আগমন করিলেন। প্রবোধকে ধৃত করিবার সময় দারোগা

তাঁহার প্রতি কোন প্রকার অন্যায় আচরণ করেন নাই। রূপ-চাঁদ প্রবোধের এই পরিণাম দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইল। নিরুপমাকে উদ্ধার করিবার সময় সে ত প্রবোধকে দেখে নাই, তবে তাহার এ দশা কেন হইল? তবে বিচার আচারের কথা সেও তত বুঝে না। দারোগা প্রবোধকে লইয়া যাইলে প্রতিবেশীগণ মধ্যে কেহ বা আনন্দচিত্তে কেহ বা নিরানন্দচিত্তে স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সেই ঘটনার পর হইতে শ্যামার মাকেও আর কেহ রুদ্রপুরে দেখিতে পায় নাই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—(:*:*)—

দুঃসংবাদ শ্রবণে।

এই জগত মায়াময়। প্রত্যেক জীব মায়ার বাঁধনে বদ্ধ না হইলে জগতের কার্য্য এত সুশৃঙ্খলায় চলিত না। জগত প্রপঞ্চে মায়ার শৃঙ্খল দৃঢ় না হইলে এতদিন সমস্তই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত, কাহারও অস্তিত্ব থাকিত না। যাহার সহিত প্রাণের সম্বন্ধ, একদণ্ড না দেখিলে যাহার অভাবে জগত-সংসার অন্ধকার দেখিতে হয়, তাহার বিপদাপদে তদীয় পরমাত্মীয় জনের যে কষ্ট হইবে, প্রাণ যে গভীর দুঃখ-সাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? মায়ার সহিত মনের নিত্য সম্বন্ধ, মায়ার আকর্ষণে মন তাহার আধেয় বস্তুকে, তাহার ভালবাসার পাত্রটীকে চায় বলিয়াই—জনক জননী তাহার প্রিয় পুত্রকে ছাড়িতে পারে না। অসহ্য যন্ত্রণা, অপরিসীম কষ্ট সহ্য করিয়াও সে আপন সন্তানটীকে স্নেহ-আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, এ আচ্ছাদন সহজে টুটিবার নহে। তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে না, কাহারেও বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই; সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই সন্তান-বৎসলা জননীর অপত্যস্নেহ, তাঁহার মায়ার বন্ধন আপনাপনিই সন্তানকে এরূপ দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া ফেলে যে, তাহা আর ঘুচিবার নহে, আজীবন এক দুশ্ছেদ্য বন্ধন উভয়ের মনে প্রাণে বাঁধা হইয়া যায়। মাতা পুত্রের সম্বন্ধ এমনি গুরুতর, এমনি কঠিন বাঁধনে আবদ্ধ। জননীর তুল্য স্নেহময়ী এ জগতে আর কেহই নাই। প্রবাসে

সন্তান বিপদে পড়িলে, স্বদেশে তাহার জনক জননী তাহা অনায়াসে অনুভব করিতে পারেন; তাঁহাদের মন যেন সহজেই কি এক অজানিত কষ্ট অনুভব করে, যেন তাঁহাদের প্রাণে শান্তি থাকে না, স্ফূর্ত্তিবিহীন প্রাণে সদাই যেন কি এক অব্যক্ত দুঃখানলে তাঁহারা দগ্ধ হইতে থাকেন। মনের সহিত এই যে সংযোগ, এই যে অভাবনীয় আকর্ষণ—ইহাই মায়ার কার্য্য। বিধির বিধানে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত এই কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে বলিয়াই জগত এত সুখকর, জগতে প্রত্যেক জীবের কার্য্য এত মধুময়।

মায়ার প্রকৃত প্রভাব জননী হৃদয়ে যতদূর কার্য্যকরী, এতদূর জগতে আর কোথাও নাই। প্রবাসে কোন আত্মীয় বিপদাপন্ন হইলে—যদি তাহার আত্মীয়ের হৃদয় দুশ্চিন্তানলে দগ্ধীভূত হইতে পারে, তাহা হইলে সন্তান-বৎসলা জননীর মনোবেদনা কিরূপ দুর্ব্বিসহ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? যেমন সাগরে প্রবল বাতাস বহিলে, তাহার সলিল তোলপাড় করিতে থাকে; স্রোতের ঘাত প্রতিঘাতে তটভূমি আক্রান্ত হয়, সেইরূপ স্নেহরূপিনী জননীর হৃদয়-তটিনী যে পুত্রের আসন্ন বিপদে মর্ম্মান্তিক দুঃখে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইবে—তাহাতে আর সন্দেহ কি?

প্রবোধ আজ কয়েক দিবস হইল বাটী গিয়াছে, তাহার কোনও সংবাদ কাত্যায়নী জানেন না; কিন্তু যে দিন প্রবোধ দারোগার হস্তে গ্রেপ্তার হইয়াছে, সেইদিন সেই মুহূর্ত্ত হইতে কাত্যায়নীর অন্তঃকরণ কি এক অকস্মাদুদ্ভূত দুঃখে ক্রমশঃ ম্রিয়মান হইতে লাগিল। ইহার কারণ তিনি কিছুই বুঝিতে

পারিলেন না। সহসা মনের গতি এরূপ পরিবর্ত্তিত হইল কেন, কাত্যায়নী তাহা আন্দোলন করিতে লাগিলেন, সন্দেহ দোলায় তাঁহার মন দোদুল্যমান হইতে লাগিল। তবে কি সেই দুর্য্যোগে গৃহে যাইবার সময়ে পথে প্রবোধের কোন বিপদ হইয়াছে! দিনের পর দিন যাইতে লাগিল কাত্যায়নী কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অশনে বসনে, শয়নে স্বপনে তিনি যেন নানা প্রকার বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন।

বিশ্বেশ্বরের পূজা ও ধ্যান ধারণা যাঁহার নিত্য কর্ম্ম, সেই কাত্যায়নী আজ যেন পূজাদিতে আদৌ মনোনিবেশ করিতে পারিতেছেন না। পদে পদে যেন বাধা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। অকস্মাৎ মানস চাঞ্চল্যে তিনি অভিভূত না হইয়া মঙ্গলময় শঙ্করের শঙ্কাহরণ নাম অহরহঃ রসনায় রটনা করিতে লাগিলেন। নিশ্চয়ই প্রবোধের বিপদ হইয়াছে, এইরূপ সন্দেহ করিয়া কাত্যায়নী নায়েব মহাশয়কে কোনও সংবাদ আসিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কোনও পত্রাদি আসে নাই শুনিয়া, তিনি নিজেই পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় রুদ্রপুর হইতে জনৈক ভৃত্য একখানি পত্র লইয়া উপস্থিত হইল। নায়েব মহাশয় তাড়াতাড়ি কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিকট লইয়া আসিলেন এবং তাহা পাঠে একেবারে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার কোনও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। নায়েব মহাশয় এই ভীষণ সংবাদ কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কাত্যায়নী বলিলেন—"তোমার কোনও চিন্তা নাই, কি লেখা আছে, সত্বর প্রকাশ করিয়া বল।"

নায়েব মহাশয় বলিলেন, "প্রবোধ বাবু এক ভয়ানক হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকার জন্য বাটী পৌঁছিয়াই, আদালতে অভিযুক্ত এবং ধৃত হইয়াছেন, আপনার চিন্তার কোনও কারণ নাই; পুরাতন ভৃত্য সর্ব্বেশ্বর আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে, অদ্য সন্ধ্যার সময় আমাদিগকে রওনা হইতে হইবে।"

কাত্যায়নী হঠাৎ এই দুঃসংবাদে প্রাণে আঘাত পাইলেন বটে, কিন্তু তিনি অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন না। ধীর ও স্থিরভাবে ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া হৃদয়ে প্রভূত বল সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। সেদিন আর আহারাদি করিতে পারিলেন না, সমস্ত দিন পুত্রের বিষয় চিন্তা করিয়াই কাটাইলেন। কেন এমন হইল, প্রবোধ ত আমার ভাল হইয়াছে; তাহার ত স্বভাব এখন অতি পবিত্র হইয়াছে, তবে হঠাৎ এ ভয়ানক বিপদের কারণ কি? ইহা তবে পূর্ব্বকৃত কোন মহাপাপের ফল, প্রবোধ কি তবে সত্য সত্যই পাপ করিয়াছে? এখনকার স্বভাব দেখিয়া ত কিছুতেই তাহা স্থির করিতে পারা যায় না, কোনও ষড়যন্ত্রের ফলে কি তাহার এই দুরবস্থা হইল? "মা! বিপদ-বিনাশিনি! তুমি আমার প্রবোধকে রক্ষা কর, আমি যতদূর জানি—তাহাতে প্রবোধ আমার এরূপ মহাপাতকে কখনই লিপ্ত নহে। মা! তুমি সর্ব্বান্তর্যামিনী, তুমিই তাহাকে বিপথ হইতে সুপথে আনিয়াছ; কুমতি তাহাকে লইয়া কলঙ্ক-সাগরে ফেলিতেছিল, তুমিই দয়া করিয়া তাহাকে সুমতি দান করিয়াছ। দোষীকে শাস্তি, নির্দ্দোষীকে মুক্তি প্রদান করা তোমারই কার্য্য। মা! প্রবোধ যদি যথার্থ

দোষী হয়, যদি তোমার চরণে অপরাধ করিয়া থাকে, তবে সে শাস্তি পাইবে, নতুবা লোকের ষড়যন্ত্রে যদি সে বিপদে পড়িয়া থাকে, মা! বিপদবারিণি! তুমি তাহাকে পদাশ্রয়ে আশ্রয় প্রদান করিয়া তাহার সকল আপদ বিপদ নাশ কর মা।" এই বলিয়া তিনি সাশ্রুনয়নে ভক্তি গদ্গদচিত্তে দেবীচরণে প্রণাম করিলেন।

শোকে দুঃখে দিবাভাগ অতিবাহিত হইল। ঠিক সন্ধ্যার সময় সর্ব্বেশ্বর কাত্যায়নীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে কর্ত্রীর নিকট সমস্ত বিপদবার্ত্তা বিবৃত করিয়া বলিল;—"মা! পাড়ার সমস্ত দুষ্ট লোক একত্রে ষড়যন্ত্র করিয়া বাবুকে এইরূপ বিপদে ফেলিয়াছে। নতুবা বাবু যে এ কার্য্য করিয়াছেন, তাহা ভাল লোক বিশ্বাস করিবে না।"

সর্ব্বেশ্বর বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য। শ্রীধর তাহাকে সকল কার্য্যে বিশ্বাস করিতেন, অদ্যাবধি সে কোনও প্রকার বিশ্বাস-ঘাতকার কাজ করে নাই। কাত্যায়নীও তাহাকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন।

সর্ব্বেশ্বরের কথায় কাত্যায়নী বলিলেন,—"বাবা! মানুষ যে মানুষের মন্দ করিতে পারে, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। নিজে দোষী না হইলে যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন, কেহই কিছু করিতে পারিবে না, নির্দ্দোষী ধার্ম্মিককে ধর্ম্মই রক্ষা করেন, তবে ষড়যন্ত্রকারীর কুহকে পড়িয়া সে যে দুঃখদাবদগ্ধ হয়—সে কেবল খাঁটি হইবার জন্য; সুবর্ণ দগ্ধীভূত না হইলে তাহার মলিনতা বিদূরিত হয় না। জগৎ সংসারে মানুষও

এইরূপে বিপদানলে পড়িয়া বিশুদ্ধতা লাভ করে; প্রবোধ যদি দোষী না হয়, তবে তাহার জন্য চিন্তা কি সর্ব্বেশ?"

"মা! আমরা বাবুকে জামিনে খালাস দিবার জন্য অনেক প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু কিছুতেই জামিন মঞ্জুর হইল না। আহা! বাবু হাজতের সে ভয়ানক কষ্ট কেমন ক'রে সহ্য ক'র্ব্বেন?" এই বলিয়া সর্ব্বেশ্বর কাঁদিয়া ফেলিল।

সামান্য রমণীর ন্যায় কাত্যায়নী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিলেন না বটে; কিন্তু অপত্য-স্নেহের তীক্ষ্ণ শেল তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিল। প্রবলবেগে নয়নাশ্রু পতিত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। নায়েব মহাশয়ও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে কাত্যায়নী ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বলিলেন;—"সর্ব্বেশ্বর! আর কালবিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই, অদ্যই রুদ্রপুর যাইতে হইবে।"

নায়েব মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন;—"সর্ব্বেশ্বর! মোকর্দ্দমার দিন কবে?"

সর্ব্বেশ্বর। আর ত্রিশ দিন বাকী। তবে সে দিন যে কিছু হয়, এমন ত বুঝায় না।

নায়েব। আচ্ছা, আর কালবিলম্ব করা বিধেয় নহে, এখন চল—যাইবার উদ্যোগ করা যাক্।

সর্ব্বেশ্বর এতক্ষণ শ্যামসুন্দর বাবুর প্রদত্ত একখানি পত্র নায়েব মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, এইবার তাহা প্রদান করিল।

নায়েব মহাশয় তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন,—"মা!

আমাদের বর্দ্ধমানে একটু বিলম্ব হইবে; মাতুল-মহাশয় তথাকার ফৌজদারকে সাক্ষী দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে তথায় যাইবার জন্য বলিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে এ বিষয় স্বীকৃত করাইতে বহু অর্থের আবশ্যক এবং তথায় বিলম্ব হইবারও সম্ভাবনা। চলুন, আর এখানে বিলম্ব করিয়া কাজ নাই। তথায় পৌছিয়া আপনাকে কোন স্থানে সর্ব্বেশ্বরের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া, আমি তাঁহাকে এ বিষয়ের জন্য অনুরোধ করিব ইহাতে বিলম্ব হইবারই সম্ভাবনা।"

ক্যাত্যায়নী বলিলেন,—"আর বিলম্বে দরকার নাই, চলুন আমরা দুর্গানাম স্মরণ করিয়া রওনা হই।"

সকলে প্রস্তুত হইলেন। নায়েব মহাশয় তথাকার বন্দোবস্ত করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কত গ্রাম, কত নগর অতিক্রম করিয়া যথা সময়ে সকলে বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কাত্যায়নীকে একটী স্থানে রাখিয়া, তিনি ফৌজদারের নিকট গমন করিলেন।

টাকায় কি না হয়! এ জগতে টাকা খরচ করিতে পারিলে যখন অতি অসম্ভব কার্য্যও সম্ভব হইতে পারে, তখন অর্থের দাস, গোলামের অবতার ফৌজদারকে সামান্য একটা সাক্ষী দিবার জন্য স্বীকার করান, কিছু বেশী কথা নয়। বিশেষতঃ সেদিন প্রবোধচন্দ্র যে তাঁহার সমক্ষে পদব্রজে গৃহাভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। সত্য বলিবেন এবং তাহার জন্য বিশেষ লভ্যও হইবে, ইহাতে কে না সম্মতি প্রদান করে। নায়েব মহাশয় একশত মুদ্রা প্রদান করিলেন এবং মোকর্দ্দমার দিন তথায় উপস্থিত হইলে, আরও

একশত মুদ্রা দিবেন—এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া, তিনি তাঁহার নিকট হইতে সত্বর বিদায় লইয়া কর্ত্রীর নিকট সুসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। কাত্যায়নী শ্রবণ করিয়া দেবোদ্দেশে গলবস্ত্রে প্রণত হইলেন।

পরে শকটারোহণে সকলে রুদ্রপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যথা সময়ে রুদ্রপুরে আসিয়া সকলে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। শ্যামসুন্দর বাবু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কাত্যায়নী তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তিনি ভগ্নীকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন;—"মোকর্দ্দমার যেরূপ যোগাড় করা হইয়াছে, তাহাতে আমাদের চিন্তার কোন কারণ নাই।"

কাত্যায়নী। ভাই! অর্থের জন্য কোন চিন্তা করিও না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ বিষয়ে প্রবোধ আমার নির্দ্দোষী; কেবল দুষ্ট লোকে শঠতা করিয়া বাছাকে এই বিপদে ফেলিয়াছে।

শ্যামসুন্দর বাবু। আমারও তাহাই বিশ্বাস, দেখা যাক ভগবানের মনে কি আছে, আমরা ত চেষ্টার কোনরূপ ত্রুটী করিব না।

এই বলিয়া তিনি সর্ব্বেশ্বরের সহিত ভগ্নীকে বাটীতে পাঠাইয়া দিয়া নায়েবের সহিত কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

ইহার পরে কয়েকদিন অতিবাহিত হইয়াছে; আগামী কল্য মোকর্দ্দমায় ফৌজদারকে সাক্ষ্য প্রদান করাইতে হইবে। ঘটনার দিন প্রবোধ যে বাটীতে ছিল না, সেইদিন রজনীযোগে যে সে গৃহে আসিয়াছে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কাশীর

জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বর্দ্ধমানের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সাক্ষ্য মানা হইয়াছে। এইরূপ মাননীয় ভদ্রলোক সকল প্রবোধের সাপক্ষে সাক্ষ্যদান করিলে হাকিম নিশ্চয়ই আসামীকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিবেন, তারপর অপরাপর সাক্ষী ত আছেই।

এই সমস্ত ঠিক করিয়া বাটী ফিরিতে তাঁহাদের রাত্রি দশটা বাজিল। নানাপ্রকার দুর্ভাবনা ও মোকর্দ্দমার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল।

ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই সমস্ত কার্য্য করেন। কারণ ধর্ম্মের অসীম ক্ষমতা ধার্ম্মিক ব্যক্তিই বিশেষরূপ অবগত আছেন; ধর্ম্ম-সাক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিলে তাহার সফলতা অবশ্যম্ভাবী, ইহা ধার্ম্মিকের দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়াই সম্পদে বিপদে তিনি ধর্ম্ম কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করেন, অধার্ম্মিক তাহা করে না বলিয়াই তাহারা কোন কার্য্যে চিরস্থায়ী সফলতা লাভ করিতে পারে না।

শ্রীধরের বাটীতে নিত্য দেবসেবার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। কাত্যায়নী যে গৃহের গৃহিণী, সে গৃহে ধর্ম্ম কর্ম্মের ত্রুটী হইতে পারে না, শ্রীধর বাবু বাহিরের কর্ত্তা ছিলেন, কার্য্য-দোষে তিনি বাহিরে সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। ভিতর ঠিক ছিল এবং সংসার অন্তঃসার-শূন্য হয় নাই বলিয়াই—এ সংসার এখনও অধঃপাতে যায় নাই। শ্রীধরের ও প্রবোধের অত্যাচাররূপ কত ঝঞ্ঝা ইহার উপর দিয়া প্রবলবেগে বহিয়া গিয়াছে, তবুও ইহার পতন হয় নাই। ধর্ম্মের উপর স্থাপিত ছিল বলিয়া, ইহার ভিত্তি এত পাকা!

কাত্যায়নী ধর্ম্মের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস করিতেন। ধর্ম্মপথে থাকিলে যে কোন প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে না, তাহা তিনি বেশ বুঝিতেন। প্রবোধ এখন কুপন্থা পরিহার করিয়াছে, তবে তাহার ভাগ্যে এ দুর্গতি ভোগ কেন? নিশ্চয়ই কোন দুর্বৃত্তের চক্রান্তে প্রবোধের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে বা পূর্ব্ব পাপে সে এতাদৃশ দুর্গতি ভোগ করিতেছে? দোষীর শাস্তি হউক, নির্দ্দোষী নিষ্কৃতি লাভ করুন। প্রবোধ আমার পুত্র বটে—কিন্তু সে যদি এই দুর্দ্ধর্ষ পাপ-কার্য্যে লিপ্ত থাকে তাহা হইলে সে ধর্ম্মাধিকরণে শাস্তি প্রাপ্ত হউক, তাহাতে আমার অণুমাত্র দুঃখ নাই; কিন্তু যদি মিথ্যাপবাদে তাহার এ দুর্গতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে হে ভগবান্! তাহাকে সত্বর নিষ্কৃতি প্রদান করুন। প্রভু! পাপ করিয়া ত তোমার নিকট গোপন রাখা যায় না। তুমি যে সর্ব্বদর্শী, তোমার চক্ষের অন্তরালে ত কিছুই থাকিতে পারে না। তুমি পরম বিচারী, আমি তোমারই পাদপদ্মে ইহার ভার দিলাম। বিচারের দিন প্রত্যূষে জননী পুত্রের জন্য এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

পাঠক! স্বামীর চরিত্র বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। এইবার তাঁহার স্ত্রীর চরিত্র দেখিয়া ধন্য হউন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

জামিন মঞ্জুর।

আজ প্রবোধের বিচারের দিন। প্রভাতে পুত্রহারা পাগলিনী প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া সংযতচিত্তে ভগবানের পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। পুরোহিত মহাশয় আগমন করিলে কাত্যায়নী ভক্তিভাবে তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন, পুরোহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া ভগবানের পূজায় নিরত হইলেন। কাত্যায়নীও করযোড়ে গৃহ-দেবতার ধ্যাননিরতা হইলেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি বিপদে বা সম্পদে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। শ্যামসুন্দর বাবু মোকর্দ্দমার বাহ্যিক বিষয়ে বিশেষরূপে তদ্বির করিতে লাগিলেন, আর কাত্যায়নী ধর্ম্মের দোহাই দিয়া হৃদয় দৃঢ় করিতে লাগিলেন। এই আকস্মিক বিপদে কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। পুরোহিত মহাশয় যজমানের মঙ্গল কামনা করিয়া ভগবানের নির্মাল্য প্রদান করতঃ পূজান্তে গৃহে গমন করিলে—কাত্যায়নী দেবতা-পদে প্রণতা হইয়া বলিলেন,—"মধুসূদন! পরম বিচারী হরি! তুমি আমার প্রবোধকে রক্ষা কর; আমার বিশ্বাস—সে এখন আর তাদৃশ দুর্ব্বৃত্ত নহে, যে এ নরহত্যায় লিপ্ত থাকিবে। কর্ত্তার পরলোক গমনের দিন হইতে সে যেরূপ ভাবে চলিতেছে, তাহাতে এ কার্য্য তাহার দ্বারা সম্ভবপর হইতে পারে না,—ইহার ভিতর বোধ হয়

কোনও ষড়যন্ত্র নিহিত রহিয়াছে। এই ষড়যন্ত্রের মর্মোদ্ঘাটন করিয়া তুমি না রক্ষা করিলে আর কে রাখিবে প্রভু! এ বিপদে তোমার পাদপদ্মই আমার একমাত্র ভরসা!”

এদিকে শ্যামসুন্দর বাবু আদালতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কাত্যায়নী ভ্রাতার চাদরে পুরোহিত প্রদত্ত দেবতার নির্ম্মাল্য বাঁধিয়া দিলেন। পূর্ব্বে আমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে ধর্ম্মকর্ম্ম এইরূপ ভাবেই আচরিত হইত—এখন আর তাহা হয় কি? হিন্দু-ললনা আজ ধর্ম্ম-কর্ম্মে শৈথিল্য প্রদান করিতেছে বলিয়াই ত আমাদের দেশের ও সমাজের এত অবনতি হইতেছে।

শ্যামসুন্দর বাবু যথা সময়ে সদলবলে আদালতে সমুপস্থিত হইলেন। আদালত আজ লোকে লোকারণ্য হইয়াছে, স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলেই বিচারফল দেখিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। যথাসময়ে বিচারপতি বিচারাসনে সমাসীন হইলে, সকলে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। কয়েকটী ছোট মোকর্দ্দমার দিন ফেলিয়া দিয়া কাজি সাহেব এই খুনের বিচারে হস্তক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই প্রবোধকে আসামীর কাটগড়ায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। সকলেই মনে করিয়াছিল, প্রবোধ এই কয়দিন হাজতে বাস করিয়া হয়ত কত কৃশ হইয়া গিয়াছে। দারুণ দুর্ভাবনায় হয়ত তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, কোতয়ালীর লোকেরা হয়ত তাহাকে নানাপ্রকার উৎপীড়ন করিয়াছে; কিন্তু এক্ষণে প্রবোধকে দেখিয়া সকলের সে ভ্রম দূর হইল। প্রবোধের কিছুমাত্র অবস্থার বৈলক্ষণ্য হয় নাই, বরং তাহাকে এখন পূর্ব্বাপেক্ষা

আরও প্রফুল্লিত বলিয়া বোধ হইতেছে। অর্থের জন্যই হউক বা যে কোন কারণেই হউক, হাজতে তাহাকে কোন প্রকার উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয় নাই।

কাজি সাহেব বিচারাসনে বসিয়া প্রবোধকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"তুমি একটী বিশিষ্ট ভদ্র পরিবারের এইরূপ সর্ব্বনাশ করিলে কেন?"

প্রবোধ বলিল,—"অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, কিন্তু আমি এই বিষয় সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহি।"

কাজিসাহেব। নিরুপমার উপর তোমার লোভ হইয়াছিল কি না?

প্রবোধ। আমার পিতা বর্ত্তমানে তাহার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা হইল না বলিয়া যে তাহার পিসীমাকে হত্যা করিতে হইবে, ইহার কোন কারণ নাই।

কাজিসাহেব। যখন হত্যা করিতে গিয়াছিলে, তখন রাত্রি কত এবং তোমার সাহায্যকারী অপর সকলে এখন কোথায়? সত্য বলিলে তোমার দণ্ডের লাঘব হইবার সম্ভাবনা।

প্রবোধ গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"তাহাদের সহিত আমার বহুদিন দেখা হয় নাই। আর সে রাত্রে ঘটনার সময় আমি ছিলাম না, ইহার বিষয় আমি কিছুই জানি না।"

বিচারপতি এইবার সাক্ষীগণের এজাহার গ্রহণ করিবার জন্য প্রথমে আদ্যনাথ বাবুকে ডাকিলেন,—তিনি যথারীতি, শপথ করিয়া বলিলেন—"আমি সন্ধ্যার সময় প্রবোধের অনুসন্ধান লইয়া এই জানিয়াছিলাম যে, সে তখনও কাশী হইতে

আসে নাই। তারপর ডাকাতী হইবার সময় আমি ছিলাম না, আমি এ বিষয় আর কিছুই জানি না।"

তারপর একে একে সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল, তাঁহারা সত্য কথা বলিয়া প্রবোধের পক্ষ সমর্থন করিলেন। কেবল শ্যামার মা বলিল,—"আমি সে সময় মহামায়ার কাছে ছিলাম। আমি প্রবোধকে দেখিয়াছি, যখন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল, তখন বাগানের দরজা খুলিয়া রাস্তায় আসিলে প্রবোধ নিরুপমাকে লইয়া আর দুইজন গুণ্ডা সহ প্রস্থান করিল। নিরুপমাকে তাহারা কাঁদে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। আমি চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলে একজন গুণ্ডা আমায় একখানি ছোরা দেখাইল, কাজেই প্রাণভয়ে আমি চুপ করিয়া রহিলাম।"

কাজিসাহেব। যখন গহনা ও মোহার সিন্দুক লইয়া যায়, তখন কাহাকেও চিন্‌তে পারিয়াছিলে কি?

শ্যামার মা। তখন ঘরের আলো নিবিয়া গিয়াছিল, আমি কাহাকেও চিনিতে পারি নাই।

শ্যামার মা এবং অপর দুই একজন ব্যতীত সকলের সাক্ষ্য প্রকাশ হইল—যে প্রবোধ কাশী গিয়াছিল, সেইদিন রাত্রে আসিয়াছে। অধিকাংশ ভাল ভাল সাক্ষীই প্রবোধকে নির্দ্দোষী বলিতেছে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া হাকিম প্রবোধকে পাঁচ হাজার টাকার জামিনে খালাস দিয়া মোকর্দ্দমা মুলতুবী রাখিলেন। প্রবোধ হাসিতে হাসিতে গৃহে গিয়া জননীর পদধূলী গ্রহণ করিল। জননী স্নেহাশীর্ব্বাদ করিলেন।

পুত্রহারা জননী পুত্রের বিড়ম্বনার কথা শুনিয়া অবধি

আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি প্রবোধকে বাৎসল্য স্নেহে এতদূর আবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, তাহার ভীষণ চরিত্রও সে স্নেহে মগ্ন হইয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। জননীকে সাক্ষাৎ দেবী প্রতিমা জ্ঞানে, তাঁহার আজ্ঞায় সে পাপের পথ হইতে একেবারে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল। তারপর দীক্ষা গ্রহণের দিন হইতে সেই মহাপুরুষ যোগানন্দের উপদেশে প্রবোধ আর সে প্রবোধ নাই—এখন তাহার চরিত্র পরিশুদ্ধ হইয়াছে, সে মানুষ হইতে শিখিতেছে।

ধর্ম্মকে হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিলে—জগতে সে কোন বিপদকে বিপদ বলিয়া জ্ঞান করে না; সকল বিপদকে পরীক্ষার কেন্দ্র মনে করিয়া সে আত্মহারা হয় না। সে সকল বিষয়েই ভগবানের বিভূতি দেখিয়া সকল কষ্ট, সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া যায়, ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইলে মানুষের দৃঢ়তা যে বেশী হইবে—তাহার আর বিচিত্র কি? জগতে পশুবল অপেক্ষা ধর্ম্মবলই যে মহাবল।

পুত্র আজ কয়েক দিন ভাল আহার করিতে পায় নাই; জননী সেই জন্য স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পুত্রকে আহারাদি করাইলেন। একেই ত প্রবোধের শরীরশোভা অতি পরিপাটী ছিল, ভগবান্ ত তাহাকে সৌষ্টবান্বিত করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সুন্দর দেহে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়া তাহা এত সুন্দর হইয়াছে যে, তাহার দিকে তাকাইলে আর নয়ন ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। ঘোর ঘনঘটার পর আকাশ যেমন সুনির্ম্মলভাবে প্রতিভাত হয়, তখন যেমন আকাশের

শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত হয়, আজ প্রবোধের দৈহিক লাবণ্য কলুষ-মেঘাবরণ-পরিমুক্ত হইয়া যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আহারাদির পর সায়াহ্নে প্রবোধ জননীসহ প্রাসাদশিখরে সমাসীন হইয়া নানাবিধ ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতেছেন। আর জননী অন্যমনে পুত্রের সেই সুধামাখা বচনাবলী শ্রবণ করিতেছেন।

এই কি সেই প্রবোধ! যে অহরহঃ মদিরা পানাসক্ত হইয়া নানাপ্রকার কুকর্ম্মে লিপ্ত থাকিত! এমন দিন নাই, যে দিন প্রবোধ একটী না একটী ভয়ানক দুষ্কর্ম্মের অবতারণা করিয়া আপনার চরিত্রকে কলঙ্ক-কালিমায় বিমলিন না করিত; এই কি সেই প্রবোধ! আহা! সেই দুর্বিনীত প্রবোধ আজ কেমন করিয়া এ পবিত্রভাবে সুসজ্জিত হইল; কে তাহার পাপ-তমসাচ্ছন্ন-হৃদয়-গগনে পুণ্য-চন্দ্রের পূতজ্যোতিঃ বিকশিত করিল! পাঠক! চির পঙ্কিল-পাপ-কলুষিত হৃদয়ে প্রগাঢ় ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সুবিমল ছায়াপাত হইলে মানুষ এইরূপই হইয়া যায়, পাষণ্ড-চরিত্র পূর্ব্বকৃত পুণ্যবলে পরিবর্ত্তিত হইলে এইরূপই জ্যোতিষ্মান হইয়া থাকে। পাপীর প্রতি ভগবানের কৃপা এইরূপেই পতিত হয়। প্রবোধ যে একটী ভয়ানক খুনের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া জীবন-মরণের পথে দণ্ডায়মান, সে বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র চিন্তা বা ভয় নাই; সে নির্ভীক, এ জগতে আর কাহাকেও সে ভয় করে না। এ জগতে তাহার জননী ও গুরুদেব সহায় থাকিলে, জাগতিক সমস্ত আপদ বিপদ সে গোষ্পদের ন্যায় উত্তীর্ণ হইবে, এ বিশ্বাস সে হৃদয়ে দৃঢ়রূপে পোষণ করিতেছে, আর এই বিশ্বাসেই সে সকল চিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে।

প্রবোধের প্রতি কাত্যায়নীর আর কোনরূপ সন্দেহ না থাকিলেও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রবোধ! এই যে দুর্ঘটনায় তুমি জড়িত হইয়াছ,—ইহা কিরূপ, ধর্ম্ম-সাক্ষ্য করিয়া বল দেখি, এ পাপে তুমি লিপ্ত আছ কি না ?" প্রবোধ হাসিতে হাসিতে বলিল—"সাক্ষাৎ দেবীর সম্মুখে, তাহার পদস্পর্শ করিয়া বলিতেছি—আমি ইহার কিছুই জানি না, বোধ হয় পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য আমাকে এই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইতেছে। কিন্তু আমি এই পদপ্রসাদেই এতৎ সমস্তই তৃণ তুল্য জ্ঞান করি। মা! বুদ্ধি দোষে যাহা করিয়াছি, তাহার ত আর কোনও উপায় নাই; মা! তোমার পদস্পর্শ করিয়া বলিতেছি—আমি নিষ্পাপী। জননী! জীবন ত ক্ষণস্থায়ী, এ বিষয়ের জন্য বৃথা চিন্তা করিয়া আর কি করিব। দেবি! এক্ষণে আশীর্ব্বাদ কর, তোমার অমোঘ আশীর্ব্বাদে সুনিশ্চয় আমার মঙ্গল হইবে।"

কাত্যায়নী পুত্রকে ক্রোড়ে টানিয়া বলিলেন "প্রবোধ! কর্ত্তা মারা হইবার পর তোমার প্রতি তাকাইয়া আমি এখনও জীবিত আছি। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের তুমিই এখন আশা ও ভরসা। বৎস! তোমার উপর আমার আর কোন সন্দেহ হয় না। তুমি আত্ম-নির্ভর করিয়া গুরুর কৃপায় সংসারের সকল জ্বালা হইতে পরিমুক্ত হও। পতিপদে আমি যদি তিল-মাত্র ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকি, সেই ধর্ম্মবলে আজ তোমাকে আমি এ আশীর্ব্বাদ করিলাম।" প্রবোধ ভক্তি গদ্গদচিত্তে দেবী-চরণে মস্তক অবনত করিল। কয়েক দিনের বিষাদ অবসাদে মাতাপুত্রের শরীর কিছু অবসন্ন হইয়াছিল। অদ্য

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া, তাঁহারা সেদিনকার মত শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রকৃতি শীতলভাব ধারণ করিয়া যেন তাঁহার দুইটি ধর্ম্ম-প্রাণ জীবকে আপন সুশীতল অঙ্কে স্থান দান করিলেন।

জনক জননীর পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিতে পারিলে এ জগতে পুত্রের আর কোন চিন্তাই থাকে না। কিন্তু আজ-কাল আমরা সেই দেবোপম জনক জননীকে কিরূপভাবে দেখিয়া থাকি, কিরূপভাবে তাঁহাদের সেবা করি? আজকাল জনক জননীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন ত পদে পদেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের লাঞ্ছনা এখন শিক্ষিত সম্প্রদায় তাদৃশ দোষাবহ বলিয়া মনে করেন না। এইরূপ জ্ঞানের প্রাদুর্ভাবেই ত আমাদের দেশের এত দুর্গতি বাড়িতেছে।

রজনীযোগে যখন সমস্ত জগৎ সুষুপ্তির কোলে অচেতন, শ্রীধরের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় যখন জন-প্রাণীর সাড়া শব্দ নাই, তখন কি এক অপূর্ব্ব স্বপ্নাবেশে প্রবোধের নিদ্রাভঙ্গ হইল। কে যেন ঘুমঘোরে তাহাকে বলিল—"প্রবোধ! তোমার সুকৃতির সূত্রপাত হইয়াছে। যে মোকর্দ্দমায় তুমি জড়িত হইয়াছ, সে বিষয়ে তুমি যে নির্দ্দোষী, তাহা আমার জানিতে বাকী নাই, কিন্তু যে স্ত্রীপুরুষের প্রতি দুর্বৃত্তেরা অত্যাচার করিয়াছে, সেই নলিনাক্ষ ও নিরুপমা সাধারণ মনুষ্য নহে। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের মহিমা প্রচারকল্পে ভগবান্ তাহাদিগকে অসীম ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। এই কর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবীমাঝে একদিন তাহারা কর্ম্মবীর নামে অভিহিত হইয়া আশ্রমধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবে। উপস্থিত

বিপদে তুমি শীঘ্রই মুক্তি লাভ করিবে, কিন্তু তাহাদের সহিত সখ্যতা রাখিতে তিলমাত্র ক্রটী করিও না! মোকর্দ্দমায় মুক্তি লাভ হইলে সত্বর এখানে চলিয়া আসিবে। এখনও তোমার অনেক শিখিতে বাকি আছে।" প্রবোধ স্বপ্নে শ্রীগুরুর অপার্থিব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং তাঁহার প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিয়া ধন্য হইলেন। তাঁহার হৃদয় পূর্ব্বাপেক্ষা আরও দৃঢ়বলে বলীয়ান্ হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রবোধ জননীর নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত সকল আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। জননী বলিলেন—"বিপদে পড়িয়া পরীক্ষিত না হইলে মানবের বিশুদ্ধতা জন্মে না। তাহারই নিদর্শন আজ তোমার জীবন-নাটকে অভিনীত হইতেছে। এ ক্ষেত্রে তোমার জয় অবশ্যম্ভাবী।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

— ০ঃ*ঃ০ —

অব্যাহতি।

ষড়যন্ত্রকারিগণ মনে করিয়াছিল—প্রবোধের ন্যায় একজন ধনী সন্তানকে বিপদে ফেলিতে পারিলে, তাহাদের লাভ যথেষ্ট হইবে। প্রবোধ প্রাণের দায়ে কত টাকা খরচ করিবে। বিপদে ফেলিয়া বিপক্ষগণ মনে করিয়াছিল, প্রবোধ তাহাদের শরণাপন্ন হইয়া নিকটে আসিবে, কত সাধ্য সাধনা করিবে, শেষ বহু অর্থ দিয়া আমাদের মতি পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিবে।

তাহার পিতা জীবিত থাকিলে সকলের সকল আশাতেই ছাই পড়িত। শ্রীধর বাবু মোকর্দ্দমার তদ্বির করিতে বড়ই পরিপক্ক ছিলেন। সকল প্রকার মোকর্দ্দমা আজীবন করিয়া, তিনি সে বিষয়ে বিশেষ বিচক্ষণতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি জীবিত থাকিলে কাহার সাধ্য প্রবোধকে বিপদে ফেলিতে পারে। তাঁহার নামে প্রতিবাসিগণ কম্পান্বিত কলেবর হইত, কারণ তাঁহার ন্যায় দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ জমিদার তখন প্রায় দৃষ্টি-গোচর হইত না। এখন ত আর তিনি নাই, তাই তাঁহার মৃত্যুর পর প্রবোধকে দুশ্চরিত্র দেখিয়া এবং মৃত শ্রীধরের দুষ্কর্ম্মের প্রতিশোধ লইবার জন্য অনেকে এই মোকর্দ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল। পুত্রকে বিপদগ্রস্ত করিয়া মৃত পিতার প্রতিশোধ গ্রহণ করাই এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য। সকলেই

মনে করিয়াছিল—প্রবোধ ভয় পাইয়া অর্থব্যয়ে তাহাদের সাক্ষ্য ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিবে—কিন্তু তাহা হইল না।

মাতুল শ্যামসুন্দর বাবুও আইন বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ, কাজেই কাহার কোন মন্তব্যই সুসিদ্ধ হইল না। প্রবোধ অবাধে জামিনে খালাস হইল. ইহা দেখিয়া বিপক্ষ পক্ষ সকলেই চমকিত হইয়া গেল। সকলেই আগামী বিচার-দিনে যাহাতে কোনও প্রকারে মোকদ্দমা নষ্ট না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেকেই অনুমান করিতে লাগিল, যখন জামিন মঞ্জুর হইয়াছে, তখন মোকর্দ্দমার ভবিষ্যৎ ভাল নহে। বিপক্ষদল স্বয়ং সরকার বাহাদুর, তাহাদেরও তদ্বিরকারকের অভাব ছিল না। তাহারাও প্রাণপণে মোকর্দ্দমায় জয়লাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল. দারোগা ও কাজি সাহেব পাড়ার লোকের মুখে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এখন এ বিষয়ে কোনও প্রকার ঔদাস্থ প্রকাশ করিলে, সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হইবে, কাজেই যত্নের সম্ভব অনুষ্ঠানের ক্রটী হইল না।

দ্বিতীয় শুনানীর দিন উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষই সদল-বলে উপস্থিত। আসামীও হাজির। যথা সময়ে বিচারপতি বিচারাসনে সমাসীন হইলে বিচার আরম্ভ হইল। তুমুল মোকর্দ্দমা, বহু আইনজ্ঞ উকীল, আসামীর পক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। বিপক্ষ-পক্ষের পক্ষ সমর্থনেরও কিছুমাত্র ক্রটী নাই।

আজ সাক্ষীগণের জেরা হইবে, প্রধান সাক্ষী শ্যামার মায়ের তলপ হইল। কিন্তু সে দিন প্রাতঃকালেই দর্শন দিয়া শ্যামার

মা কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, বহু অনুসন্ধানেও তাহাকে কেহ দেখিতে পাইল না—সে আসিয়াছিল—"বাহিরে যাই বলিয়া" সেই যে গিয়াছে, আর আসিয়া উপস্থিত হয় নাই—তাহার কত অনুসন্ধান করা হইল, কতস্থানে লোক পাঠান হইল, কিন্তু কুত্রাপি তাহাকে পাওয়া গেল না—শেষে তাহার উপর শমন বাহির হইল। দ্বিতীয় সাক্ষী তলপ করা হইল। দ্বিতীয় সাক্ষী গ্রাম্য চৌকীদার ঘনশ্যাম নস্কর, শ্রীধরের উপর তাহার বড়ই আক্রোশ ছিল, কারণ তাহার একবন্দে একবিঘা লাখরাজ চাষের জমী শ্রীধর কাড়িয়া লইয়াছিল। প্রবোধও যে পিতার সহিত তাহার সম্পত্তি অপহরণে যোগদান করে নাই, তাহাই বা কে জানে? এ সময় সেও প্রতিশোধ লইতে ছাড়িল না—সেও সাক্ষ্য দিয়া তাহাকে বিষম বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে। শ্যামার মার অভাবে তাহাকেই সাক্ষীর কাটগড়ায় দাঁড় করান হইল। আসামী পক্ষের উকীল হুজুরের অনুমতি লইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"ঘনশ্যাম! যখন তুমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হও, তখন রাত্রি কত।"

ঘনশ্যাম। তখন রাত্রি ১১টা, সবে মাত্র দুর্য্যোগ থামিয়াছিল; আমি গোলমাল শুনিয়া তথায় দৌড়িয়া গেলাম।

উকীল। ইতিপূর্ব্বে কোথায় ছিলে?

ঘনশ্যাম। সন্ধ্যার সময় আমি বিবাহ বাটীতে ছিলাম; তারপর আমি অপর গ্রামে নিজের কার্য্যে গমন করিয়াছিলাম। আসিবার সময় ঝড়বৃষ্টি বেশী হওয়ায়, আমি বাঁকার ঘাটে মন্দির মধ্যে আশ্রয় লইয়া থাকি, তখন প্রায় রাত্রি ৯টা, আমি

দেখিয়াছিলাম রুদ্রপুরের বড় রাস্তা দিয়া কয়েকজন লোক লাঠি হস্তে বিবাহ বাটীর দিকে আসিতেছিল, সঙ্গে একটী লণ্ঠন ছিল বটে—কিন্তু তাহার আলো এত ক্ষীণ যে তাহাদের সঙ্গে একজন বাবু বেশধারী কে ছিলেন, তাহা চিনিতে পারা যায় নাই। আমি শ্রীধর বাবুর বাটীর নিকট হইতে আসিবার সময় তাহাদিগকে উক্ত বাটীতে সজ্জিত হইতে দেখিয়াছিলাম।

উকীল। তুমি যখন তাহাদিগকে ঐরূপ ভাবে যাইতে দেখিলে, তখন তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে না কেন?

ঘনশ্যাম। সেরূপ ঝড় বৃষ্টিতে উত্তর পাওয়া অসম্ভব এবং আমার আরও বিশ্বাস হইল যে প্রবোধ বাবু নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে বিবাহ বাটীতে আসিতেছেন। তাঁহাকে আর জিজ্ঞাসা করিব কি? তাঁহাদের মধ্যে যে ঝগড়া বিবাদ ছিল, তাহা মিটিয়া গিয়াছে—ইহা আমি অনেকদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম।

উকীল। আচ্ছা। তাহার কয় ঘণ্টা পরে এই সকল কাণ্ড ঘটিয়াছিল, ঠিক বলিতে পার কি?

ঘনশ্যাম। আমি যখন সংবাদ পাইলাম, তখন রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিয়াছে। আন্দাজ একঘণ্টা পরে।

ইহার পর পুনরায় কয়েকজন ভদ্রলোকের জেরা করা হইল, তাঁহারা পূর্ব্ববৎ সমস্তই বলিলেন।

প্রবোধের পক্ষে এ অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র-মূলক, তাহা হাকিমের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল, প্রবোধ যে এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট নহে; তাহার উপর যে মিথ্যা দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই এবং ইহার মূলে যে শ্যামার মা একজন বিশিষ্ট অপরাধী, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে,

অন্য জেরায় তাহাকে পরাভূত করা হইত। কিন্তু মোকর্দ্দমার অবস্থা ভাল নহে, বুঝিতে পারিয়া সে পলায়ন করিয়াছে। অন্য উপস্থিত থাকিলে তাহাকে নিশ্চয়ই শ্রীঘরে গমন করিতে হইত, অনর্থক একজন নিরপরাধী বিশিষ্ট ভদ্র লোককে ডাকাতীর অপরাধে অপরাধী করায় বিষম দণ্ডভোগ করিতে হইবে ভাবিয়া, সে গুপ্ত ভাবে পলায়ন করিয়াছে।

শ্যামার মাকে ধরিতে পারিলে এ বিষম বিষয়ের গুপ্ত রহস্য সকল প্রকাশ হইবে, এইজন্য তাহাকে ধৃত করিবার জন্য একজন ভাল গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়া—হাকিম প্রবোধকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন। বিপক্ষ পক্ষের মুখে চুণকালি পড়িল। যাহারা প্রবোধকে জীবন মরণের পথে দাঁড় করাইতেছিল, এক্ষণে বিচারের ফলাফল দেখিয়া তাহারা বিষণ্ণ মনে গৃহে গমন করিল। ধর্ম্মের জয় হইল, স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলেই বুঝিল— প্রবোধ নির্দ্দোষী।

গৃহে আসিয়া প্রবোধ জননীর পদধূলী গ্রহণ করিল। জননী অদ্যকার এই শুভ সংবাদ শ্রবণে প্রাণে অপার আনন্দ অনুভব করিলেন। ভগবানের নিকট পুত্রের জন্য কায়মনে মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

কাত্যায়নী এতদিন সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হইতে-ছিলেন। পুত্রের পূর্ব্ব চরিত্র স্মরণ করিয়া তিনি সময়ে সময়ে কথঞ্চিৎ বিমনাও হইতেন। আজ নিষ্কলঙ্ক চরিত্র প্রবোধ ধর্ম্মাধিকরণে নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়া যখন হাসিতে হাসিতে গৃহে আসিল; জননী দুই হাত তুলিয়া তখন তাহার শিরে মঙ্গলময় হস্ত প্রদান করিলেন। প্রাণ খুলিয়া যখন ইষ্টদেবতার

নিকট তাহার দীর্ঘ-জীবন প্রার্থনা করিলেন, পুত্রকে ক্রোড়ে টানিয়া যখন তাহার মস্তকাঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিলেন; তখন প্রবোধের সকল ভাবনা, সকল মানসিক যন্ত্রণা তিরোহিত হইল। এখন জননীকে সুখী করাই প্রবোধের জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়াছে, কারণ গুরুদেব বলিয়া দিয়াছেন—"পিতা মাতাই যে ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি। সন্তানের পক্ষে জনক জননীই যে সাক্ষাৎ দেবতা, তাহা তিনি বেশ ভাল করিয়া প্রবোধকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।" আজ জননীর সন্দেহ অপনোদন করিতে পারিয়া সে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিল, জননীর চির-স্থির স্নেহ-তটিনীর স্নিগ্ধ-বারিরাশিতে তাহার জীবন-মরু সুশীতল করিতে লাগিল। প্রবোধের অব্যাহতি লাভে কাত্যায়নী শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাইলেন। রুদ্রপুরের স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলকেই নিমন্ত্রণ করাইয়া ভোজনের ব্যবস্থা করা হইল।

প্রবোধের হৃদয় এখন আর তাদৃশ ক্ষুদ্র নহে। সে আর এখন জগতের কাহাকেও শত্রু বা মিত্র রূপে জ্ঞান করে না, তাহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইয়াছে। জগদীশ্বর ভিন্ন জগতে আর কেহ কর্ত্তা নাই, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই যে জগতে সকল কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে, তাহা সে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। পূর্ব্বকৃত সঙ্গদোষে যে তাহাকে এই কয়েকদিন কষ্টভোগ করিতে হইল, তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছে। এইজন্য সে একমাত্র জননী আর শ্রীগুরুর সঙ্গ ব্যতীত, আহারে বিহারে তাঁহাদের প্রসঙ্গ ব্যতীত, অন্য সঙ্গ প্রসঙ্গ করিতে আর ইচ্ছা করিত না।

এ সংসার তাহার পক্ষে কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে

লাগিল। 'এখানকার সমস্ত পাপ পরিপূর্ণ, সমস্তই অশান্তিময়, কেবল জননীর পাদপদ্ম ও গুরুদেবের সুধামাখা উপদেশাবলী এ সংসারের সার-বস্তু, হৃদয়ে শান্তির পবিত্র প্রস্রবণ! জগতে কাহারও প্রতি আর প্রবোধের বিশ্বাস না থাকিলেও—সে একবার নলিনাক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার নিকট পূর্ব্বকৃত আচার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। তাঁহাকে পূর্ব্বে কত অপমান করিয়াছিল, মোহবশে তাঁহার অনিষ্ট সাধনে প্রবোধ প্রাণপণ করিয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাকে পাইলে একবার প্রাণের জ্বালা জুড়াইয়া লইবে। কিন্তু কই, নলিনাক্ষ ত এখানে নাই, আর মহামায়া ও নিরুপমা এখন শয্যাগত, জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। প্রবোধ তাঁহাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে পারিল না বলিয়া বড়ই ক্ষুণ্ণ হইল। এইবার গুরুদেবের নিকট যাইবার জন্য তাহার প্রাণ বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু তিনি এখন কোথায় আছেন, তাহার ত স্থিরতা নাই। এইজন্য জননীর স্নেহ-ছায়ায় তাহার চির-তাপিত প্রাণ শীতল করিতে লাগিল এবং অহরহঃ শাস্ত্রাদি পাঠে হৃদয়ে প্রভূত জ্ঞান লাভ করিতে আরম্ভ করিল। ভগবান যাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন, তাহার পরিবর্ত্তন এইরূপ সত্বরই সম্পাদিত হইয়া থাকে। শিক্ষা-দীক্ষায় এরূপ আশু ফললাভ সম্ভবপর নহে।

প্রবোধচন্দ্র গুরু সহবাসে ৺কাশীধামে বাস করিবার সময় ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের বিষয় তাঁহার মুখে প্রায়ই শুনিত। সাধন বিষয়ে নীলরতন যে একজন বিশেষ উন্নত ব্যক্তি ছিলেন—সংসারে থাকিয়া প্রকৃত যোগীর ন্যায় কার্য্য করিতে

রুদ্রপুরে একমাত্র নীলরতনই যে সক্ষম হইয়াছিলেন—যোগানন্দ বার বার সে বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতেন। তদীয় কন্যা নিরুপমা যে নলিনাক্ষের সহিত পরিণীত হইবে, এ বিষয় কাত্যায়নীর মুখে শুনিয়া, তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি জানিতেন এবং মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবিতাবস্থায় গুরুদেবের নিকট নলিনাক্ষকে জামাতা করিবার অনুমতিও পাইয়াছিলেন। একদিন যোগানন্দও নলিনাক্ষের প্রগাঢ় ধর্ম্ম বিশ্বাস, আত্মত্যাগ দেখিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। নলিনাক্ষের ন্যায় ঈশ্বর-বিশ্বাসী যুবক প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। নিরুপমাও তদ্রূপ, এই দুইটী প্রাণী বিবাহ সূত্রে একত্র গ্রথিত হইলে, সংসারের যে মঙ্গল সাধিত হইবে—তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

আজ তাহাদের এরূপ অবস্থা দেখিয়া প্রবোধচন্দ্র বাস্তবিক মর্ম্মাহত হইল। ইতিপূর্ব্বে তাহাদের প্রতি যে অসদাচরণ করিয়াছিল, তজ্জন্য অনুতাপ করিতে লাগিল। এইজন্য একবার তাহাদের দেখা পাইলে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ধন্য হইবে—কিন্তু তাহা ত হইল না, কোন্ পাপিষ্ঠ তাহাদের এরূপ অবস্থা করিল! প্রবোধ আর চিন্তা করিতে পারিল না, পূর্ব্বের ঘটনাগুলি স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয়ে যেন বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

পতি-পত্নী।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতীত হইয়া প্রায় ছয় মাস পরে নিরুপমা সম্পূর্ণরূপে রোগ মুক্ত হইলেন। যে বিষাক্ত দ্রব্য আঘ্রাণ করাইয়া দস্যুগণ তাঁহাকে হত-চেতন করিয়াছিল, সেই বিষ নিরুপমার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া বিষম ব্যাধির উৎপত্তি করিয়াছিল। সকলেই ভাবিয়াছিল—নিরুপমার ন্যায় সুখে লালিত পালিত, ধার্ম্মিকা রমণী অধার্ম্মিক দস্যুগণের স্পর্শে এ দারুণ কষ্টে যে দুরন্ত রোগে জড়িত হইয়াছেন, তাহা হইতে আর এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না। কিন্তু বহু সুচিকিৎসকের চিকিৎসায় আজ নিরুপমা রোগ মুক্তা হইয়া রাহু-মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। নিরুপমা আবার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। আর মহামায়া রোগ মুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি নষ্ট-স্বাস্থ্য আর পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেন না—প্রত্যহই একটা না একটা উপসর্গ আসিয়া তাঁহাকে ক্রমশঃ শ্রীহীন করিতে লাগিল।

নিরুপমা ও সুকুমারী প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। 'পিসীমা কিসে রোগ মুক্ত হন, কিসে তাঁহার শারীরিক দুর্ব্বলতা নষ্ট হয়—তজ্জন্য তাঁহারা পরিশ্রমের কিছুমাত্র ক্রটী করিলেন না। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে এ দারুণ আঘাত-জনিত ক্ষত আর কিছুতেই আরোগ্য হইতেছে

না। অনুক্ষণ তাহার যন্ত্রণা, তাহা হইতে রক্তস্রাব কিছুতেই বন্ধ হইল না, বুঝি ইহাই তাঁহার সঙ্গের সাথী হইয়া রহিল।

পত্নীর আরোগ্য লাভে নলিনাক্ষ একটু অবসর পাইলেন। তিনি এইবার নির্লিপ্তভাবে সংসার করিতে লাগিলেন এবং যদৃচ্ছাক্রমে ধর্ম্মের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিয়া ধন্য হইতে লাগিলেন। তিনি কখন রুদ্রপুরে, কখন নিজ আশ্রম নদীয়ায় অবস্থান করিয়া আপনার আত্মোন্নতির চেষ্টায় তৎপর হইলেন।

আমরা আজকাল স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যেরূপ ভালবাসা সচরাচর দেখিয়া থাকি, নলিনাক্ষ ও নিরুপমার ভালবাসা সে ধরণের ছিল না। ইহাঁদের ভালবাসা ঠিক সহধর্ম্মিণীর ভাল-বাসার ন্যায় ধর্ম্ম ভাব পূর্ণ, কামাতুরা রমণীর ন্যায় কামভাব এ ভালবাসা মধ্যে স্থান পাইত না। নিরুপমা সৌন্দর্য্যে অপ্সরী বিনিন্দিত হইলেও তাহাতে চঞ্চলতার ছায়াপাত হয় নাই, সেই হরিণ-নয়না কামিনীর চক্ষে বিদ্যুদমে স্ফুরণ-চকিত কটাক্ষপাত ছিল না, সে চক্ষু দুটী প্রশস্ত সুঠাম, অতিশয় শান্ত জ্যোতিঃ বিশিষ্ট। নিরুপমার অনুপম সৌন্দর্য্যের সহিত ধর্ম্মভাব মিশ্রিত থাকাতে তাহা সাধুর চক্ষে দেবীভাবে প্রতি-ফলিত হইয়া প্রাণে স্বর্গীয় ভক্তিভাব আনিয়া দিত, আর অসাধুর চক্ষে তাহা ভীমা ভয়ঙ্করীভাবে প্রাণ-ভীতিকর বিভী-ষিকা আনিয়া, তাহাকে আতঙ্কে দিশাহারা করিয়া দিত। একে নিরুপমার অপরূপ সৌন্দর্য্য রাশি, তাহাতে আবার যৌবনের শুভসংযোগ—এ রূপের বর্ণনা লেখনীর দ্বারা সমাধা হওয়া অসম্ভব, তবে যিনি স্বর্গের সুষমায় সুশোভিত দেবী প্রতিমা কখন নয়নগোচর করিয়াছেন—তিনি বুঝিবেন এরূপ

কিরূপ অপরূপ, এ রূপ কিরূপ স্বর্গীয় মহিমায় মহিমান্বিত। সাধু পাঠকবৃন্দ! তোমরা নলিনাক্ষের শান্ত জ্যোতির্বিশিষ্ট ধর্ম্মময় জীবনের কর্ম্মময় প্রতিভা অবলোকন করিয়াছ, তাঁহার রূপের ও গুণের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সাধক আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছ—আর তাঁহার এই পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীকে দেবী আখ্যায় আখ্যায়িত করিতে কি কুণ্ঠিত হইবে? মানব-জীবনে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রতিফলিত করিতে পারিলেই ত এই মানুষ দেবতা হইতে পারে। আর নলিনাক্ষের ন্যায় সাধুজনের পবিত্র স্পর্শে, তাঁহার ধর্ম্মময় সহবাসে নিরুপমার স্বর্গীয় শোভা যে সমধিক সমুদ্ভাসিত হইবে—তাহাতে আর বিচিত্র কি? যেখানে গুণ জ্ঞান ও গুরুজনে ভক্তি, সেইখানেই পারিবারিক সুখ সম্যক্ ফুটিয়া থাকে।

নলিনাক্ষ আজ সংসারী। ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া নির্লিপ্তভাবে ঠিক গীতার উপদেশ প্রতিপালন করিয়া সংসার-কার্য্যে নিযুক্ত—তাই সংসারে কর্ম্মই তাঁহার প্রধান অবলম্বন। পরোপকার, অমায়িকতা, সত্যনিষ্ঠা, সেবাব্রত প্রভৃতিকে নলিনাক্ষ জীবনের সার-সর্ব্বস্ব করিয়া সংসারাশ্রমে যথার্থ নিষ্কামী যোগীর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সংসারে কামিনী কাঞ্চনই অধঃপতনের মূল। এই কামিনী কাঞ্চনই মানুষকে নরকে নিমগ্ন করিতে পারে—আবার সংযমী হইয়া এই কামিনী কাঞ্চনের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে—এই কামিনী কাঞ্চনই আবার মানুষকে স্বর্গের পন্থা দেখাইয়া দিতে সক্ষম হয়। পাকা মাঝি না হইলে এই সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে না; এখানে পাকা হইতে হইলে ভিত্তি পাকা

করা একান্ত আবশ্যক। জীবনের ভিত্তি পাকা করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্যের অনুসরণ করা আবশ্যক, ব্রহ্মচারী হইয়া চারিটী আশ্রমে সম্যকৃরূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে না পারিলে—তাহার উন্নতির আশা নাই।

ব্রহ্মচর্য্যে সুদৃঢ় না হইয়া তুমি কামিনী কাঞ্চনে যতই আত্ম-হারা হইয়া মজিয়া পড়িবে, তোমার ইহকাল পরকাল ততই নষ্ট হইবে—তুমি মনুষ্যত্ব হারাইবে। ভক্ত কবি তুলসীদাস বলিয়াছেন—

দিন্‌কা মোহিনী রাতকা বাঘিনী
পলক পলক লহু চোষে।
দুনিয়া সব বাওরা হোকে
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।

কিন্তু সংসারী হইয়া এইরূপ বাঘিনী পুষিয়া না রাখিলে ত সংসার চলে না—সংসারের শ্রী থাকে না! সংসারে কামাদি রিপুচয় যখন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মানুষকে আক্রমণ করে, তখন সহজে প্রাণ রক্ষা করিতে হইলে, এই বাঘিনীর সাহায্য গ্রহণ করা ত একান্ত আবশ্যক।

সংসারের ভীষণ সংগ্রামে পড়িয়া যখন তুমি আত্মহারা, দিশেহারা হইয়া জীবন দুর্ব্বহ বলিয়া মনে করিবে, তখন এই শক্তি-স্বরূপিনী বাঘিনীর শক্তি তোমার প্রধান সহায়রূপে পরিগণিত হইলে আর কোন ভাবনাই থাকিবে না—তুমি অব-হেলায় সে সংগ্রামে জয়লাভ করিবে। সংসারাশ্রমে মানবকে যে সকল কার্য্য করিতে হয়, তৎসমস্তই ধর্ম্মকার্য্য। এই ধর্ম্মকার্য্যের সহায়রূপে রমণীগণ সহায়তা করেন বলিয়া স্ত্রী সহধর্ম্মিণীরূপে

অভিহিতা হইয়া থাকেন। তবে যদি তোমার দোষে এই দেবী-স্বরূপিনী রমণী দানবী আকার ধারণ করে, তাহা হইলে সে দোষ কাহার? স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণীরূপে, দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা করা ত স্বামীর কার্য্য, স্বামী যদি তাহা করিতে না পারেন—তাহা হইলে সে দোষ কাহার? সে জন্য তোমাকে ত স্বখাদ সলিলে ডুবিয়া মরিতেই হইবে। তুমি যদি ধার্ম্মিক সংযমী হও—তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে সৎশিক্ষা দাও, সৎপথের পথিক করিতে চেষ্টা কর—তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই তোমার আদর্শে গঠিত হইয়া কালে কুললক্ষ্মী, অসীম মহিমাময়ী দেবীরূপে পরিগণিতা হইবে। কোমল-স্বভাবা রমণীকে আপনার মত করিয়া লইতে পারিলে, তাহারা সহজেই বাঘিনীর ন্যায় হিংস্র স্বভাব ছাড়িয়া সৎস্বভাব-সম্পন্না হইতে পারে।

সংসারাশ্রমে স্ত্রী পুরুষের দায়িত্ব যারপর নাই গুরুতর। এইজন্য সংসারাশ্রমের তুল্য আশ্রম আর নাই বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। অগ্নির মধ্যে থাকিয়া আত্মরক্ষা করা, স্ত্রীকে নিকটে রাখিয়া সংযমী হওয়া, কামিনীর সহবাসে থাকিয়া কাম-জয় করাই যথার্থ পুরুষত্ব, সংসার-সংগ্রাম-জয়ী বীরের বীরত্ব।

মুসলমান রাজত্বের শেষে যখন দেশে চারিদিকে অশান্তির অনল প্রজ্জ্বলিত, তখনও ভারতে আশ্রমধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, হিন্দু আপনার সনাতন ধর্ম্মের মহিমা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিত। তখন চারিদিকে অধর্ম্ম, চারিদিকে ডাকাতি, মারামারি—সংসারী মানব ধনপ্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত, তথাপি এখনকার মত অধর্ম্মের স্রোতে দেশ এরূপভাবে ভাসিয়া যায় নাই।

এখন ইংরাজ রাজত্বে ত তাদৃশ মারামারি কাটাকাটি নাই। ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা ও রাজার ইচ্ছা বিরুদ্ধ, তবে এখন হিন্দুর মতিগতি এরূপ বিকৃত ভাবাপন্ন হইতেছে কেন? ধর্ম্মে হীনবল হইয়াই ত আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ, আমাদের জাতি দিন দিন এত অধঃপতনের পথে দ্রুত ধাবিত হইতেছে। তখন দেশে অরাজকতা বর্ত্তমান ছিল বটে—কিন্তু দেশের মতিগতি এত মন্দভাব ধারণ করে নাই, ধর্ম্মে সকলেরই আস্থা ছিল—তবে রাজার দোষে, সুশাসনের অভাবে লোকে ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারিত না, সদাই সশঙ্কিত থাকিত।

ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ নলিনাক্ষের হৃদয় ত কাহারও ভয়ে ভীত হইত না, পার্থিব কোন চিন্তায় ও আকুল হইয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিত না, তাই তিনি স্বধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন—কারণ মনের বলই বল, ধন বল জন বল মানুষকে সকল সময়ে প্রকৃত সাহস প্রদান করিতে পারে না। নলিনাক্ষের মনের বল ছিল—তাই তিনি কোন বিষয় দৃক্‌পাত করিতেন না। নলিনাক্ষের অন্নচিন্তা নাই, ধনের তাদৃশ অভাব নাই, দরিদ্র ভাবে জীবন যাপন করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইত, নলিনাক্ষ তৎসমস্তই পরের জন্য, দরিদ্র স্বদেশবাসী ভ্রাতাগণের জন্য অকাতরে ব্যয় করিতেন। নলিনাক্ষের পিতৃ-সম্পত্তি, চাণকের সম্পত্তির ভার এবং রুদ্রপুরে তাঁহার শ্বশুরের সমস্ত সম্পত্তির ভার এখন ত্রিলোচন বিশ্বাসের উপর পড়িয়াছে। বৃদ্ধ ত্রিলোচন—নলিনাক্ষের ধর্ম্মভাব দেখিয়া বড়ই মোহিত হইয়াছিলেন। তিনি বা মহামায়া তাঁহার সৎব্যয়ে বাধা দিতেন না, নিরুপমার ত কথাই নাই। স্বামী যাহা করিবেন—স্ত্রী তাহার উপর কথা

কহিবেন কি? আর নলিনাক্ষ যে সব কার্য্য করেন—তাহাতে কাহারও কথা কহিবার শক্তি নাই। তাঁহার সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহার ধর্ম্মময় জীবনের কর্ম্ম দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত—কথা কহিবার শক্তি কোথায়!

নিরুপমা এখন আর, অলঙ্কার দ্বারা অঙ্গশোভা বৰ্দ্ধন করেন না, একে ত নিরুপমার সৌন্দর্য্যের নিকট অলঙ্কারের সৌন্দর্য্য ম্রিয়মান হইয়া থাকিত, তাহার উপর পাতিব্রত্য ও ধর্ম্মজ্ঞান তাঁহার রূপের জ্যোতিঃ স্বর্গের সুষমায় সুশোভিত করিয়াছিল। সে অঙ্গে অলঙ্কার পরিধান করিলে বরং তাহার ঔজ্জ্বল্যের লাঘব হইত। তিনিও স্বামীর ন্যায় ধর্ম্মকর্ম্মে—পরোপকারে মুক্তহস্ত ছিলেন। প্রতিবাসীর মধ্যে কে দারুণ অভাবে পতিত, কাহার কষ্ট হইতেছে, রূপচাঁদের দ্বারা তিনি প্রত্যহ তাহার সংবাদ লইতেন। যেমনি স্বামী তেমনি তাঁহার স্ত্রী—যেন হরগৌরী সম্মিলন। মা যেন অন্নপূর্ণারূপে অন্নদানে সদাই মুক্তহস্ত। এমন কি, অর্থ যদি সময়ে সময়ে টান পড়িত, আদায় হইতে বিলম্ব হইত সে সময় তিনি নিজের বাক্স হইতে অলঙ্কার লইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতেন। এরূপ কোমলতাময়ী রমণীরত্ন না থাকিলে কি হিন্দু সংসারের শোভা বৃদ্ধি হয়।

নলিনাক্ষ অতি অল্প দিনের মধ্যেই একজন আদর্শ সংসারী বলিয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে লাগিলেন। নলিনাক্ষের সংসারে সকল ব্যক্তিকেই প্রত্যহ ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া তবে জলগ্রহণ করিতে হইত। যাহার যেরূপ অধিকার, তাহাকে ততটুকু কাজ করিতে হইত। আপনি নলিনাক্ষ প্রত্যহ বেলা

দুইটা অবধি গৃহদেবতার অর্চনা করিতেন। নিরুপমা ও মহামায়া সেইরূপ ভাবেই তাঁহাকে আদর্শ করিতেন। বৃদ্ধ ত্রিলোচন ও রূপচাঁদ প্রভুর নির্দ্দেশ অনুসারে ধর্ম্মকর্ম্মে প্রগাঢ় আসক্তি প্রদান করিত। এইজন্য স্বর্গীয় নীলরতনের সুবৃহৎ পবিত্র অট্টালিকা সামান্য দিনের মধ্যে পুনরায় বিমল বিভায় বিভাসিত হইল—পূর্ব্বের ভাব নবীভূত হইয়া উঠিল। রুদ্রপুরে থাকিলে নলিনাক্ষ অধিকাংশ সময় নীলরতনের ঠাকুর বাটীতে পত্নীসহ একত্রে ধর্ম্মে কর্ম্মে কাল কাটাইতেন। রোগ-মগ্না পিসীমাতা এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদের শ্রীমুখে সুমধুর ধর্ম্মকথা কর্ণগোচর করিয়া ধন্য হইতেন। জ্যোতিষপ্রসাদ অবসরক্রমে প্রত্যহ তাঁহাদের ধর্ম্মকথামৃত পান করিতে নীলরতনের ঠাকুর বাটীতে আগমন করিতেন। সকলে মিলিয়া ধর্ম্মকথায় এবং শাস্ত্রালাপে জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিতেন, কেবল আত্মীয় স্বজন নহে। ঘটনাচক্রে যে একবার নিকটস্থ হইত, সেই ব্রহ্ম তেজ সম্পন্ন নলিনাক্ষের শক্তিতে মোহিত হইয়া যাইত। সকলেই ধর্ম্মকর্ম্মে মনোনিবেশ করিত। হায়! আজকাল এইরূপ সুব্রাহ্মণ আর নাই বলিয়াই, শীর্ষহীন ভারতীয় সমাজ ক্রমশঃই ভগ্নাবশেষ হইতেছে। যে হিন্দু সমাজের মূল ভিত্তি —বর্ণ ও আশ্রম, যে বর্ণ ও আশ্রমের প্রধান অবলম্বন সনাতন ধর্ম্মানুশাসন, যে ধর্ম্মানুশাসনের প্রবর্ত্তক শ্রুতি-স্মৃতিবীৎ ব্রাহ্মণ, সেই সকল ব্রাহ্মণ আমাদের আর নাই বলিয়াই সমাজ হতবল, হিন্দু-সমাজ আজ ঘোর দুর্দ্দশাগ্রস্ত। মস্তক-বিহীন সমাজ এইরূপে আর কতকাল টিকিবে? ব্রাহ্মণই হিন্দুধর্ম্মের বিধি-বিধান কর্ত্তা, এ জগতে একমাত্র ধর্ম্মই চিরস্থায়ী, অন্য কিছু

চিরস্থায়ী হইতে পারে না। শরীরের সহিত জাগতিক সমস্ত গুণাবলীই লোপ পায়। কেবল ধর্ম্ম—ইহকালে সুখশান্তি বিধান কর্ত্তা, লৌকিক কীর্ত্তি বিস্তার কর্ত্তা, আবার পরকাল নিস্তার কর্ত্তা মোক্ষদাতারূপে একমাত্র ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মপ্রাণ নলিনাক্ষ প্রত্যহ সকলকে ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

বিবাহের পর প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়াছে, নলিনাক্ষের একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। বড় আদরের নিরুপমার পুত্ররত্ন লাভ হইয়াছে; মহামায়া চির আকাঙ্ক্ষিত ধন পাইয়া আনন্দে বিভোর হইতে লাগিলেন। এতদিন তিনি বড়ই উন্মনা হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিরুপমার একটী পুত্ররত্ন দেখিয়া মরিতে পারিলেই তাঁহার জীবন সার্থক হয়। এতদিনে মা মহামায়া, মহামায়ার আশা পূর্ণ করিলেন।

নিরুপমা একটী সুকুমার পুত্ররত্ন লাভ করিলেন। পুত্রটী যেন অকলঙ্ক পূর্ণ শশী। পুত্রটী দেখিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল,—“এরূপ পুত্রলাভ পরম সৌভাগ্য না হইলে ঘটে না।” মহামায়া নিরুপমার পুত্ররত্ন কোলে লইয়া কত আদর করিতেন। তিনি পতিপুত্রবিহীনা, বহুকষ্টে নিরুপমাকে প্রতিপালন করিয়া সাধু চরিত্র নলিনাক্ষের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। আজ তাঁহার সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণার লাঘব হইল। তিনি মনে করিয়াছিলেন—তাঁহার যত নগদ সম্পত্তি আছে তাহা নিরুপমার পুত্র হইলে তাহাকে যৌতুক প্রদান করিবেন,

কিন্তু পাষণ্ড ডাকাতগণ তাঁহার সে সাধে বাদ সাধিয়াছে; তাঁহার সমস্ত ধন তাহারা লইয়া পলায়ন করিয়াছে, এক কপর্দ্দকও রাখিয়া যায় নাই। ইহার জন্য মহামায়া কতই মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। নলিনাক্ষ বলিলেন,—"পিসীমা! মনস্তাপ করিয়া কি হইবে—আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার অমোঘ আশীর্ব্বাদে সে দীর্ঘজীবী হউক, ধর্ম্মপথগামী হউক। আপনার আশীর্ব্বাদই অমূল্য; অর্থের দ্বারা কি আসে যায়।" জ্যোতিষ ও নিরুপমার আনন্দের সীমা রহিল না, তাঁহারা ভগবানের নিকট নবকুমারের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আজ ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আবাসে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। যে ভবন এতদিন নিরানন্দের আবাস ভূমি হইয়াছিল, যাহার প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিলে পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া সকলেই অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইত, এক্ষণে সেই নিরানন্দময় ভবনে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখিয়া সকলেই ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিল। পুরাতন ভৃত্য রূপচাঁদের আনন্দের অবধি নাই, সে যেন আজ হাতে স্বর্গ পাইয়াছে। যাহার সহিত দেখা হইতেছে, তাহারই সহিত আনন্দে একগাল হাসি হাসিয়া বলিতেছে—"ওগো! আমাদের নিরুর একটী ছেলে হয়েছে; আহা! ছেলেটী যেন পারুল ফুল। যেমনি বাপ মা, তার চেয়েও ছেলেটী সুন্দর হয়েছে। হায়! এ সময় যদি মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও মা জননী জীবিত থাকিতেন,—তাহা হইলে না জানি তাঁহাদের কত আনন্দ হইত।" এই বলিয়া বিরস বদনে আবার কত দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

ক্রমে ক্রমে পুত্রটী শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ছয় মাসে অন্নপ্রাশন কার্য্য মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইল। দীন দরিদ্রের পরিতোষ সাধনে, নিরন্ন জনগণের অন্নসংস্থানে প্রায় অষ্টাহ রুদ্রপুর আনন্দ কোলাহল পূর্ণ হইল। নলিনাক্ষ কেবল দরিদ্র ভোজনেই সিদ্ধহস্ত। যাহার নাই তাহার অভাব মোচনে তিনি যেমন সুখলাভ করিতেন, এমন আর কিছুতেই নহে।

মহামায়া দৌহিত্রকে লইয়া কত আমোদ আহ্লাদ করিতেন। তাঁহার উঠিবার ক্ষমতা না থাকিলেও শিশুকে নিকটে লইয়া কত আদর করিতেন, কত সুখের স্বপ্ন দেখিতেন; কিন্তু এ সুখ তাঁহাকে বেশী দিন ভোগ করিতে হইল না। একদিন পৌষ মাসের দারুণ শীতে মহামায়ার সামান্য জ্বর হইল— সকলেই মনে করিয়াছিল— মহামায়া শীঘ্রই আরোগ্য হইবেন; কিন্তু সেই জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া তিন সপ্তাহ পরে মহামায়াকে শমন ভবনের অতিথি করিল। নিরুপমা জগত অন্ধকার দেখিলেন। জননীর মৃত্যুজনিত শোকে তাঁহাকে তত অধীর করিতে পারে নাই, কারণ তখন তিনি অতি শিশু ছিলেন; জনকের আন্তরিকতায়, পিসীমাতার অপরিমিত স্নেহে, রূপচাঁদের আদর আপ্যায়নে নিরুপমা কিছু জানিতে পারেন নাই, হাসি খেলায় সে দুঃখের দিন সুখে কাটাইয়াছিলেন। পিতার শোক তাঁহাকে কতক পরিমাণে অধীর করিয়াছিল বটে; কিন্তু আজ মহামায়ার শোক তাঁহাকে ভয়ানক প্রকারে আক্রমণ করিল। রূপচাঁদ ও ত্রিলোচন তাঁহাকে কত বুঝাইলেন—তাঁহার সান্ত্বনার জন্য অহরহঃ সোণারচাঁদ পুত্রটীকে নিকটে রাখিয়া দিতেন; যতক্ষণ শিশু জননীর স্তন পান

করিতে করিতে বুকে পিঠে চাপড় মারিত, সেই কোমল আঘাতে নিরুপমার শোকদগ্ধ বক্ষস্থল যেন কতক পরিমাণে সুস্থ হইত; কিন্তু দুরন্ত শিশু ত অধিকক্ষণ ধরিয়া জননীর নিকট থাকিত না, স্তনপানে ক্ষুদ্র উদর পূর্ণ হইলেই সে হামাগুড়ি দিয়া ঘরের বাহিরে পলাইয়া যাইত। রূপচাঁদ দেখিতে পাইলে—আবার তাহাকে ধরিয়া আনিয়া মায়ের নিকট রাখিয়া যাইত—কিন্তু সে কতক্ষণ? অবোধ শিশু কি বুঝে যে মায়ের নিকট থাকিলে, তাঁহার সকল দুঃখ, সকল শোক নিমেষ মধ্যে তিরোহিত হইবে? নলিনাক্ষ এই শোকে দুই একদিন একটু ম্রিয়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু শিক্ষিত সাধু ব্যক্তিকে অনিত্য জগতের শোক দুঃখ, মায়া মমতা কি অধীর করিয়া রাখিতে পারে? নলিনাক্ষ পত্নীকে জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে বুঝাইয়া ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ করিয়া আনিলেন। আবার সংসারে সুখের তরঙ্গ রঙ্গভঙ্গে খেলা করিতে লাগিল।

নলিনাক্ষ বহুদিন হইল নদীয়ায় গমন করেন নাই। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কত সংবাদ দিয়াছিলেন। কত লোক পাঠাইয়াছেন; কিন্তু নলিনাক্ষ এখন সংসারী হইয়াছেন। সংসারে কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিয়া এতদিন তথায় যাইতে পারেন নাই! অদ্য আহারাদির পর নলিনাক্ষ বিশ্রাম করিতেছেন। নিরুপমা তাঁহার পদ সেবায় নিযুক্ত, মায়া মমতার প্রতিমূর্ত্তি শিশু বিছানার উপর একবার জননীর অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছে; মাথার কাপড় খুলিয়া দিতেছে জননী কৃত্রিম বিরক্তি সহকারে বলিতেছেন—"হাঁ খোকা! কি করিস্, একটু ঘুমাও না। এসময় কি বিরক্ত করে।"

নলিনাক্ষ বলিলেন—"খোকা তোমার ত এখন ন্যায়শাস্ত্রে তত পণ্ডিত হয় নাই, যে সময় অসময়, ন্যায় অন্যায় বুঝিবে? আয়রে খোকা আয় এইখানে ঝুপা করত বাবা! খোকা আর জ্বালাতন করিল না—এতক্ষণ সংগ্রাম করিয়া যেন পরিশ্রান্ত হইয়াছিল। পিতার আহ্বান মাত্রেই সে পার্শ্বে গিয়া শয়ন করিল এবং শুইবামাত্রই সে ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িল।

নলিনাক্ষ বলিলেন "দেখ নিরুপমা! বহুদিন হইল আশ্রমে যাই নাই, মহারাজ প্রায়ই সংবাদ পাঠাইতেছেন, আর গুরু-দেবের কোন সংবাদও পাওয়া যাইতেছে না—মন বড়ই খারাপ হইয়া গিয়াছে! আমার যেন আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না।"

নিরুপমা। কেন, প্রভুর কি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, কোথায় থাকিবেন তাহা বলিয়া যান নাই?

নলি। তিনি বলিয়াছিলেন,—পুষ্করে কিছুদিন থাকিবেন; কিন্তু মহারাজ পুষ্করে লোক পাঠাইয়াছিলেন, তথায় তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

নিরু। তবে কি ক'র্‌বে?

নলি। কল্য আমি একবার আশ্রমে যাইয়া মহারাজের সহিত দেখা করিয়া, ইহার একটা উপায় করিব; তাঁহার সন্ধান না পাইলে ত আর প্রাণ সুস্থির হইতেছে না।

নিরু। না হইবারই কথা; দেবতার অদর্শনে দেবভক্ত দম্পতী কত দিন স্থির থাকিতে পারে? গুরুদেবই ত আমাদের সব। তবে তুমি কি কল্যই আশ্রমে যাইবে?

নলি। কল্য কেন, আমি এখনি যাইতে প্রস্তুত আছি। প্রাণ যেরূপ খারাপ হইয়াছে, তাহাতে যে কোন উপায়ে

হউক তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে; তবে এক মোকর্দ্দমার দায়ে পড়িয়াই যে আমার সমস্ত নষ্ট হইল।

নিরু। আবার কিসের মোকর্দ্দমা, আমাদের আবার মোকর্দ্দমা কি?

নলি। সেই মোকর্দ্দমা, আসামী এখনও ত ধরা পড়ে নাই; জ্যোতিষ কাজির নিকট থানাতল্লাসীর প্রার্থনা করায়—কাজি সাহেব যে গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়াছেন, সে গোয়েন্দা আর কেহ নহে, আমাদের সৌদামিনীর স্বামী, ভুবনেশ্বর বাবুর জামাতা।

নিরু। তিনি কি গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করেন নাকি?

নলি। হাঁ! এখন—অনিল বাবু ঐ বিভাগে কাজ করিয়া বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার মত গোয়েন্দা আর নাই বলিলেই হয়।

নিরু। তা হক্ না, তাহাতে আর তোমার কি?

নলি। আমার নদীয়ায় বিলম্ব হইবে—ইতিমধ্যে যদি—কোন সন্ধান হয়, তাহা হইলে যে আমাকে চাই; সংসারী হইয়া এই সকলই ত ধর্ম্ম-পথের বিরোধী।

নিরু। জ্যোতিষ বাবুর সহিত একটা বন্দোবস্ত করিয়া তুমি চলিয়া যাও; আমাদের ও সকল বিষয়ে অত জড়ীভূত থাকা হইবে না।

নলি। তাহাই হইবে; রৌদ্র পড়িয়াছে, জ্যোতিষও এতক্ষণ বাটীতে আসিয়াছে, আমি একবার তাহার নিকট যাইয়া ইহার একটা প্রতিকার করিয়া কল্যই আশ্রমে যাইব। এই বলিয়া নলিনাক্ষ জ্যোতিষের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। নিরুপমাও নীচে আসিয়া গৃহ-কর্ম্মে মন দিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

মাতৃ-বিয়োগ।

পৌষ মাসের দারুণ শীত। এক্ষণে রজনী প্রভাত হইয়াছে, বালার্ক কিরণ বৃক্ষ-শীর্ষে, অট্টালিকা-ছাদে পতিত হইয়া লোকের মনে আশার সঞ্চার করিতেছে, সকলেই মনে করিতেছে—সূর্য্য কিরণ ধরণী পৃষ্ঠে পতিত হইতে আর বিলম্ব নাই। গ্রামের বালকগণ কাপড়ে মুড়ি লইয়া চিবাইতে চিবাইতে সমস্ত দেহ একখানি রঙ্গিন গাত্রবস্ত্রে আবৃত করতঃ কম্পান্বিত কলেবরে পাঠশালাভিমুখে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে; তাহাদের বগলে লিখনোপযোগী তাল-পত্রের তাড়া একটী ক্ষুদ্র মাদুর মণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতেছে। প্রথম বালক প্রত্যেক বাটী হইতে সহযাত্রীদিগকে ডাকিয়া লইয়া দলবদ্ধ হইতেছে; কতক-গুলি ছাত্র হয় ত, খোলা জায়গায় রৌদ্রের উত্তাপে দেহ গরম করিবার মানসে দাঁড়াইয়া "আয় রোদ্দুর টেনে, ছাগল দেবো মেনে" ইত্যাদি গ্রাম্য গীত গাহিয়া রৌদ্রের আবাহন করি-তেছে। রুদ্রপুরের পথে এখনও তাদৃশ লোক সমাগম হয় নাই। সরোবর সোপানে এখনও পুরস্ত্রীগণের অলঙ্কারের ঝনাৎকার শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। কেবল গ্রাম্য বালকগণের সরল প্রাণের তরল কলরব শ্রুত হইতেছে, আর কচিৎ কোন রাস্তায় দুই একজন কৃষকের গো-তাড়ন শব্দ শুনা যাইতেছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুবৃহৎ অট্টালিকার সিংহ-

দ্বার কিন্তু বহু পূর্ব্বেই উন্মুক্ত; তাঁহাদের দ্বার প্রত্যহ রাত্রি একদণ্ড থাকিতেই উন্মুক্ত হয়। কারণ ব্রাহ্মণকে দিনমণি উদয়ের একদণ্ড পূর্ব্বে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া নিজ কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে হয়। আদর্শ ব্রাহ্মণ নলিনাক্ষ ঠিক এইরূপ সময়েই প্রত্যহ গাত্রোত্থান করেন, অদ্য আরও কিছু পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাত্যহিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমাপন করিতে-ছেন। আজ তিনি নদীয়া যাইবেন, পথে কাজ-কর্ম্মের সুবিধা হইবে না, এইজন্য দৈনিক কার্য্য সমাধা করিতেছেন। স্বামী কয়েক দিনের জন্য সুদূর নদীয়ায় যাইবেন—গুরুদেবের অন্বেষণ পাওয়া যায় নাই বলিয়া, তাঁহাদের সকলেরই চিত্ত অস্থির হইয়াছে, তাই স্বামীকে ছাড়িয়া দিতেই হইবে; নতুবা নিরুপমা এই দারুণ শীতে, এত প্রত্যুষে তাঁহাকে যাইতে দিতেন না; কিন্তু স্বামী ত তাঁহার কথা শুনিবেন না, আর স্বামীর ধর্ম্ম-কর্ম্মে বাধা দেওয়া নিরুপমার ন্যায় পতিব্রতা সহ-ধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য কার্য্য নয় বলিয়া আজ তিনি কাছে কাছে দাসীর ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহাদের শিশুটী এখন নিদ্রিত, নলিনাক্ষ যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, নিরুপমা তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতেছেন। এখন দাস দাসীরা কেহ উঠে নাই বা কেহ কেহ উঠিবার চেষ্টা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে দুর্গানাম স্মরণ করিতেছে; স্বামী পুত্রের কার্য্য কাহারও দ্বারা করাইয়া নিরুপমার মনঃপুত হইত না বলিয়া কাহাকেও ডাকেন নাই — নিজেই করিতেছেন। নিরুপমার ন্যায় সুনিপুণা গৃহিণীই গৃহের অলঙ্কার; হাবভাব বিবর্জ্জিতা ধর্ম্ম পরায়ণা নিরুপমাই হিন্দু-গৃহের আদর্শ রমণী।

সংসার আশ্রমে এইটুকুই সুখ। সংসারে যদি স্ত্রী বশবর্ত্তিনী এবং পতিরতা হয়েন, পুত্র কন্যা যদি স্বধর্ম্মপরায়ণ হয়, দাস দাসী যদি আজ্ঞাকারী হয়, তাহা হইলে আর সুখের বাকি রহিল কি? যেখানে একজনের জন্য সকলে উদগ্রীব হইয়া থাকে, একজনের স্বাস্থ্যের জন্য সকলে চেষ্টা করে, একদিন আসিতে বিলম্ব হইলে সকলে যাহার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়, তাহার তুল্য সুখী এ জগতে আর কে আছে? এই জন্য শাস্ত্রকারগণ ইহাকে সুখের নিদান বলিয়াছেন এবং আশ্রমের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিকীর্ত্তন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। স্বধর্ম্ম-নিরত বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণের সংসার যে আদর্শ সংসার, ইহাতে যে দেবতারাও আসিয়া সুখভোগ করিতে ইচ্ছা করেন।

নলিনাক্ষ বালকগণের কলরব শুনিয়া আর অপেক্ষা করিলেন না। গৃহ দেবতার চরণে প্রণাম করিয়া শ্রীদুর্গানাম স্মরণ করতঃ বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এমন সময় রূপচাঁদ আসিয়া উপস্থিত; নলিনাক্ষ বলিলেন—"সর্দ্দার দাদা! গৃহ রহিল, আর তুমি রহিলে।" রূপচাঁদ বলিল—"কোন চিন্তা নাই জামাই বাবু! সেবার আমি ছিলাম না তাই; নতুবা এ বাটীতে কি ডাকাত পড়িতে পারে।" সমস্ত ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর হইলেও সকলকে আদর আপ্যায়ন করা গৃহীর কর্ত্তব্য। নলিনাক্ষ তাই গৃহ বহির্গমন সময়ে রূপচাঁদকেও আপ্যায়িত করিয়া প্রস্থান করিলেন। যতদূর দৃষ্টিপাত হয় নিরুপমা নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন, স্বামী চক্ষের অন্তরাল হইলে, ভগবানের পাদপদ্মে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া পুত্রের নিকট গমন করিলেন।

নলিনাক্ষ ক্রমশঃ বাঁকার ঘাটে আসিলেন—তথায় আসিয়া প্রতিবাসীর মুখে শুনিলেন, প্রবোধ-জননী কাত্যায়নী ৺কাশী-ধামে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। নলিনাক্ষ বিস্মিত হইলেন, না; সাধ্বী এতদিন পুত্রের সংশোধন জন্য ধরাধামে ছিলেন, পুত্র সংশোধিত হইয়াছে; তিনি স্বামী সকাশে অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন—ইহার জন্য আর খেদ কি? বাঙ্গালীর বিধবা ব্রহ্মচারিণী, আকাঙ্খিত ধামে গমন করিয়া নিজ মহিমা প্রকাশ করিতেছেন - ইহাতে আর দুঃখ খেদ কিসের? নলিনাক্ষ কাত্যায়নীর সতীত্ব কাহিনী পূর্ব্ব হইতেই শুনিয়াছিলেন। তাঁহার মধুময় চরিত্র ভাবিতে ভাবিতে এবং প্রবোধের পরিণাম চিন্তা করিতে করিতে তিনি নৌকারোহণে নিজ গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন। রুদ্রপুর গ্রামের আবালবৃদ্ধ বনিতা কেবল শ্রীধর ও তৎপুত্র প্রবোধের জন্যই ক্ষুণ্ন ছিল; দেবী-প্রকৃতি কাত্যায়নীকে সকলেই মান্য করিত; দেখিলে সভক্তি প্রণাম করিয়া ধন্য হইত।

কাত্যায়নীর মৃত্যুর পর সকলেই বলিত—এত বড় সাধকের বংশটা একেবারে উচ্ছেদ হইল। কেবলমাত্র প্রবোধ রহিল, প্রবোধের আর নষ্টচরিত্র নাই বটে; কিন্তু সে ত আর বিবাহ করিল না—তবে বংশ রক্ষা হইবে কিসে? ব্রহ্মবাক্য লঙ্ঘন করিয়া বোধ হয়, ধরাপৃষ্ঠ হইতে এমন একটী পবিত্র বংশের অস্তিত্ব লোপ হইল। পাঠকগণ বোধ হয়—শ্রীধরের বংশের পূর্ব্বকাহিনী শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তাই সে বিষয়ের কিছু কিছু অবতারণা করিতে বাধ্য হইলাম।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভূরসুট পরগণার অন্তর্গত বাসুদেবপুরে

ইহাদের আদিম বাসস্থান; এক সময়ে বাসুদেবপুরে এই বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ অতীব প্রসিদ্ধ বংশ ছিল। ধনে-মানে-কুলে-শীলে এই বংশের সুনাম এক সময় দেশ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই বংশ ঘোর তান্ত্রিক—মহা সাধকের বংশ বলিয়া সকলে ইহাদের বড়ই মান্য করিত। মহাকালী চামুণ্ডা-রূপে বহুকাল হইতে ইঁহাদের গৃহ আলোকিত করিতেন। সে মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্করী, সহসা দেখিলে হৃদকম্প উপস্থিত হয়, সে মূর্ত্তির বদনের প্রতি চাহিবার যো নাই—সেই ভীষণ বদনের প্রতি তাকাইলে বাস্তবিক প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়;—কিন্তু যিনি দেখিতে জানেন, যাঁহার চক্ষু আছে, যিনি সাধক তিনি সেই ভীষণতার ভিতর হইতেও সুমধুর হাসিরাশি দেখিয়া প্রাণে অপার আনন্দ অনুভব করেন, ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া মায়ের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া ধন্য হন; কিন্তু সেরূপ দর্শক জগতে কয়জন পাওয়া যায়! যোগানন্দ কাপালিক ইঁহাদের কুলগুরু; তাঁহার বয়স কত তাহা কেহ ঠিক করিতে পারে না। জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই বলেন—"আমরা যোগানন্দে জ্ঞান হইয়া অবধি ঠিক ঐরূপই দেখিতেছি।"

তখন দেশে মৃত্যু সংখ্যা এত প্রবল ছিল না। দেশের লোক এত অল্প বয়সে নানাবিধ রোগ জড়িত হইয়া অকালে শমন ভবনের অতিথি হইত না। তখন দেশ এত সুসভ্য হয় নাই; এখনকার মত অসংখ্য পীড়াও তখন দেশে ছিল না। এখন যে কত প্রকার পীড়া দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে—তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, তাই দেশের মৃত্যু সংখ্যা দেখিয়া প্রাণ শিহরিয়া উঠে, সময় সময় ভয়ে জড়সড় হইয়া প্রমাদ গণিতে

হয়। এখন আমরা যত সভ্য হইতেছি, যত সভ্যতা-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিতেছি; ততই আমরা অকালে কাল-কবলিত হইতেছি। এই সভ্যতার স্রোতে পড়িয়া আমরা এত পাপ সঞ্চয় করিতেছি যে, জীবন-প্রবাহ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে; জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণের তাই এখন আর সময় অসময় নাই; সামান্য বাতাসেই তাহা নিবিয়া যায়। অনবরত পাপ সঞ্চয়ই যে ইহার কারণ, তৎপক্ষে আর সন্দেহ মাত্র নাই। যোগানন্দ নিষ্পাপী—পাপের লেশমাত্রও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই তাহার দীর্ঘজীবন লাভের ইহাই একমাত্র কারণ। তাই তিনি এতকাল বাঁচিয়াছিলেন, সাধারণ লোকে তাঁহার বয়সের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিত না। গুরুর আদেশ ছিল এই পবিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশে কেহ কখন ভবানীর অংশ স্বরূপা নারীজাতির প্রতি অত্যাচার করিবে না—করিলে এই বংশ অধঃপাতে যাইবে বা নির্ব্বংশ হইবে। ভাবী বংশধর পুত্রগণের দোষেই বংশের অধঃপতন হইয়া থাকে। যে বংশের বংশধরগণ যতদিন সুপথে পরিচালিত হইবে--যতদিন তাহারা ধর্ম্মপথগামী থাকিবে, ততদিন সেই বংশের উন্নতিও বর্ত্তমান থাকিবে। ভাবী বংশধর পুত্র কন্যাগণ বিপথগামী হইলেই বংশের অধঃপতন অনিবার্য্য। অনুমান কয়েক পুরুষ এই বংশের উন্নতি অক্ষুণ্ণ ছিল। পরে শ্রীধরের সময় হইতেই এই বংশের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। শ্রীধরের শাস্ত্রে কিছুমাত্র অধিকার ছিল না ইনিই এখন বাটীর কর্ত্তা। তান্ত্রিক বলিয়া তিনি অহরহঃ মদিরামত্ত থাকিতেন। কারণবারি পান তান্ত্রিকের প্রধান কার্য্য বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। কেবল

তাঁহারই পদানুসরণ করিয়া তাঁহার যুবক সহচরগণ নষ্ট-চরিত্র হইয়াছিল—সকলেই শ্রীধরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ পাপ কর্ম্মে লিপ্ত হইতে লাগিল; দুষ্টমতি শ্রীধর তাহাদিগকে যাহা বলিত তাহারা তাহাই করিয়া ধনবান্ ও ধার্ম্মিক বন্ধুর মনস্তুষ্টি করিত; বংশে মর্য্যাদাগুণে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শ্রীধর সাধকের বংশ - সে যাহা করিবে - যাহা বলিবে - তাহাতে কি আর কোন আপত্তি থাকিতে পারে! এই জন্য তাহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তাহারা তৎপ্রতিপালনে তৎপরতা প্রদর্শন করিত। অবাধে পাপ সঞ্চয় করিলেও শ্রীধর তাহাদিগকে কিছু বলিতেন না—তবে আর ভয় কাহাকে? শ্রীধরের কয়েকটী পুত্র হইয়াছিল,—কিন্তু অকালে সকলেই পরলোকের পন্থা অনুসরণ করিয়াছে, কেবল প্রবোধচন্দ্র এখনও জীবিত কিন্তু সেও পিতৃ গুণে গুণী পুত্র, পিতৃদোষে দোষী। পাঠক! প্রবোধের চরিত্র কিরূপ ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল—তাহা আপনারা অবগত আছেন।

শ্রীধর-পত্নী কাত্যায়নী পরম ধার্ম্মিকা রমণী, অতীব সদ্বংশ-জাতা, কেবল তাঁহাতেই বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের সমস্ত সদ্গুণ বর্ত্তাইয়াছিল। কাত্যায়নীর পিতা মাতার শিক্ষাও তাঁহাকে ধর্ম্মের অনুগামিনী করিয়াছিল, তাই শ্রীধর অহরহঃ এত পাপ করিয়াও কেবল পত্নীর গুণে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিয়া-ছিলেন। নতুবা বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে নবাবের আদেশে শ্রীঘর দর্শন করিতে হইত। পূর্ব্বাপর অতিথি সেবার জন্য শ্রীধরের পূর্ব্বপুরুষগণ একটী অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই অতিথিশালায় বাসুদেবপুরের দুঃস্থব্যক্তিগণ ও অপরাপর

অতিথি ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া তাঁহাদিগকে দুই হাত তুলিয়া আশী-র্ব্বাদ করিত। শ্রীধরের আমলে অতিথিশালায় অতিথিসেবা হইত না; তাহা একটী মানুষ ধরা ফাঁদ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। যদি কখন কোন সময়ে কোন অতিথি আর্ত্ত হইয়া আসিত বা কোন প্রকার বিপদগ্রস্ত হইত; কাত্যায়নী স্বামীর অসাক্ষাতে প্রাণপাত করিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন; অভাব অভিযোগ পূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে গুপ্ত-ভাবে সেই স্থান ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতেন। বোধ হয় এই আদর্শ নারী-চরিত্রের চরিত্র বলে এখনও বন্দ্যো-পাধ্যায় বংশ অপ্রতিহত প্রভাবে ধরণীধামে অবস্থিতি করিতেছে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি—সে সময় বাসুদেবপুরে অপর লোকের বসবাস তাদৃশ বেশী ছিল না, বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের প্রভাব প্রতিপত্তি বড়ই প্রবল ছিল। সাধকের বংশ বলিয়া সকলেই তাঁহাদিগকে মান্য করিত। ইহার অনেক দিন পরে শ্রীধরের জন্ম হয়। তিনি ত ভাল লেখাপড়া জানিতেন না, কূটবুদ্ধি তাঁহার বড় প্রবল ছিল, পাপে রতিমতি তাঁহার অত্যধিক থাকিলেও বংশ মর্য্যাদা তাঁহাকে বড় করিয়াছিল। শ্রীধর যথার্থ পূজা পদ্ধতি না জানিলেও স্বহস্তে চামুণ্ডার পূজা করিতেন। শুনা যায় তাঁহার সময়ে নাকি কোন কোন দিন অমাবস্যার রাত্রে মন্দির মধ্যে গোপনে নরবলিরও আয়োজন হইত। কিম্বদন্তি আছে যে শ্রীধর গোপনে—এমন কি পত্নীর নিকটও ছাপাইবার চেষ্টা করিয়া অতি সন্তর্পণে সহচরবর্গ সহ রাহাজানি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিত; কিন্তু তথাপি সেই

আরক্ত-নেত্র, খর্ব্বকায়, বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ একজন নিষ্ঠাবান্ শক্তিসাধক ছিলেন।

পুত্র প্রবোধচন্দ্র তখনও ভূমিষ্ঠ হয় নাই। মনুষ্য চরিত্রের কোন এক দুরনুমেয় দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত বামাচারী সাধক আপনার ভয়ঙ্করী সাধনা এবং ততোধিক ভয়ঙ্করী ব্যবসায় কখনও পত্নীর নিকট ব্যক্ত করিতেন না; কিন্তু সাধ্বী কাত্যায়নী সমস্ত জানিতেন—তাঁহার পাপাচরণের জন্য পায়ে ধরিয়া কত কাঁদিতেন; কিন্তু তাঁহার কাতর ক্রন্দন একদিনের জন্যও শ্রীধরকে টলাইতে পারে নাই। কতদিন গোপনে তিনি সেই নৃশংস-কবলিত কত নিরুপায় অভাগ্যকে উদ্ধারের পথ বলিয়া দিয়াছেন। সহচরগণ যাহাকে ধরিয়া আনিয়া গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিত —কাত্যায়নী গোপনে তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিতেন; শ্রীধর ও তাহার অনুচরবর্গ ঘুণাক্ষরেও তাহা জানিতে পারিত না।

তখন দেশে এইরূপ অত্যাচারই প্রবল ছিল; তখন যাহার ক্ষমতা বেশী, তাহারই জয় জয়কার। ইংরাজ রাজত্বের ন্যায় সুশাসন তখন দেশে প্রচলিত ছিল না। মুসলমান রাজত্বের শেষ সময়ে, তাই লোকের ধন-প্রাণ-মান রাখা দায় হইত। তখন এ দেশের প্রতি অনেক ভিন্ন দেশীয় রাজার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। মুসলমান রাজত্বের শেষ অবস্থায়, সেই সময়ে কাশী গয়া প্রভৃতি তীর্থ স্থানে যাইতে হইলে, এই বাসুদেবপুরের পথ দিয়াই যাইতে হইত। পথও বড় ভয়ানক ছিল। দুইধারে এক ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ সাঁইবন। সেই বনের মধ্যে দস্যুগণ লুকাইয়া থাকিত এবং যে সকল আসন্ন-কাল যাত্রী সেই স্থান

দিয়া যাইত, দস্যুগণ ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাদের উপর লাফাইয়া পড়িত এবং সর্ব্বস্বান্ত করিয়া মারিয়া জঙ্গলে টানিয়া ফেলিয়া দিত।

দস্যুগণের হস্তস্থিত নিরেট বাঁশের ছোট ছোট মুগুর (পাবড়ার) আঘাতে অনেক তীর্থ-যাত্রী সেই অজ্ঞাত, দূরতম তীর্থে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন—সেখানকার মহাযাত্রীরা অদ্যাবধি আর লোকালয়ে ফিরিয়া আসেন নাই।

ইহা ব্যতীত যাত্রী ধরিবার ফাঁদ শ্রীধরের সেই অতিথি-শালা। এক সময়ে এই অতিথিশালায় সাত্ত্বিকভাবে কতশত অতিথি, সাধু সন্ন্যাসীর উদর পূরণ হইত। সাধুগণের পবিত্র পদস্পর্শে যাহা—পরম পবিত্র তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছিল, আজ তথায় ভীষণ নরহত্যার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। জানি না—অধুনা শ্রীধরের মতিগতি কেন এমন বীভৎস ভাবে পরিবর্ত্তিত। তাঁহার অনুচরেরা অতিথিগণকে ভুলাইয়া সেই খানে আনিয়া আতিথ্য স্বীকার করাইত; দ্বিতীয় তিথিতে সেই অতিথিগণ লোকান্তরের আতিথ্যগ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত হইত।

শ্রীধরের সহচরগণ বুঝিতে পারিত না, কেমন করিয়া মধ্যে মধ্যে এই অতিথিশালার প্রার্থিততম কোন কোন অতিথি আশ্চর্য্য রূপে কোন্ সময়ে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত। সেই সব সৌভাগ্যবান্ অতিথি দেখিতে পাইত এক দেবীমূর্ত্তি হঠাৎ নিঃশব্দে আবদ্ধ গৃহদ্বার উন্মোচন করিতেন। তিনি অর্থে তাহাদের হস্তপূর্ণ করিয়া দিয়া, গুপ্ত পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেন পালাও পালাও—এ ডাকাতের আড্ডা। এ দেবী-

মূর্ত্তি আর কেহ নহে,—পাষণ্ড নরাধম শ্রীধরের পত্নী দেবী কাত্যায়নী।

আবার কোন কোন দিন কোন অপেক্ষিত যাত্রী কোন্ সুযোগে সেই সাঁইবনটুকু কোন্ পথ দিয়া গোপনভাবে পার হইয়া যাইত, তাহাও তাহারা ধরিতে পারিত না।

ধর্ম্মগত-প্রাণা, মহামহিমময়ী কাত্যায়নী স্বামীর এই অমানুষিক, দুর্দ্ধর্ষ কাণ্ড দেখিয়া মরমে মরিয়া যাইতেন, প্রাণের আবেগ ভরে, সভক্তি হৃদয়ে তিনি কখন কখন চামুণ্ডার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সাশ্রুনয়নে প্রার্থনা করিতেন—"মাগো জগজ্জননী! কোন্ দোষে এই পবিত্র বংশে এরূপ পাপাভিনয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে? মা প্রসন্নময়ী! প্রসন্না হও, এ মহাপাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর, স্বামীর মতি গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দাও মা!"

দেবী গোপনে খল খল করিয়া হাস্য করিতেন। যে বংশে ব্রাহ্মণের অভিশাপ, যে বংশে নারী জাতীর প্রতি অত্যাচার; দেবী পূজার ভাণ করিয়া মদিরা সেবন—এবং তাহার বংশে লোকের প্রতি পাশবিক অত্যাচার—সে বংশের শ্রেয় লাভ কি হইতে পারে! দেবী হাসিতেন। কাত্যায়নীর জন্য—সে হাসির উদ্দেশ্য বুঝাইয়া তিনি বলিতেন, "মা! তোমারই দ্বারা এ বংশের উদ্ধার হইবে, এবার যে পুত্ররত্ন লাভ করিবে, প্রথমে সে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরে এই বংশের মর্য্যাদা বজায় করিতে সক্ষম হইবে।" এতদিনে দেবীর অমোঘ আশীর্ব্বাদ ফলিবার শুভ সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, প্রবোধ সুপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। যখন এই সকল দস্যুগণের নিদারুণ অত্যাচার নরাদের

নিকট পৌঁছিল, যখন নবাব অত্যাচার দমনে কৃতসঙ্কল্প হই-লেন; তখন শ্রীধরের সাধকত্ব ঘুচিয়া গেল; পত্নীর পরামর্শে সে স্থানের সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া রুদ্রপুরে আসিয়া জমিদারী স্থাপন করিলেন, পূর্ব্ব-স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইল বটে; কিন্তু শ্রীধরের কূটবুদ্ধি কিছুতেই নষ্ট হইল না। সে এইবার প্রকারান্তরে লোকের বিষয় সম্পত্তি কাড়িয়া লইতে আরম্ভ করিল। তবে তাদৃশ ভীষণতা আর রহিল না। বাসুদেবপুরের চামুণ্ডা মূর্ত্তি কিছুদিন পরে সাধক যোগানন্দ লইয়া গিয়া ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

রুদ্রপুরে আসিবার পর প্রবোধের জন্ম হয়। প্রথমে প্রবোধ কিছুদিন দুর্ব্বৃত্ততার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে জননীর উপদেশে আপনার জীবন নাটকের শুভ দৃশ্যগুলি অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আজ এ হেন দয়াবতী দেবীর স্বর্গারোহণে রুদ্রপুরের আবালবৃদ্ধ বনিতা শোকে অধীর হইবে না ত কি?

বিবাহ হইয়া অবধি কাত্যায়নী কোনরূপ রোগভোগ করেন নাই। যোগানন্দের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া অবধি, তিনি নিত্য নিয়মিত তাহা জপমালা করিয়া শরীর দৃঢ় করিয়াছিলেন। শ্রীধর রুদ্রপুরে স্থানান্তরিত হইবার পর, তাহার মতিগতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে মনে করিয়া—যোগানন্দ দুই একবার সে বাটীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাকে "যথা পূর্ব্বং তথা পরম্" দেখিয়া আর সে বাটীতে পদার্পণ করেন নাই। শ্রীধর দুই একবার পত্নীর অনুরোধে তাঁহার অন্বেষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীধরের ন্যায় পাষণ্ডের ভাগ্যে আর গুরু দর্শন

হয় নাই। সেই অবধি শ্রীধর নিজের অর্থ লালসায় ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন—গুরুর দর্শন জন্য আর বেশী কিছু চেষ্টাও করেন নাই।

কাত্যায়নীকে আজীবন কোনও পীড়ায় ভুগিতে হয় নাই; স্বামীর মৃত্যুর পর নানা চিন্তায় তিনি অশেষ প্রকার জটিল পীড়ায় জড়িত হইয়া পড়িলেন, স্বাস্থ্যও ভঙ্গ হইয়া গেল। প্রবোধ জননীর জন্য সমস্ত ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না, যদি জননী এ যাত্রা রক্ষা পান—কিন্তু তাহা হইল না; সাধ্বীসতী আর ইহলোকের সুখ-ভোগ ইচ্ছা করিলেন না। একদিন তিনি কাশীর বাটীতে প্রবোধকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা প্রবোধ! দেবী ভগবতী আমার মনের বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন—তুমি সৎপথ-গামী হইয়াছ দেখিয়া, আমার হৃদয় স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতেছে। তোমাকে ভাল দেখিয়া মরিব বলিয়া, আমি এত দিন বিধবা অবস্থায় জীবিত আছি। আর না, আমি এবার অনন্তধামে চলিয়া যাইব। মনে যেন থাকে, তুমি সাধকের বংশ—এ বংশে অনেক পাপস্পর্শ হইয়াছে; যদি তুমি ভাল হইয়া এ বংশের উদ্ধার সাধন করিতে পার, যদি এখন হইতে সগর বংশের ভগীরথের ন্যায় কার্য্য করিয়া অসাধ্য সাধন করিতে পার, তবেই তোমার পিতা ও পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার সাধন হইবে। গুরুদেব তোমার প্রতি সদয় হইয়াছেন। এক্ষণে নলিনাক্ষের ন্যায় সাধকের সহবাসে কিছুদিন থাকিয়া গুরুদেবের পরামর্শ গ্রহণ করতঃ পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার সাধন করিবে।" এই বলিয়া নারী শিরোমণি কাত্যায়নী হাসিতে হাসিতে সজ্ঞানে কাশীতে পুত্রের ক্রোড়ে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। গুরুদেব তখন

কাশীতে ছিলেন না। প্রবোধ নিজের বুদ্ধি অনুসারে জননীর সৎকার্য্য করিয়া বাটী ফিরিলেন। মাতুল মহাশয় পীড়িত ছিলেন, তিনি হঠাৎ ভগ্নীর মৃত্যু সংবাদে মর্ম্মাহত হইলেন। প্রবোধ জননীর শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাধা করিয়া জননীর শেষ অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য নলিনাক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। রুদ্রপুরে তাঁহার সন্ধান লইলেন। লোক পরম্পরায় শুনিলেন—নলিনাক্ষ, এক্ষণে আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। কাজেই তিনি নদীয়ায় সন্ধান লইবার উপক্রম করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। জননীর মৃত্যুর পর হইতে প্রবোধের ভাব দেখিয়া সকলেই বুঝিল—প্রবোধ আর সে প্রবোধ নাই! অগ্নি-প্রবেশ করিলে অঙ্গারের যেমন মলিনত্ব নাশ হয়, প্রবোধেরও সেইরূপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রবোধ নিজের ভ্রম এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছেন। আজ বিবেক বলে প্রবোধের জীবন-পথ আলোকময় হইয়াছে—তিনি সৎ অসৎ বুঝিতে পারিয়াছেন। আর সংসার কূপে পড়িয়া তাঁহাকে আত্মহারা হইতে হইবে না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রেপ্তার ও শাস্তি।

এখন রাজত্ব দুইভাগে বিভক্ত। এক ভাগ নবাবের, এক ভাগ ইংরাজের। সুসভ্য ইংরাজ কলিকাতায় আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। যদিও তাঁহাদের ভারতে রাজত্ব করিবার ইচ্ছা ছিল না, তথাপি মুসলমান নবাবের হটকারিতায়, অনবরত লোকের প্রতি অত্যাচার করায়, প্রজাগণ তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলে—তাঁহারা বাধ্য হইয়া ইহার প্রতিকার কল্পে মনোনিবেশ করিলেন। নবাবের রাজত্ব রহিল, ইংরাজও রাজত্বের সূত্রপাত করিতে লাগিলেন। বন্দোবস্ত হইল—একজন রাজত্ব চালাইবেন, একজন রাজস্ব গ্রহণ করিবেন। ইহাতেও ইংরাজ ও মুসলমানে পুনরায় বিবাদ আরম্ভ হইল। এবার ব্যাপার বড় গুরুতর, যুদ্ধ না হইয়া আর ক্ষান্ত হওয়া অনুচিত বিবেচনায়, উভয় পক্ষে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। এই জন্য চারিদিকেই ঘোর অশান্তির সূত্রপাত। চোর ডাকাতের উপদ্রব দেশে অত্যধিক বাড়িতে লাগিল। তাহার উপর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দেশ উৎসন্ন যাইবার প্রাক্কালে যে সকল দুর্ঘটনা হওয়া সম্ভব, ক্রমশঃ সেই সমস্ত বিভীষিকা দেখা দিতে লাগিল।

বহুদিন হইল, স্বর্গীয় নীলরতনের বাটীর ডাকাতির কোন তদন্ত হইল না। কাজী সাহেব কিন্তু ইহার জন্য কোনরূপ

উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাটীতে এমন একটা লোমহর্ষণ কাণ্ড হইয়া গেল, তাহার কোন কিনারা হইল না। এরূপ গুরুতর বিষয়ে উদাসীন থাকা শাসনকর্ত্তাগণের দুর্ণাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। গোয়েন্দা অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কাজি সাহেবের অধীনে গোয়েন্দা বিভাগে কর্ম্ম করিতেন; কিন্তু এতাবৎকাল তিনি এই রহস্যের কোনরূপ মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিলেন না।

পাঠক! এই অনিলকুমারকে আপনারা চিনিয়াছেন কি? ইনি আমাদের ভুবনেশ্বরের জামাতা, সৌদামিনীর স্বামী; এই বিষয়ের তদন্ত ভাল করিয়া করিতে না পারিলে তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট মান মর্য্যাদা বজায় থাকিবে না; আর তাঁহার উন্নতিও হইবে না। কাজেই তিনি একবার কলিকাতায় ছদ্মবেশে আসিয়া, এ বিষয়ের চেষ্টা করিবেন—যদি দুর্বৃত্তগণ এই রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় কলিকাতায় আসিয়া লুকাইয়া থাকে।

তিনি কাজীসাহেবের অনুমতি লইয়া কয়েক জন বরকন্দাজ সহ ছদ্মবেশে বাহির হইলেন এবং ইংরাজ অধিকৃত স্থান সমূহে আসিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বহুদিন অনুসন্ধান করিয়া আসামী ধরিবার কোন সূত্র পাইতেছেন না বলিয়া বড়ই নৈরাশ হইয়াছেন।

প্রত্যহই তিনি যেমন ইহার জন্য বাহির হইয়া থাকেন, আজও তদ্রূপ বৈকালে বাহির হইয়াছেন। চারিদিক ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত হওয়ায় বড়ই ক্লান্ত হইয়া এক পোদ্দারের দোকানে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের জন্য উপবেশন করিলেন। তখন সমাজে ব্রাহ্মণগণ এখনকার মত হতমান হন নাই। ব্রাহ্মণ

যুবক অনিলকুমারকে দোকানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দোকানদার তাঁহার অভ্যর্থনা করিল এবং তিনি তাম্রকূট সেবন করেন কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিল। অনিলের তাম্রকূট সেবনে তাদৃশ অভ্যাস ছিল না, তথাপি কিছু অধিকক্ষণ তথায় অবস্থানের জন্য বলিলেন—"হাঁ! আমি তামাক খাইয়া থাকি।" ব্রাহ্মণ তাম্রকূট সেবনে অভ্যস্ত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ একজন তামাক সাজিতে লাগিল।

এখানকার মধ্যে এই স্বর্ণকারের দোকান সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং অনেক লোক ইহার দোকানে কেনা বেচা করিয়া থাকে।

ফাল্গুন মাস—শীতের প্রকোপ কিছু কমিয়াছে। এই মাসে হিন্দুর বিবাহ কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে,—দিনও অনেক আছে। উক্ত স্বর্ণকারের দোকানে সহরের অনেকেই বিবাহের গহনা প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

অনিলকুমার বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছেন, এমন সময় একটি বাবু আসিয়া বিবাহের গহনার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বর্ণকার বলিল,—"অন্য সমস্ত গহনা প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু গলার হার এখনও প্রস্তুত হয় নাই; আমার দোকানে একছড়া পুরাতন হার বিক্রয়ের জন্য আছে; জিনিষ অতি চমৎকার, গঠন প্রণালীও মনোহর, তাহাই লইবেন কি? ইহাতে আপনার লাভ যথেষ্ট হইবে।"

বাবু। তাহাতে আর ক্ষতি কি? তাহাকে নূতন রসান করিয়া লইলেই চলিবে।

স্বর্ণ। তবে এই জিনিষ দেখুন, এই বলিয়া সে সিন্দুক

হইতে এক ছড়া হার বাহির করিয়া দিল। ভদ্র লোকটী তাহার ওজন ইত্যাদি দেখিতে লাগিলেন। অনিলকুমারও তথায় বসিয়া ছিলেন, তিনি ইহার গঠন প্রণালী দেখিয়া বড়ই মুগ্ধ হইলেন এবং হাতে করিয়া দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এ হার এখানে কোথা হইতে আসিল? এ যে নিরুপমার গলার হার। আমার বিবাহের সময় আমার স্ত্রীর সমস্ত গহনা প্রস্তুত না হওয়ায়, আমার শ্বশুর আমার স্ত্রীর গলায় এই হার দিয়াছিলেন। তার পর তাহার হার প্রস্তুত হইলে—ইহা পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হয়। আমার স্ত্রীর কণ্ঠে ইহা বহুদিন শোভা পাইয়াছিল। তবে কি ডাকাতগণের দ্বারা ইহা বিক্রীত হইয়াছে। অপহৃত দ্রব্যের তালিকাখানি পকেট হইতে গুপ্ত ভাবে একবার দেখিয়া লইলেন, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যেও ত একছড়া হারের উল্লেখ রহিয়াছে, তবে কি ভগবান তাঁহার প্রতি সদয় হইলেন, ইহা কি সেই হার! অনিলের কৌতূহল বৃদ্ধি হইল। তিনি দোকানদারকে ছলনা করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, আপনারা জিনিষ বিক্রয় করিয়া দিলে, কিরূপ দস্তুরী লইয়া থাকেন?"

স্বর্ণকার। তাহার কিছুই ঠিক নাই; জিনিষ বিশেষে ইহার তারতম্য হইয়া থাকে। আপনি একথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আপনার কি কিছু বিক্রয়ের বা খরিদের আবশ্যক আছে?

অনিল। হ্যাঁ! আমারও একজোড়া বালা বিক্রয় করিয়া দিতে হইবে; দাম যেন কিছু বেশী হয়, তাহা হইলে সেই অনুপাতে আমি দস্তুরীও বেশী দিব।

স্বর্ণ। তাহার জন্য আর ভাবনা কি, আমার হাতে অনেক খরিদ্দার আছে, আপনি জিনিস লইয়া আসিবেন।

যখন অনিলকুমারের সহিত স্বর্ণকারের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, একটু একটু শীত অনুভব হইতেছে, অনিলকুমার উঠিবার ইচ্ছা করিতেছেন, এমন সময় জনৈক স্ত্রীলোক দোকানে আসিয়া প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকটীর সাজ সজ্জা দেখিয়া বোধ হয়—কোন সম্ভ্রান্ত বেশ্যা।

অনিলের সন্দেহ বেশীক্ষণ থাকিল না। স্বর্ণকার রমণীকে দেখিয়া বলিল —"কেও মুন্না বিবি! এই তোমার নাম হইতেছিল।"

মুন্না। কেন, কাজ কাত হয়েছে নাকি?

স্বর্ণ। এখনও হয় নাই; তবে হইবার উপক্রম হইয়াছে; দুই একদিনের মধ্যে হইবে।

মুন্না। দেখ ভাই! একটু তৎপর কর, আমার টাকার বড় দরকার পড়েছে, নইলে কি আর গায়ের গহনা বেচ্তে দিই।

স্বর্ণ। কা'ল হয়ে যাবে, আর ভাবনা নেই।

মুন্না। তবে আমি কা'ল এমনি সময় আস্‌বো।

এই বলিয়া মুন্না বিবি আপাদ মস্তক একখানি গরম কাপড়ে আবৃত করিয়া প্রস্থান করিল।

মুন্না চলিয়া যাইলে অনিলকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই স্ত্রীলোকটীরই গহনা বুঝি?"

স্বর্ণ। আজ্ঞা হাঁ।

অনিল। ঐ স্ত্রীলোকটী বেশ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে, কোথায় থাকে?

স্বর্ণ। ও নিকটেই থাকে।

অনিল। খুব চটক দেখ্‌ছি, বেশ পয়সাওয়ালা বুঝি?

স্বর্ণ। আজ্ঞা হ্যাঁ ও খুব বড় বেশ্যা, একজন ধনী মুসলমান উহাকে রাখিয়াছে। এখন বয়স বেশী হইয়াছে, এখনই ঐরূপ চটক। না জানি যৌবনে উহার হাব ভাব, আকৃতি প্রকৃতি কিরূপ ছিল।

অনিল। যাহা হউক, আর অন্য কথায় কাজ নাই, ঐ হারছড়াটীর দাম কত হইবে, আমি যদি উহাকে বেশী দামে বিক্রয় করিয়া দিতে পারি? আমার একটী বন্ধুর মেয়ের বিয়ে আছে, সে আমাকে কয়েকখানি গহনা কিনিবার জন্য বলিয়াছিল।

স্বর্ণ। উহার দাম ১৫০৲ টাকা হইবে।

"আচ্ছা দেখি, যদি তাহার মত হয়—তাহা হইলে কল্য বৈকালেই খরিদ করিয়া লইয়া যাইব। তবে এখন আসি।" এই বলিয়া অনিলকুমার সেদিনকার মত প্রস্থান করিলেন।

এই হার দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ বর্দ্ধিত হইল। ইহা ক্রয় করিয়া একবার নলিনাক্ষকে দেখাইতে পারিলে, যদি তাঁহারা এই হার চিনিতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয়—ডাকাতীর কিনারা করিতে পারিব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অনিলকুমার বাসায় যাইয়া আহারাদির পর শয্যায় শয়ন করিলেন—নিদ্রা হইল না। সমস্ত রজনী ঐ চিন্তাতেই কাটিয়া গেল। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া দেড় শত টাকা সংগ্রহ করিয়া পুনরায় স্বর্ণকারের দোকানে গেলেন এবং ঐ হারছড়াটী হস্তগত করিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি মুন্না বিবির অট্টালিকা দেখিয়া

আসিলেন। অনিলকুমার বাসায় আসিয়া আহারাদি সমাপনান্তে তাঁহার দুইজন সহচর বরকন্দাজকে লইয়া নলিনাক্ষের সহিত দেখা করিতে নদীয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথা সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া নলিনাক্ষের সহিত দেখা করিলেন এবং হার ছড়াটা দেখাইলেন। নলিনাক্ষ বলিলেন—"ভাই! আর কেন, সে অনেকদিন হইয়া গিয়াছে, আর এ কাজে সময় নষ্ট করা কেন? আমি ত ইহার কিছুই জানি না, বোধ হয় এই হারই বটে। তবে তুমি রুদ্রপুরে জ্যোতিষ বাবুর নিকটে যাও, তিনি সমস্ত বিষয় জানেন—তোমাকে সমস্ত বলিয়া দিবেন। অনিলকুমার আর অপেক্ষা না করিয়া রুদ্রপুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং জ্যোতিষ বাবুকে সেই হার দেখাইলেন। জ্যোতিষবাবু স্ত্রীর দ্বারা সেই হার নিরুপমাকে দেখাইয়া জানিলেন যে ইহাই সেই হার, যে লোহার সিন্দুকটী ডাকাতেরা লইয়া গিয়াছিল—ইহা তাহারই মধ্যে ছিল।

অনিলকুমার এইবার কোতয়ালীতে গিয়া দারোগাকে সেই হার দেখাইয়া তাঁহার সহিত কাজি সাহেবের নিকট গমন করিলেন। কাজি সাহেব সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আসামী ধরিবার জন্য এক পরওয়ানা বাহির করিয়া দিলেন। অনিলকুমার হাসিতে হাসিতে ২৫ জন বরকন্দাজ সহ কলিকাতায় আসিলেন এবং ইংরাজ রাজের ডেপুটীকে দেখাইয়া আসামীকে ধরিবার হুকুম বাহাল করিয়া লইলেন।

এ দিকে মুন্না বিবি টাকা পাইয়া আজ একপক্ষ হইল খুব আমোদে মাতিয়াছে। তাহার বন্ধুবর্গ ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে তথায় আসিয়া খুব আমোদ প্রমোদ করিতেছে। তাহারা জানে না,

যে এই আমোদের অবসানে তাহাদিগকে ঘোর দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

অনিলকুমার পরদিন প্রত্যূষে আপনার দলবল সহ মুন্না বিবির বাটী অবরোধ করিলেন। তখনও আমোদ প্রমোদ চলিতেছে, কেহই স্থানান্তরে যায় নাই। একবারমাত্র জাল ফেলিতেই সমস্ত মাছ ধরা পড়িল। তৎপরে স্বর্ণকারকে ধরিয়া লইয়া অনিলকুমার কোতয়ালীতে উপস্থিত হইলেন। ডাকাত ধরা পড়িয়াছে, সংবাদ পাইয়া জ্যোতিষ বাবু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন—তাহাতে তাঁহার আর কিছু জানিতে বাকি রহিল না। প্রধান আসামী মুন্না বিবি আর কেহই নহে, নীলরতনবাবুর বাটীর দাসী শ্যামার মা, বেশভূষা ও নাম পরিবর্ত্তন করিয়া মুন্না বিবি হইয়াছে। দ্বিতীয় আসামী আর কেহই নহে—পাষণ্ড রমেশ সেই এ চক্রান্তের প্রধান পাণ্ডা। অপরাপর সকলে সাহায্যকারী ভিন্ন আর কিছু নহে।

পরদিন আদালতে মোকর্দ্দমা দায়ের হইল। তুমুল মোকর্দ্দমা চলিতে লাগিল। জ্যোতিষপ্রসাদ উকীলের কার্য্য করিতে লাগিলেন। কাজি সাহেব প্রায় সপ্তাহ কাল এই মোকর্দ্দমা শ্রবণান্তে রায় প্রকাশ করিলেন। রমেশ ডাকাতের সর্দ্দার—উহার চক্রান্তে এই ডাকাতি সংঘটিত হইয়াছে এবং উহারই ছুরিকাঘাতে মহামায়ার প্রাণসংশয় হইয়াছিল, তবে প্রাণে মরে নাই এবং অপর ডাকাতগণ উহারই আজ্ঞায় নিরুপমাকে অচৈতন্য করিয়া লইয়া পলাইতেছিল। সকল অপরাধের প্রধান নায়কই এই রমেশ! অতএব ইহার সপরিশ্রম দশ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইল। মুন্না বিবি ওরফে শ্যামার মা—গৃহশত্রুরূপে

সমস্ত দেখাইয়া দিয়া এই সর্ব্বনাশ সংঘটিত করিয়াছে এবং নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কলিকাতায় বাস করিতেছে। ইহার সাত বৎসর সশ্রম কারাবাস হইল। অপরাপর সঙ্গীগণের অপরাধ অনুসারে কাহার তিন বৎসর, কাহার দুই, কাহার এক বৎসর কারাদণ্ড হইয়া গেল।

জ্যোতিষপ্রসাদ হাসিতে হাসিতে বাটী গিয়া এই সংবাদ রাষ্ট্র করিলেন। সকলেই কাজি সাহেবের বিচার দেখিয়া সুখী হইল।

নিরুপমা শ্যামার মার জন্য কিছু দুঃখিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কি করিবেন—পাপ করিলেই ভুগিতে হইবে—ইহাই বিধাতার নিয়ম। মানুষ নিজের দোষেই কষ্টভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্মের ফলভোগ অনিবার্য্য—ইহার ফলদাতা স্বয়ং ভগবান। নলিনাক্ষ শুনিয়া সুখদুঃখ কিছুই প্রকাশ করেন নাই। এ সংবাদে তাঁহার মত দৃঢ়চিত্ত লোক কখন বিচলিত হইতে পারে না।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

সাধকে সাধকে।

নলিনাক্ষ এখন নদীয়ায় শ্রীগুরুর আশ্রমে বাস করিতেছেন। প্রত্যহ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার আশ্রমে আসিয়া শাস্ত্রালাপে দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। আজ বহুদিবস তিনি সংসারে উপভোগ করিয়াছেন; সংসারের অনেক জ্বালা যন্ত্রণা, সুখ অসুখ তিনি এতদিন ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু আর তাঁহার সংসারাশ্রম সুখপ্রদ বোধ হইতেছে না। মন যেন আরও কোন নূতন সুখের জন্য, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে। তাই এত শাস্ত্র-পাঠ, এত ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও যেন তিনি আরও কিছু নূতন বস্তু উপভোগ করিতে চাহেন—ইহাতে যেন তাঁহার মনঃপূত হইতেছে না।

নদীয়ায় আসিয়া তিনি গুরুদেবের কত অন্বেষণ করিয়াছেন, কত লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কত তীর্থ-যাত্রীকে তাঁহার প্রাণের প্রাণ বামদেবের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; কিন্তু কেহই তাঁহার অভীষ্ট-দেবের সুসংবাদ বলিয়া দিতে পারে নাই। নলিনাক্ষকে গুরুদেবের জন্য চঞ্চল হইতে দেখিয়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রও তাঁহার কত অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইতেছে না। নলিনাক্ষ একদিন প্রাতঃকালে নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া আশ্রমের চত্বরে পদচারণা

করিতেছেন। কখন পুষ্পবৃক্ষের নিকট, কখন তুলসী-মঞ্চের নিকট, কখন বিল্বতলে আসিয়া উপবেশন করিতেছেন—কিন্তু কিছুতেই তিনি মনস্থির করিতে পারিতেছন না। যে আশ্রম শান্তির আগার, যাহা আজীবন নলিনাক্ষকে অসীম শান্তি দানে পরিতোষ করিয়া আসিয়াছে, যে আশ্রমের প্রত্যেক পুষ্প বৃক্ষটী পর্য্যন্ত নলিনাক্ষকে সুখী করিতে চির-প্রয়াসী, আজ তাহাদের সে প্রয়াস ব্যর্থ হইতেছে। নলিনাক্ষ তৎপ্রসূত প্রস্ফুটিত কুসুম-সৌরভে প্রাণে শান্তি আনয়ন করিতে পারিতেছেন না। নলিনাক্ষ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া একদৃষ্টে একটি হরিণ শিশুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছেন। কখন কখন দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিতেছেন—"প্রায় অর্দ্ধেক জীবন ত সংসারেই কাটিয়া গেল, কই গুরুদেব ত আসিলেন না। তিনি ত আমাকে আশ্বাস দিয়া গিয়াছিলেন, সময়ে সময়ে আসিয়া আমার চমক ভাঙ্গিয়া দিবেন, কি করিতে হইবে, কি না করিতে হইবে, ইহার পর কি করা বিধেয়; আশ্রমান্তর গ্রহণ করার সময় তিনি আসিয়া আমার কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিবেন। কই বহুদিন গত হইল—প্রভু ত আর দর্শন দিলেন না; তবে কি আর তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া মানব-জীবন সার্থক করিতে পারিব না। হায়! গুরুকে ছাড়িয়া কেন আমি সংসারী হইয়াছিলাম; কেন আমি অমৃতের আস্বাদ ছাড়িয়া বিষ ভক্ষণে প্রাণের যন্ত্রণা বাড়াইতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম। হায় কেন মজিলাম, কেন মজাইলাম। ইহার পর যদি গুরুদেবকে আর পাইব না, তবে ছাড়িলাম কেন? অশেষ-জ্ঞান গুরু, মুক্তপুরুষ বামদেব কি

আর দাসের প্রতি কৃপা করিবেন না, সংসারে ত সকল সুখ উপভোগ করিয়াছি। পতিব্রতা পত্নী, নয়নানন্দ পুত্র, অশেষ বিষয় বৈভব—সমস্তই ত উপভোগ করিয়া আশা মিটাইলাম। এখন ইহার পর আমায় কি করিতে হইবে, কে বলিয়া দিবে? কে উপদেশ দিয়া আমায় গন্তব্য-পথে প্রধাবিত করিবে? হে অজ্ঞান-তিমির-নাশন, ভবার্ণব-নাবিক শ্রীগুরু! আর কি আপনার দর্শন পাইব না?" এই বলিয়া প্রাণের আবেগে নলিনাক্ষ কাঁদিয়া ফেলিলেন।

আশ্রম নির্জ্জন, তথায় অপর লোকের সমাগমের কোন সম্ভাবনা নাই, এ সময় অপর কেহ আশ্রমে আসিতে পারেন না। হঠাৎ সেই সময় জনৈক তেজঃপুঞ্জ কলেবর রুদ্রমূর্ত্তি পুরুষ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আশীর্ব্বাদ সহকারে হস্তোত্তোলন করিয়া বলিলেন,—"স্বস্তি স্বস্তি! বৎস! নলিনাক্ষ দীর্ঘজীবি হও, বৃথা খেদ করিয়া কেন চিত্ত-চাঞ্চল্য আনয়ন করিতেছ? বৎস! বামদেব বহুদূর দেশে অবস্থান করিতেছেন। সত্বর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এইবার গুরুদক্ষিণার আয়োজন কর। এই সূত্রে তীর্থ-ভ্রমণে তোমার সকল সাধ মিটিবে, মানব-জন্ম সার্থক হইবে; প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে, গুরু-দক্ষিণা দিতে পশ্চাদ্পদ হইও না। অচিরেই তোমার মনোবাসনা সিদ্ধ হইবে। আমি তাঁহারই গুরু-ভ্রাতা যোগানন্দ কাপালিক। আর এক কথা—শ্রীধরের পুত্র প্রবোধ এখন সংসার-বিরাগী, তাহাকে দেখিও সে—নিরপরাধী।" এই বলিয়া তিনি—এমন দ্রুত প্রস্থান করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইলেন, দিবাভাগেও নলিনাক্ষ বহু অন্বেষণ করিয়া আর তাঁহার দেখা পাইলেন না। নলিনাক্ষ

আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন! গুরুর নিকট তিনি সাধকপ্রবর যোগানন্দ কাপালিকের নানা প্রকার অলৌকিক শক্তির বিষয় শ্রুত হইয়াছিলেন। আজ নিকটে পাইয়াও তাঁহার পদ বন্দনা করিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখিত হইলেন।

এইবার নলিনাক্ষের গুরুদক্ষিণার বিষয় ক্ষণে ক্ষণে মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। আমি ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গুরুদেবকে দক্ষিণা দিবার জন্য প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি প্রথমতঃ আমার দক্ষিণা গ্রহণে স্বীকৃত হন নাই। তারপর আমার আন্তরিক কাতরতায় তিনি যে দক্ষিণা চাহিয়াছেন, তাহাতে প্রকারান্তে আমার মুক্তির উপায় ত বলিয়া দেওয়া হইয়াছে! তিনি তাঁহার কন্যার যেরূপ রূপ বর্ণনা করিয়াছেন—তাহা ত আমারই আরাধ্যা দেবী, তাহা কি আর বুঝিতে বাকি আছে। তবে তিনি কন্যা কন্যা করিয়াই পাগল, কন্যা কন্যা করিয়াই সংসার-বিরাগী। সাধকশ্রেষ্ঠ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ রামপ্রসাদের নিকট তিনি কন্যা ভাবে উপাসনা করিবারই উপদেশ পাইয়াছেন, আর পাছে আমি এই কঠোর কার্য্য নির্ব্বাহে অস্বীকার করি; এই জন্য প্রকারান্তরে আমাকে এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন। যাহা হউক, আর কাল বিলম্ব করা বিধেয় নহে। সত্বরই রুদ্রপুরে গমন করিয়া একবার প্রবোধের সহিত দেখা করিয়া—তাহাকে সান্ত্বনা করতঃ, আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোনিবেশ করিব। প্রবোধের উপর ত আমি কিছুমাত্র সন্দেহ করি নাই। তাহার প্রতি ত আমার কোন প্রকার বিসদৃশ ভাব নাই, তবে কেন প্রবোধ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। প্রবোধ কয়েক বৎসর সঙ্গদোষে পড়িয়া

নিজের চরিত্র ঠিক রাখিতে পারে নাই বটে—কিন্তু এখন ত সে সুপথ কুপথ বুঝিতে পারিয়াছে, এখন তাহার জীবন-স্রোত ফিরিয়াছে। তবে তাহার দুঃখের কারণ কি? যাহা হউক, রুদ্রপুরে যাইয়া তাহার সহিত দেখা করিয়া যাইব, তাহা হইলেই উভয়ের মনোবিবাদ মিটিয়া যাইবে। যোগানন্দের ন্যায় যোগীপুরুষ যাঁহাদের কুল-গুরু, যাঁহারা সাধকের বংশ-সমুৎপন্ন, চিরকাল কি তাঁহাদের এক-ভাবে কাটিতে পারে! এই প্রবোধের দ্বারাই বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ পুনরায় উজ্জ্বল শ্রীধারণ করিবে তবে প্রবোধ যে গৃহী হইবে, সে বিশ্বাস কাহারও নাই, সংসারে তাহার যেরূপ একেবারে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, তাহাতে তাহাকে আর ফিরাইতে পারা যাইবে না। তাহার অতুল বিষয়-বৈভব, যাহাতে ছারেক্ষারে না যায়, জ্যোতিষকে বলিয়া তাহার একটা উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তাহার মাতুল মহাশয় ত বৃদ্ধ হইয়াছেন, আর কতদিন বাঁচিবেন?

এইবার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত তাঁহার একবার দেখা করিবার জন্য মন বড়ই ব্যগ্র হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার সহিত আজ কয়েক দিন কিছুতেই দেখা করিতে পারিতেছেন না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইংরাজ বাহাদুরের সহিত যোগদান করিয়াছেন। যাহাতে মুসলমানের অত্যাচার নিবৃত্তি হয়, যাহাতে দেশ হইতে মুসলমান শাসন একেবারে তিরোহিত হয়, তাহার পরামর্শ করিতেই ব্রিত। কৃষ্ণচন্দ্র চিরকালই প্রজাভক্ত, লোকের প্রতি অযথা পীড়ন, তিনি কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারিতেন না। এক্ষণে মুসলমানগণের অত্যাচার কতদূর বাড়িয়াছে—যে তাহা

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

আর কেহ সহ্য করিতে পারে না। চারিদিকেই হাহাকার উঠিয়াছে। কাজেই ইহার প্রতিকার নিতান্ত আবশ্যক, যাহাতে তাহাদের প্রবল প্রতাপ ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়, যাহাতে মুসলমানের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়, তাহার জন্য মহারাজের সহিত ইংরাজের পরামর্শ চলিতে লাগিল এবং সেই পরামর্শের ফলে নদীয়ার সন্নিকটস্থ পলাশীক্ষেত্রে ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। প্রজাবর্গের প্রতি রাজার পীড়ন পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইলেই রাজার রাজা ভগবানের আসন টলিয়া যায়, তাহার রাজ্য অচিরে লোপ করিবার জন্য ভগবানের হস্ত ক্ষিপ্র প্রসারিত হইয়া পড়ে, তখনই পরিবর্ত্তনের জন্য যুদ্ধের আয়োজন হইয়া থাকে, আজ পলাশীক্ষেত্রে তাহারই শুভ সূচনা।

নলিনাক্ষ কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া যখন মহারাজের দর্শন পাইলেন না, তখন মনে করিলেন নিশ্চয়ই তিনি কোন গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। মহারাজের দায়িত্ব ত সহজ নহে। তিনি আর অপেক্ষা না করিয়া পরদিনই রুদ্রপুর যাইবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। কল্য প্রাতঃকালেই রুদ্রপুরে যাইবেন স্থির হইয়াছে, এইজন্য রজনীযোগে তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে এই আশ্রমের ভার প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। রজনীর গাঢ় অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছে ; কোলের মানুষ দেখা যায় না। নির্জ্জন আশ্রমের নীরবতার রাজত্ব আরও বিস্তৃত হইয়াছে। এমন সময় একজন লোক আসিয়া হঠাৎ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া নলিনাক্ষের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কৃপা ভিক্ষা করিল।

নলিনাক্ষ চমকিত হইয়া দেখিলেন—এবং দেখিয়া চিনিতে পারিলেন—এ শ্রীধরের পুত্র প্রবোধচন্দ্র। নলিনাক্ষ তৎক্ষণাৎ তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লইলেন এবং তাহার গায়ের ধূলি ঝাড়িয়া দিয়া বলিলেন-"ভাই প্রবোধ! একি, তোমার এ অবস্থা কেন? কেনই বা তুমি এ দূর-দেশে আসিয়া আমার নিকট এত অনুনয় বিনয় করিতেছ? ভাই! তুমি আমার কোন অপরাধ কর নাই আমি তোমার প্রতি একদিনের জন্য অসন্তুষ্ট হই নাই। তবে তুমি কেন বৃথা সন্দেহ বশে মনঃ-ক্ষুন্ন হইয়াছ?"

প্রবোধ।—নলিনাক্ষ! বল তুমি আমায় ক্ষমা করিলে, আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিলে।

নলিনাক্ষ।-যে কোন দোষ করে নাই, যাহার কোন অপরাধ নাই তাহাকে আবার ক্ষমা করিব—এ কিরূপ কথা, তুমি কি পাগল হইয়াছ নাকি?

প্রবোধ।-যাহাই হউক, তুমি বল, আমায় ক্ষমা করিলে।

নলিনাক্ষ।—ভাই! তোমার দোষ কি, আমি কিছুই জানি না; তবে তোমার কাতরোক্তি দেখিয়া, তুমি যাহা বল, তাহাই করিতে বাধ্য হইলাম। ভগবান তোমার ন্যায় সদ্বংশের সন্তানকে সুমতি প্রদান করিয়া পদাশ্রয় প্রদান করুন, ইহাই আমার কায়মনে প্রার্থনা।

প্রবোধ।--তোমার ন্যায় সাধকের ঐকান্তিক প্রার্থনায় নিশ্চয়ই আমার পরকালের পথ পরিষ্কার হইবে।

নলিনাক্ষ।-তোমার গুরুদেব আশ্রমে পদার্পণ করিয়াছিলেন-আমার দর্শন-লালসা পরিতৃপ্ত হইতে না হইতেই

কোথায় অদৃশ্য হইলেন—তাহা বুঝিতে পারিলাম না, সাধুসেবা অদৃষ্টে না থাকিলে কিছুতেই হইতে পারে না।

প্রবোধ।—নলিনাক্ষ! এমন দিন নাই, যে দিন গুরুদেব তোমার কথা, পূজ্যপাদ বামদেব শাস্ত্রীর কথা স্মরণ না করিয়া জলগ্রহণ করেন। আমি কাশীতে যে কয়দিন তাঁহার নিকট ছিলাম, তোমাদের গুণাবলী শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং তাঁহারই আদেশে এখানে তোমার দর্শন-লালসায় আসিয়াছি, আর দেখা হইবে কিনা, কিছুই ত বলা যায় না।

নলিনাক্ষ।—কেন প্রবোধ, তুমি কি আর গৃহে ফিরিবে না?

প্রবোধ।—ভাই! আর কাহার জন্য গৃহে ফিরিব? গৃহলক্ষ্মী মা আমার মত অধমকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, তবে আর গৃহে কেন?

নলিনাক্ষ।—বিবাহাদি করিয়া নিজের পবিত্র-বংশের উন্নতি সাধন কর, বিপুল বিষয়-বৈভবের রক্ষণাবেক্ষণ কর।

"ভাই! সংসারী হইবার ইচ্ছা বহুদিন ত্যাগ করিয়াছি। গুরুদেবের সহিত তীর্থ-ভ্রমণে জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইবার অনুমতি পাইয়াছি। আমার মত অসংযত প্রকৃতির লোক সংসারী হইবার উপযুক্ত নয়; এই জন্য সে বাসনা আর করি না, তবে আমার বিষয় কিরূপ ভাবে ব্যয় করিলে পূর্ব্বপুরুষগণের সৎকৃত্য সম্পাদন করা হইবে, তোমার উপর সমস্ত ভার দিলাম, তুমি উপযুক্ত লোকের দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিও। যদি কখন ফিরিয়া আসি, দেখিয়া নয়ন সার্থক করিব।" এই বলিয়া প্রবোধ নলিনাক্ষকে একখানি দান-পত্র প্রদান করিলেন।

নলিনাক্ষ প্রবোধের বিষয়-বৈরাগ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। মনে করিলেন এ কঠিনে কোমলের এরূপ সংমিশ্রণ কে করিল রে! প্রবোধের ন্যায় কঠিন-প্রাণ বিষয়ীর হৃদয় এত কোমলতা-ময়! এরূপ অভাবনীয় ত্যাগ-স্বীকার করিতে কে শিখাইল? মরি মরি! প্রবোধের এরূপ পরিবর্ত্তন কিরূপে হইল! মা জগজ্জননী, তুমি যাহাকে কৃপা কর, তাহার আর উদ্ধারের ভাবনা কি? প্রবোধ ত মুক্তি-পথ দেখিতে পাইয়াছে, মা! তাহাকে পদাশ্রয়ে আশ্রয় প্রদান কর।

সরল-চিত্ত সাধু-প্রকৃতি নলিনাক্ষ প্রবোধের পূর্ব্বভাব অনু-মাত্র হৃদয়ে স্থান দান না করিয়া, তাহার উপস্থিত ভাবে বিভোর হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন দানে চরিতার্থ করিলেন। নলিনাক্ষ বলিলেন - "প্রবোধ! গৃহে চল, বিষয়াদির ব্যবস্থা করিয়া পরে যথা ইচ্ছা গমন করিবে!"

প্রবোধ। —ভাই নলিনাক্ষ! এই সামান্য ভারটী কি তোমার এত ভার বোধ হইল, তবে আর আমাকে কৃপা করিলে কই?

নলিনাক্ষ। ভাই! মানুষ মানুষকে কৃপা করিতে পারে না, কৃপাময়ীর কৃপাই জগদ্ব্যাপ্ত, তিনি ত তোমাকে কৃপা করিয়াছেন।

"তবে তুমি সহায় হও; যেরূপ ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়, তুমিই তাহা করিও, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া প্রবোধ রজনীর গাঢ় অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, নলিনাক্ষ আর তাহার সন্ধান করিতে পারিলেন না।

কর্ম্মযোগী, বর্ণাশ্রমী নলিনাক্ষ সমস্ত রজনী প্রবোধের বিষয় চিন্তা করিয়া হঠাৎ তাহার চৈতন্যোদয়ের বিষয় ভাবিয়া

ভগবানের চরণে কোটী কোটী প্রণাম করিলেন। মানুষকে পরিবর্ত্তন করিতে জগজ্জননী যে সদাই ক্ষিপ্রহস্ত, তাহা দেখিয়া তিনি তদ্ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। মানুষ মোহ-মায়ায় বিভোর হইয়া তাঁহার পবিত্র আহ্বান শুনিতে পায় না, তাই মানবের এত কষ্ট। পরদিন প্রভাতে নলিনাক্ষ স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহত্যাগ।

নলিনাক্ষ গৃহে আসিয়া প্রথমেই প্রবোধের অনুরোধ রক্ষা করিতে যত্নবান হইলেন। প্রিয়বন্ধু জ্যোতিষপ্রসাদকে সঙ্গে লইয়া, তিনি প্রবোধের মাতুলের সহিত পরামর্শ করিলেন। মাতুল সাগ্রহে সম্মতি দিলেন, কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। বিষয়ের কতকাংশ প্রবোধের মাতুলের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহারা লিখিয়া দিলেন। প্রবোধের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা সাধু সমাগমের জন্য রহিল এবং প্রবোধ যদি ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহার বাসের জন্য কতকাংশ নির্দ্দিষ্ট রহিল। প্রাসাদ-সংলগ্ন অপর একটী বৃহৎ অট্টালিকায় একটী মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা দেবীস্বরূপিণী কাত্যায়নীর অপূর্ব্ব মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল; সেইদিন হইতে দীন দরিদ্র, অন্নহীন ব্যক্তি ঐ "কাত্যায়নী-মঠে" আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলে অনায়াসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিবে,—এইরূপ ঘোষণা করা হইল। অট্টালিকা শীর্ষে "কাত্যায়নী-মঠ" এবং "তদীয় সেবক প্রবোধ-চন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত" বলিয়া নামকরণ করা হইল। শ্রীধরের যাবতীয় বিষয়ের ভার তদীয় শ্যালক জীবিতকাল অবধি গ্রহণ করিবেন। জ্যোতিষপ্রসাদ তাহার তত্ত্বাবধারণ করিবেন। উভয়ে পরামর্শ করিয়া যাহাতে এই সংকীর্ত্তি বজায় থাকে, তাহা করিবেন—এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

এইরূপ করিতে সমস্ত দিবা অতিবাহিত হইয়া গেল। সন্ধ্যাকালে নলিনাক্ষ গৃহে আগমন করিলেন। পতিব্রতা নিরুপমা স্বামী-পদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন, দেবতার আবাহন করিলেন। যেরূপ ভাবে পূজা ও ভোগ প্রদান করিলে দেবতা সন্তুষ্ট হন, ভক্তিমতী নিরুপমা তাহাতে ক্রটী করিলেন না। সদাই যোড়হস্তে, স্বামী যাহা বলিতেছেন তাহা প্রতিপালন করিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতেছেন না। দাস দাসী সকলেই সাগ্রহে প্রভুর সেবায় তৎপর। বৃদ্ধ ত্রিলোচন ও রূপচাঁদ আজ অনন্য-কর্ম্মা হইয়া প্রভুর আজ্ঞা পালনে যত্নবান। চুম্বকের আকর্ষণে যেমন লৌহের সংগতি হয়, নলিনাক্ষের আকর্ষণে তাহাদেরও সেইরূপ হইয়াছে। তাহারা এখন ধর্ম্মভাবেই জীবন অতিবাহিত করিতেছে।

ক্রমে গভীর রজনী সমাগত। নলিনাক্ষ আহারাদি সমাপন করিয়া শয়ন করিলেন। নিরুপমা পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ পাইলেন, তার পর পুত্রকে দুগ্ধ পান করাইয়া শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ, নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে জীবজগৎ সুপ্ত—কাহারও সাড়াশব্দ নাই। নিরুপমাও পুত্রক্রোড়ে স্বামীর পদতলে তন্দ্রামগ্না; সতী আলু থালু বেশে পতি পদতলে সুখে ঘুমঘোরে অচেতন। নলিনাক্ষের চক্ষে নিদ্রা নাই; পরদিন প্রত্যুষেই গুরুদক্ষিণার আয়োজনে গৃহত্যাগ করিতে হইবে। একদিকে মায়ার আকর্ষণ, অপরদিকে ধর্ম্মের আকর্ষণ, নলিনাক্ষ কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে শয্যার উপরিভাগে বসিয়া রহিলেন। কিন্তু আর কতক্ষণ বসিয়া থাকিবেন। ধর্ম্মের নিকট মায়ার প্রভুত্ব কতক্ষণ, মায়া পরাজিত হইলেন। মায়া বিবাদিত চিত্তে

পরাজয় স্বীকার করিয়া নলিনাক্ষকে পরিত্যাগ করিলেন। পর-দুঃখকাতর মহাত্মা শাক্যসিংহ জীবের জরামরণ-ভয় নিবারণের প্রতিকারকল্পে বদ্ধ-পরিকর হইয়া যেমন সদ্য-প্রসূতা গোপার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, পাঠক! আপনারা স্থির চিত্তে একবার অনুভব করুন, এ দৃশ্য তাহা অপেক্ষাও চমকপ্রদ—হৃদয়-বিদারক। নলিনাক্ষ প্রিয়তমা পত্নীকে জাগাইলেন। পতির পদ্মহস্ত নিরুপমার গাত্রস্পর্শ হইবামাত্র সতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি সসব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—"কেন প্রাণেশ! শয্যার দোষে কি নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে, অথবা শারীরিক কোন অসুস্থতা বোধ করিতেছেন?"

নলিনাক্ষ বলিলেন—"প্রিয়ে! শ্রীগুরুর দর্শনে বিফল-মনোরথ হইয়া অবধি, আমি শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা অত্যধিক ভোগ করিতেছি। ইহা তোমার শয্যার দোষ নহে। তোমার ন্যায় পতিব্রতা স্ত্রী যাহার পার্থিব সুখের জন্য ব্যস্ত, তাহার আবার অসুখ কিসের? অন্য কোনও অসুখ এ দেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। তবে তোমাকে কতকগুলি কথা বলিবার জন্য এই অসময়ে জাগ্রত করাইয়াছি।"

নিরুপমা।—প্রভু! দাসীকে আহ্বান করিবেন, আবশ্যক হইলে তাহাকে জাগ্রত করিবেন, তাহার জন্য আবার সময় অসময় কি? স্বামীর দাসীবৃত্তি করিতে পারিলেই ত রমণীর জীবন সার্থক। রমণী জাতি পতির সেবা না করিয়া নিদ্রাকালে যে সময়টুকু ক্ষতি করে, তাহা আমার বিবেচনায় অপব্যয় হয় মাত্র।

পাঠক! নিরুপমার হৃদয় পরীক্ষা করুন, এরূপ অকপট

অনুরাগ, এরূপ প্রগাঢ় ভালবাসা আপনারা আজকাল দেখিতে পান কি? কিন্তু এ ভালবাসা, এ অনুরাগ ভারতেই ছিল। কেবল ভারতেই ইহার জন্মস্থান, ইহা পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজিয়া পাইবেন না ইহা ভারতবাসীরই নিজস্ব। হায়! সে দিন গিয়াছে, রমণী শিরোমণী ভারত ললনাগণ এ অনুরাগ, স্বামীর প্রতি এরূপ অকপট ভালবাসা এখন ভুলিয়া গিয়াছে। এখন তাহার স্থলে বিলাসিতা, স্বার্থপরতা, অর্থের মোহ আসিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছে। হায়, হায়! ধর্ম্মের ঘরে পাপ-চোর প্রবেশ করিয়া সব নষ্ট করিয়া দিয়াছে আছে কেবল মর্ম্মদাহী স্মৃতি, কিন্তু তাহাও এত সুখের যে ভাবিলেও প্রাণ আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠে।

নলিনাক্ষ বলিলেন—"না প্রিয়তমে! দেহী মাত্রেরই এ সকল ভোগের নিতান্ত আবশ্যক—নিদ্রা না হইলে শরীর ধারণ হইবে কেন, শরীর ধারণ না করিতে পারিলে, শরীর সুস্থ না হইলে ধর্ম্ম উপার্জ্জনই বা হইবে কেমন করিয়া? তুমি জান,—

"শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম-সাধনং।"

নিরুপমা। হাঁ প্রভু! জানি, কিন্তু স্ত্রীলোকের স্বামীর নিকট তাহা সম্ভব হইতে পারে না। স্বামীই স্ত্রীর শরীর, মন, জীবন, মরণ। স্বামীর জন্য তাহাদিগকে সব করিতে হইবে। তবে সে সহধর্ম্মিণী নামের যোগ্য হইতে পারিবে।

পতিভক্তি বিষয়ক তর্কে পতিভক্তি-পরায়ণা রমণীর নিকট সকলকেই যে পরাজিত হইতে হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

নলিনাক্ষ হার মানিলেন, তিনি হাস্য আস্যে বলিলেন—

"স্বামীর জন্য যে স্ত্রী সমস্ত সহ্য করিতে পারে, সেই সহধর্ম্মিণী নামের যোগ্যা, এ কথা কেবল তোমারই মুখে শোভা পায়। এইজন্য তোমার সহিত গুরু অন্বেষণ বিষয়ক পরামর্শ করিব বলিয়া জাগরিত করিয়াছি।"

নিরুপমা। বলুন, তাহার জন্য ইতস্ততঃ কেন প্রভু!

নলিনাক্ষ। দেখ গুরুদেবের ত দর্শন পাওয়া যাইতেছে না, তাঁহার সংবাদ পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। নতুবা প্রত্যবায় ভাগী হইতে হয়। আর তুমি জান, এখনও আমার গুরুদক্ষিণা বাকী আছে। জীবন ত শেষ হইতে চলিল, তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিলে ত জীবন কাটিয়া যাইবে। গুরুদক্ষিণার ব্যবস্থা ত হইল না। তাঁহার দক্ষিণা গ্রহণের বিষয় ত তোমাকে কতবার বলিয়াছি, এক্ষণে সেই কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনার প্রয়োজন হইয়াছে। তোমাকে যথার্থ সহধর্ম্মিণী বলিয়াই আমার বিশ্বাস। অতএব অম্লান-বদনে আমাকে বিদায় দাও, আমি গুরুর অন্বেষণ ও তাঁহার দক্ষিণা দান করিয়া, আমাদের ইহ-পরকালের পথ মুক্ত করি, তুমি আমার সহায় হইয়া এই আশ্রম রক্ষা কর।

নিরুপমা একেবারে স্তম্ভিত হইলেন কিন্তু মর্ম্মাহত হইলেন না, কারণ আত্মসুখ ত তিনি সুখ বলিয়া মনে করেন না, স্বামীর যাহাতে সুখ, তাহাই তাঁহার পরম সুখ! নিরুপমা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, ছল ছল নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নলিনাক্ষ বলিলেন-"নিরুপমা একি? তোমার ন্যায় স্ত্রীর এরূপ করা উচিত নহে। ধর্ম্ম-কর্ম্মে সহায় হওয়াইত সহধর্ম্মিণীর

কর্ত্তব্য। সে কথা এইমাত্র ত তুমিই বলিলে, তবে বিচলিত হইতেছ কেন?"

নিরুপমা বলিলেন—"কতদিন বিলম্ব হইবে?"

নলিনাক্ষ। তা কেমন করিয়া বলিব, মায়ের কৃপা হইলে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব, তৎপরে তুমি অনুকূল হইয়া মায়ের নিকট প্রার্থনা কর, চিত্ত স্থির কর।

নিরুপমা আর কোন কথা বলিলেন না—স্বামীকে হাসিতে হাসিতে তপস্যায় প্রেরণ করিলেন যোগ্যং যোগ্যেন যুয্যতে—যেমন স্বামী তার তেমনি স্ত্রী। নলিনাক্ষ গুরুর অন্বেষণ করিয়া তাঁহার দক্ষিণা দিবার জন্য দুর্গানাম স্মরণ করতঃ শুভ প্রস্থান করিলেন।

নিরুপমা সেই দিন হইতে আশ্রমবাসিনী ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় স্বামীর মোহনমূরতি হৃদয়ে স্থাপন করিয়া ধ্যান-নিরতা হইলেন। উন্মিলীত নেত্রেও তিনি চক্ষের সম্মুখে সেই মূর্ত্তির আবির্ভাব দেখিতে লাগিলেন।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভক্তিমার্গ।

অকপট অনুরাগ ভিন্ন, ভগবদ্ করুণা লাভ হয় না। মানসিক বৃত্তিনিচয় বিষয়ান্তরে বিনিবিষ্ট রাখিয়া, বক-ধার্ম্মিকের ন্যায় মুখে কেবল "হরিবোল, হরিবোল" বলিলে, অনন্ত জীবনেও উদ্ধারের আশা নাই। ভগবদ্সাধনমার্গ সমূহ মধ্যে ভক্তিমার্গই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও বিঘ্ন-বিরহিত,—তাই সকল শাস্ত্রে এবং সকল সাধকমুখে উহার ভূয়সী গুণ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির আসন বহু উচ্চে অবস্থিত। যেহেতু, প্রকৃত জ্ঞানলাভ বড়ই দুরূহ এবং দুরারাধ্য। এ সংসারে প্রকৃত জ্ঞানী বড়ই বিরল। পক্ষান্তরে ভক্তির সহজ সাধ্য সুগম পথ অবলম্বন করিলে, সাধক সামান্য আয়াসে অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হইতে পারেন। জ্ঞানের সিদ্ধান্ত সর্ব্বদা অভ্রান্ত হয় না, তাই অনেকে বলিয়া থাকেন—"জ্ঞানকে কখন বিশ্বাস করিও না।" সিকতাময় ক্ষেত্রোপরিস্থ সৌধের স্থায়িত্ব যেমন অনিশ্চিত, জ্ঞানের সিদ্ধান্তেরও প্রায় সেইরূপ নিশ্চয়তা নাই। কল্য কোন জ্ঞানী, যে বিষয় অভ্রান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, অদ্য অন্য একজন জ্ঞানী তাহা ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতিপাদন করিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে আর একটি নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়া বুঝাইলেন যে, এইটিই প্রকৃত প্রস্তাবে অভ্রান্ত। কিন্তু অদ্যকার

সত্যটিই যে নিরঙ্কুশ, এমন কথা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে? কে বলিতে পারে, এই সত্যটিই আর একদিন অন্য কোন জ্ঞানী কর্তৃক অসার প্রতিপন্ন হইয়া পরিত্যক্ত হইবে না? ফলতঃ জ্ঞানের এই ক্ষণভঙ্গুরতা দর্শনে জ্ঞানানুশীলনকারীদের অনেক সময়ে জ্ঞানবাদের উপর বিশ্বাসবিহীন ও বীতশ্রদ্ধ হইতে হয়।

যে বসুন্ধরা সেই অনন্ত জ্ঞানময় বিরাটপুরুষ-সৃষ্ট অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় বালুকাকণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র এবং এই পরিদৃশ্যমান ক্ষুদ্র বসুন্ধরার একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতত্ত্ব নির্ণয় করিবার শক্তি, এখন যাহাদের কল্পনামার্গের সুদূর প্রান্তে সমুপস্থিত হইতে নিতান্ত অশক্ত; এই ক্ষুদ্রতম বসুমতীর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবীয় শক্তি কোন্ শক্তিবলে সেই বিরাট মহীয়সী শক্তির মহত্তত্ত্ব অবধারণে সমর্থ হইবে? যাঁহার অনন্ত জ্ঞানবলে অনন্ত আকাশমার্গে অনন্ত গ্রহ পরম্পরা অনুক্ষণ অনন্তপথে ধাবমান রহিয়াছে, যাঁহার অনির্ব্বচনীয় মহিমাচ্ছটায় জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শনস্বরূপ অদ্ভুত তেজাধার দিনমণি, অনুদিন আকাশমার্গে বিরাজমান থাকিয়া সৃষ্টিজগতের অপূর্ব্ব বৈচিত্র বিধান করিতেছেন, যাঁহার অলঙ্ঘ্য আজ্ঞায় এবং অপ্রতিহত শাসনগুণে দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন যথাক্রমে ও যথানিয়মে গমনাগমন করিতেছে, যাঁহার নিদেশক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষাদি ষড় ঋতুসঙ্ঘ পর্য্যায়ক্রমে সমুপস্থিত হইতেছে, যাঁহার আদেশ অনুসারে বারিধি বক্ষ হইতে অপূর্ব্ব কৌশলে এবং অলক্ষ্য শক্তিবলে বাষ্পরাশি উদ্গত হইতেছে এবং সেই বাষ্পরাশি আবার মেঘাকারে পরিণত এবং দিগ্‌দিগন্তে বিস্তারিত হইয়া ধরণীপৃষ্ঠে

অজস্রধারে সুধারাশি সিঞ্চনপূর্ব্বক জীব উদ্ভিজ্জের জীবনীশক্তি সংরক্ষণ, সংপোষণ ও সংবর্দ্ধন করিতেছে, সেই অশেষ-মঙ্গলময় মহামহেশ্বরের মহিমা-সীমা কীটাণুকল্প ক্ষুদ্র মানব, কোন্ জ্ঞানবলে নির্ণয় করিবে ?

ভাই জ্ঞানগর্ব্বি! বল দেখি, তোমার জ্ঞানের মাত্রা কতটুকু ? সৌরজগতের সকল গ্রহের কথা বলিতে চাহি না,—বল দেখি, তোমার আধারভূতা এই ধরিত্রী সম্বন্ধেই বা তুমি কতটুকু তথ্য নির্ণয় করিতে পারিয়াছ ? শুনিতে পাই, উন্নত পর্ব্বত-শিখর হইতে গভীরতম রত্নাকরগর্ভের কিঞ্চিৎমাত্র বিবরণ তোমার জ্ঞাননেত্রের বিষয়ীভূত হইয়াছে ; কিন্তু উন্নত পর্ব্বত চূড়া হইতে সুগভীর সমুদ্রগর্ভের পরিমাণ কয়েক মাইল মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব যদি পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ আট সহস্র মাইল অবধারিত হইয়া থাকে, তবে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, তোমার কাদামাখা মাত্র সার হইয়াছে,—প্রকৃত জ্ঞাতব্য বিষয় এখন তোমার বহুদূরে পড়িয়া আছে।

ভাই জ্ঞানি! তোমার অনুমান-সূত্র পরিত্যাগ করিয়া বল দেখি, কি কৌশলে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে ? কি কৌশলে ক্ষিত্যপ্তেজো-মরুদ্ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হইয়াছে ?—কি কৌশলে ঐ পঞ্চ মহাভূতের যোগ বিয়োগে অসংখ্য, অনন্ত, অপ্রমেয় জীব, উদ্ভিজ্জের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিলয় হইতেছে ?—কি কৌশলে অনুপ্রমাণ বীজ হইতে অভ্রস্পর্শী মহাদ্রুমের উৎপত্তি হইতেছে এবং কি কৌশলেই বা জড়ময়-বপু দেহিদিগের কলেবরে, বিচিত্রজ্ঞানময়ী চৈতন্য-শক্তির আবির্ভাব হইতেছে ? হে ভাই জ্ঞানি! যদি তুমি এই সকল বিষয়ের

প্রকৃত সত্য আবিষ্কারে সমর্থ হও, তবেই ত তোমার জ্ঞানবত্তার গৌরব করিব? নচেৎ অবশ্য বলিব,—এই ক্ষুদ্রতম পৃথিবীর গোটাদুই অকিঞ্চিৎকর তথ্য নির্ণয় করিতেই যখন তোমার জ্ঞান-বৃত্তির এত দুর্দ্দশা, তখন সেই বিরাট জ্ঞানময়ের বিচিত্র-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে যাওয়া তোমার পক্ষে নিতান্তই বাতুলতার পরিচায়ক নয় কি? তাই বলিতেছি, হে জ্ঞানগর্ব্বি! তোমার জ্ঞানের গরিমা পরিত্যাগ কর, সন্তরণ দ্বারা সিন্ধু অতিক্রমের অলীক প্রয়াস প্রকাশে আর উপহাসাস্পদ হইও না।

জ্ঞানানুশীলন দ্বারা তুমি বহু জন্মেও ঈশ্বরের স্বরূপ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারিবে না। তাহা হইলে অশেষ শাস্ত্র-পাঠি, জ্ঞানমার্গের আজীবন সাধক বামদেব শাস্ত্রী কখন জ্ঞানমার্গ পরিহার করিয়া অবশেষে ভক্তিমার্গকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সমস্ত পরি-ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন গিরিগুহায় আশ্রয় লইতেন না। তাই বলি, যদি ঈশ্বরের কৃপালাভে অভিলাষ থাকে, ভক্তিমার্গের পথিক হও, ভক্তিভরে তাঁহার নাম জপ কর, জ্ঞান বিজ্ঞানের জটিল জঞ্জাল পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে ডাকিতে থাক, মনে প্রাণে এক করিয়া, কেবল তাঁহাকে ডাকিতে থাক, সেই অভয় চরণ-সরোজে চিত্ত সংযোজন করিয়া, কেবল তাঁহাকে ডাকিতে থাক, তদ্গতপ্রাণ হইয়া, তন্ময়চিত্ত হইয়া, অটল বিশ্বাসভরে ডাকিতে থাক,—দেখিবে, তোমার জ্ঞানগবে-ষণা, প্রমাণ পর্য্যবেক্ষণা, বিজ্ঞান অবিজ্ঞান কিছুরই প্রয়োজন হইবে না। একমাত্র ভক্তিবলে তুমি অনায়াসে সেই জ্ঞানাতীত বোধাতীত, কল্পনাতীত অনন্তশক্তিস্বরূপিণী জননীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া চরমে পরম পরমার্থ লাভে সমর্থ হইতে পারিবে।

হৃদয়ে অকপট ভক্তি থাকিলে, অবশ্যই ঈশ্বরের করুণা আকর্ষণে সমর্থ হওয়া যায়।

নলিনাক্ষ চিরকালই আগ্রহ করিয়া সরল বিশ্বাস ও ভক্তি-রত্নে হৃদয়-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন। শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকিলেও তিনি নির্জ্জনে মহামায়ার নামে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া হৃদয়ে যেরূপ বিমল আনন্দ লাভ করিতেন, ভগবানে যেরূপ আত্মনির্ভর করিয়া তন্ময় হইতে পারিতেন, এমন আর কিছুতেই পারিতেন না। জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিয়া আজীবন গুরুদেবের পরিতাপ ও আত্মগ্লানি শ্রবণ করিয়া, তিনি বুঝিয়াছিলেন – জ্ঞানে সেই বিশ্বজ্ঞানের আধার-স্বরূপা বিশ্বেশ্বরীর প্রসাদ লাভ করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র, তাই তিনি শ্রীরামপ্রসাদের নিকট ভগবতীর প্রেমমাখা নামকীর্ত্তন শুনিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন, কেবল ভক্তি-পথের পথিক হইয়াই তিনি অবলীলাক্রমে নবাব দরবারে অরণ্যচর হিংস্রক ব্যাঘ্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে স্তম্ভিত ও মোহিত করিতে পারিয়াছিলেন। বিনা ভক্তিতে কোন মানব কখন মুক্তিলাভের অধিকারী হইতে পারে নাই। তুমি মূর্খ হও, আর বিদ্বানই হও, হৃদয় ভক্তিময় করিতে না পারিলে, তোমার সমস্ত যে এককালে পণ্ড হইবে, অভীষ্ট লাভে তুমি যে চিরবঞ্চিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ভগবান তোমার ব্যাকরণ-সঙ্গত নির্ভুল স্তবপাঠের আবৃত্তি শুনিয়া মোহিত হইবেন না। তোমার বাগাড়ম্বর পরিপূর্ণ শ্লোকাবলীর গুরুগম্ভীর দুন্দুভিনিনাদ শ্রবণে মহামহিমময় জগৎকর্ত্রী বিশ্বজননীর চিত্ত বিচলিত হইবে না। হৃদয়ের অকপট ভক্তিস্তরে তুমি যাহা বলিবে, যেরূপভাবে

ডাকিবে তাহাতেই সেই ভক্তের ধন তোমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইবেন। এই জন্যই তো সাধক বলিয়াছেন—

মূর্খ বদতি বিষ্ণায়, ধীরো বদতি বিষ্ণবে,
দয়োরেব সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।

ভাই! বৃথা আড়ম্বর ছাড়িয়া মায়ের নামে পাগল হও, অশান্ত বালকের মত কেবল প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ধরাতল অভিষিক্ত কর, দেখিবে তোমার কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনার আবশ্যক হইবে না, যোগ-যাগে শরীর নষ্ট করিতে হইবে না। তুমি সামান্য আয়াসে সেই ভবের আরাধ্য-ধন ভবভাবিনীর চরণতলে আশ্রয় লাভ করিয়া ত্রিবিধ তাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

নলিনাক্ষ গৃহ হইতে বাহির হইয়াছেন। ভক্তিভরে কেবল মাতৃনাম মহামন্ত্র হৃদয়ে জপ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। এক্ষণে তাহার দুইটী উদ্দেশ্য—গুরুর অন্বেষণ করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ এবং তাঁহার নিরুদ্দিষ্টা কন্যারূপিণী মহামায়ার উদ্ধার সাধন করিয়া দক্ষিণা-দান। নলিনাক্ষ প্রথমতঃ সকল তীর্থ পর্যাটনের অভিলাষ করিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দূরস্থিত তীর্থেই তিনি প্রথম দর্শনাভিলাষী হইলেন। তীর্থভ্রমণে মানসিক বৃত্তি-নিচয়ের অনেকটা সাম্যভাব উপস্থিত হয়। যে মন প্রমত্ত বারণ সম ছুটাছুটি করিয়া বৃথা বিষয়ে তোমাকে ইতোনষ্ট ততোভ্রষ্ট করিয়া ফেলে; তীর্থাদির মহিমায় তাহা প্রশমিত করিয়া মনের স্থৈর্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

— ০ঃ)*(ঃ০ —

নিভৃত গুহায়।

বসন্তের মধুময় প্রাতঃকাল। বিন্ধ্যাচলের সানুদেশে নিভৃত গুহায় জনমানবের সমাগম নাই। সম্মুখে বহু যোজন বিস্তৃত প্রান্তর-ভূমি ধূ ধূ করিতেছে, বৃক্ষলতা-বিহীন প্রান্তরের সেই বিশালতা অবলোকন করিলে প্রাণে বাস্তবিক আতঙ্ক উপস্থিত হয়। মলয় সমীরণ হতাশ বিষাদে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া পর্ব্বত গাত্রের বৃক্ষলতাগুলি আন্দোলিত করিতেছে; সেই সমীর স্পর্শে বনস্পতি কম্পিত হইল, কোকিল ডাকিল—সঙ্গে সঙ্গে পাপিয়া আর থাকিতে পারিল না, সেও প্রভাতের বন্দনা করিয়া আপনার স্বর-লহরী ছাড়িতে লাগিল। কিন্তু হায়! কেহ তাহা দেখিল না, কেহ শুনিল না, বায়ু-বিতাড়িত হইয়া দিগন্তে মিশিয়া গেল। এখানে ত কোন বিরহীর বিরহ-বেদনা-জনিত মর্ম্মদাহ নাই যে, সে সমীরণ সুখস্পর্শে, সে কোকিল পাপিয়ার মনোমদ সঙ্গীতে—তাহাদের প্রাণ শিহরিয়া উঠিবে। প্রকৃতির বিশাল গাম্ভীর্য্যের রাজত্বে এ চপলতা কি প্রশ্রয় পাইতে পারে? বহুদূর প্রসারিত, সম্মুখস্থিত প্রান্তরের শেষসীমা হইতে তপনদেব উঁকি মারিয়া অন্ধকার ভাব-গতিক একবার দেখিয়া লইতেছেন, তাঁহার রক্তিম-রাগ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ জগতে যখন সকলেই নিয়মাধীন—তখন সূর্য্যদেব কেন নিয়মের ব্যতিক্রম করিবেন। তিনি ধীরে ধীরে যেন লোহিত

সমুদ্র হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই লোহিত বর্ণ চারিদিকে ছড়াইতে লাগিলেন। এই মধুর প্রাতঃকালে পর্ব্বতগাত্র হইতে সূর্য্যদেবের প্রথম অভ্যুদয় যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই মোহিত হইয়া সেই বিশ্বপতি বিধাতার বিচিত্র কৌশল-জালে আবদ্ধ হইয়া বাক্‌শক্তি বিরহিত হইয়াছেন। যিনি ভাবুক, তিনি সেই ভব-সাগরে ভাসিয়া কল্পনার সাহায্যে কত নূতন নূতন কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। আর যাঁহারা ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—তাঁহারা এই বিশ্বলোচন ভাস্করের প্রথম দর্শনে করযোড়ে কত স্তুতি-গান করিয়া প্রাণের দীনভাব জ্ঞাপন করিতেছেন। দুইজন তাপস প্রাতঃকাল সমাগত দেখিয়া প্রফুল্লিত মনে পর্ব্বত-গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমতল ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। সূর্য্যদেবকে প্রণিপাত করিয়া নিকটস্থিত নির্ঝরণীতে স্নান করিলেন। পরে আপনাদের নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিবার মানসে সুউচ্চ পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া দেবী-মন্দিরে পূজায় উপবেশন করিলেন। এই নিভৃত-নিবাসে সংসারের কোলাহল নাই; সংসারের কলুষ রাশি এখানকার প্রাণিগণকে কলুষিত করিতে পারে না। শান্তির আগার, আনন্দের লীলা-নিকেতন এই নিভৃত পর্ব্বত প্রদেশে আসিলে অতি বড় অধার্ম্মিকেরও হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বদ্ধমূল হইয়া যায়। এই জন্য সাধু-সন্ন্যাসী, যোগী-যতি, সকলেই এই পর্ব্বত গুহার আশ্রয়ে আপনার দেহ মন পবিত্র করিয়া থাকেন।

প্রায় দুই প্রহরের পর পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী দুইজন পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া পুনরায় সেই গুহায় আগমন করিলেন। এই সন্ন্যাসী দুই জনকে সমবয়স্ক বলিয়াই বোধ হয়; অদ্ভুত

তপঃপ্রভার বিশিষ্ট শরীর-জ্যোতিঃ দেখিলে সিদ্ধ-পুরুষ বলিয়াই অনুমান হইয়া থাকে। একজন অপরকে বলিলেন—"ভাই বামদেব! এত দিন যদি তুমি বৃথা কাজে অতিবাহিত না করিয়া এইস্থানে আসিতে, তাহা হইলে কত উন্নতি করিতে পারিতে। যাহা হউক, তুমি যে আজীবন লোকালয়ে থাকিয়া সকল প্রকার লোকের সঙ্গলাভ করিয়া এত শীঘ্র চিত্ত-সংযত করিতে পারিয়াছ, ইহাতে তোমাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ভাই যোগানন্দ! তুমি কি মনে কর, জগতের সমস্ত কাজ ইচ্ছা করিলেই মানুষে সমাধা করিতে পারে? মানুষের ইচ্ছায় কোন কাজ হয় না, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ব্যতীত মানুষ কোন কাজ করিতে সক্ষম হয় না। এতদিন তিনি আমাকে সংসারপঙ্কে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমি আত্মহারা হইয়া তাহাতেই সুখবোধ করিয়াছিলাম, তিনি সেই পাপপঙ্ক হইতে দয়া করিয়া উত্তোলন করিয়াছেন—মোহঘোর কাটিয়া দিয়াছেন—তাই এই মনোরম প্রদেশে আসিয়া মায়ের কৃপা লাভ করিতেছি।

প্রথম সন্ন্যাসী। আচ্ছা বামদেব! এখন কি সংসারের কাহারও চিন্তা তোমার মনোমধ্যে উদিত হয়; কোন চিন্তা কি এখন তোমার সুস্থ চিত্তকে অস্থির করিতে পারে?

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী। যোগানন্দ! আমার কেবল সময়ে সময়ে নলিনাক্ষের চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হইয়া চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত করে। তাহার কথা আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই, কখনও যে পারিব—তাহাও বলিতে পারি না।

পাঠক! এই দুইজন সন্ন্যাসীকে বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছেন। কন্যাভাবের সাধক ভক্ত বামদেব নলিনাক্ষকে বিদায় দিয়া পরকাল নিস্তারের জন্য এখানে আগমন করিয়াছেন। বামদেব এখন কন্যা ভাবেই মায়ের আরাধনায় নিরত; যে সময় তিনি ভক্তিমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই সময় সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ নিজের সাধনাবলে ভক্তাধীনা ভগবতীকে কন্যাভাবে নিজের বেড়া বান্ধাইয়াছিলেন। এই কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইলে, তিনি একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন।

পূর্ব্ব হইতেই বামদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল। অশেষ শাস্ত্রপাঠী জ্ঞানগর্ব্বী বামদেবকে সকলেই মান্য করিত। রামপ্রসাদ এই অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী নির্লোভ ব্রাহ্মণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন বটে; কিন্তু তিনি যে নিজের দোষে সমস্ত নষ্ট করিতেছেন, সমুদ্রের কূলে বাস করিয়া যে, পিপাসায় মারা যাইতেছেন, তাহা তিনি বামদেবের সাক্ষাতেই কতবার বলিয়াছেন। অদ্য তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—"পণ্ডিত মহাশয়! আজ যে বড় দয়া দেখিতেছি, এতদূর পরিশ্রম করিয়া আসিবার কারণ কি?"

বামদেব তাঁহার কথায় কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কেবল হেঁটমুণ্ডে নেত্রনীর বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রামপ্রসাদ তাঁহাকে এইরূপ অবস্থাগ্রস্ত দেখিয়া বলিলেন—"শাস্ত্রী মহাশয়! এখন বুঝিয়াছি, আপনার মতি স্থির হইয়াছে, জ্ঞান-গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে। জননীকে পাইতে হইলে কান্না ভিন্ন উপায় নাই, কেবল ভক্তিভরে তদ্গতচিত্ত হইয়া যদি কাঁদিতে

পারেন, তবেই তাঁহাকে পাইতে পারিবেন। নতুবা কেবল জ্ঞানানুশীলন দ্বারা ত্রিগুণাতীতা ভগবতীর দর্শনলাভ অসম্ভব। আপনি নিজে কিছু করিতে পারিলেন না; কিন্তু আপনার শিষ্য নলিনাক্ষ আজ মুক্তির পথ দেখিতে পাইয়াছে। তাহার প্রাণ ভক্তিময়, হৃদয় ভক্তিময় হইয়াছে তাহার উদ্ধারের আর ভাবনা নাই।"

বামদেব শাস্ত্রী তারপর রামপ্রসাদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তিনি এতদিন যে কেবল বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছেন, তাহার জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন। সরলপ্রাণ রামপ্রসাদ তখন বলিলেন—"আজ সমস্ত বুঝিয়াছি; আপনি একমাত্র কন্যার জন্যই গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, বাৎসল্যভাব আপনার হৃদয়ে বড়ই প্রবল, অতএব আপনি বাৎসল্য ভাবেই ভগবতীর আরাধনায় সফলকাম হইবেন।" সেই অবধি বামদেব কন্যা ভাবে মায়ের আরাধনায় রত হইয়াছেন। এই জন্যই নলিনাক্ষকে তিনি কন্যার অন্বেষণ করিতে বলিয়াছিলেন।

বামদেব নিজ কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন—শ্যামা। রূপে এবং গুণে শ্যামা ঠিক শ্যামা মায়েরই অনুরূপা। সেই কাল মেঘের ন্যায় বর্ণ, সেই টানা টানা বড় বড় চক্ষু, ঘনকৃষ্ণ কেশ-রাশি আগুল্ফ বিলম্বিত, কন্যাটীকে দেখিয়া সকলেই বলিত—আহা! মেয়ে ত নয় যেন শ্যামা ঠাকরুণ! প্রসাদের আদেশের পর হইতে তিনি যেন চারিদিকেই সেই নিরুদ্দিষ্টা কন্যাকে দেখিতে লাগিলেন। তাই তিনি কন্যা ভাবে তন্ময় হইয়া নলিনাক্ষকে কন্যার উদ্দেশ করিতে আদেশ করিয়াছেন। নলিনাক্ষও জানিতেন—গুরুদেব কন্যার জন্যই পাগল। এই জন্য

তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উক্তরূপ দক্ষিণাদানেই প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এইরূপ হৃদয়ে ভাবনা, এইরূপ হৃদয়ে ধারণা এবং এইরূপ রমণীর অন্বেষণ-তৎপর হইলে তাঁহার গুরুকন্যার অন্বেষণও হইবে; পরন্তু মহামায়াকেও প্রসন্ন করিতে পারিবেন। ইহাতে তাঁহার আহার ঔষধ দুইই হইবে!

কিছুদিন হইল নলিনাক্ষ সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। যোগানন্দ ইতিপূর্ব্বে নলিনাক্ষের ভাবগতিক দেখিয়া আসিয়াছেন, তিনি বলিলেন—"তোমার নলিনাক্ষ, সংসারী হইয়াছিল, তাহার একটী পুত্ররত্ন লাভ হইয়াছে, তাহার পর এখন সে তোমার দর্শন জন্য পাগল হইয়াছে! আমি দেখিয়া আসিয়াছি, সে তোমার দর্শন লাভ জন্য ও তুমি যে কন্যা-অন্বেষণ রূপ প্রলোভন দেখাইয়াছ, তাহার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছে।"

বামদেব বলিলেন—"যোগানন্দ! আমি এই জন্যই কিছুদিনের জন্য লোকালয় পরিত্যাগ করিয়াছি, আমার দর্শন না পাইলে তাহার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি হইবে। তবে তুমি আর বেশী বিলম্ব করিও না, তীর্থ ভ্রমণে বাহির হও, তাহাকে দেখিতে পাইলেই বলিও যে তোমার গুরুর জন্য কোন চিন্তা নাই; তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন কর; সময় হইলেই তাঁহার দর্শন পাইবে।"

যোগানন্দ। হাঁ আমি শীঘ্রই যাইব; প্রবোধের নষ্টচরিত্র সংশোধন করিয়া তাহাকেও গৃহত্যাগী করিয়াছি। নলিনাক্ষ গৃহ ত্যাগ করিয়াছে। এক্ষণে গুপ্তভাবে পশ্চাদ্ধাবন না করিলে ত তাহাদের উদ্ধারের উপায় নাই।

পাঠক! শিষ্যের প্রতি গুরুর কিরূপ কৃপা হওয়া উচিত, তাহা এই বামদেব ও যোগানন্দের চরিত্র দেখিয়া উপলব্ধি করুন। এইরূপ গুরু না হইলে কি জীবের পরকাল নিস্তার হয়! গুরুই যে শিব, স্বয়ং মহাদেবই যে জীবের উদ্ধারের জন্য গুরুরূপে কর্ণকুহরে ইষ্টমন্ত্র প্রদান করেন। গুরুদেব মানুষ নহেন স্বয়ং দেবাদিদেব—যে শিষ্য এইরূপ ভাবিতে পারেন, যে শিষ্য এরূপে গুরুকে দর্শন করেন, তাঁহারই মন্ত্রগ্রহণ সিদ্ধ হইয়াছে। মন্ত্রগ্রহণের ফললাভ তাঁহারই অনিবার্য্য। আর যে গুরুদেব শিষ্যের জন্য এইরূপ প্রাণপাত করেন, তিনিই যথার্থ শিব—জগত-গুরু; শিষ্যের অজ্ঞানান্ধকার কাটাইয়া, তাহার মোহাবরণ ছেদন করিয়া যে গুরু এইরূপ ভাবে মুক্তির পথ দেখাইতে পারেন, তাঁহার চরণে কোটী কোটী প্রণাম।

বামদেব।—যোগানন্দ! শ্যামা মাকে গুরুদেবের নিকট দিয়া আসিয়াছ ত?

যোগানন্দ। হাঁ, আমি যখন ডাকাতের হাতে পড়িয়া বিপদগ্রস্ত হই, সে সময় গুরুদেব হঠাৎ তথায় আবির্ভূত হইয়া দস্যুগণকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন। তাহারা তথায় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিল। শ্রীগুরু আমার নিকট তোমার নিরুদ্দেশ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"বামদেব! পরকাল নষ্ট করিতেছে, অতএব এই মায়ার ধন আর তাহার নিকট রাখিয়া কায নাই, আমিই ইহাকে লইয়া যাই; সময় হইলে আমি তাহার সহিত মিলিত হইয়া, তাহার কন্যা তাহাকে অর্পণ করিব এবং পরিণয়াদির ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

বামদেবের আর কোন চিন্তার কারণ রহিল না। যিনি

তাঁহাকে কন্যারূপ জগদম্বার আরাধনা করিতে বলিয়াছেন; তিনিই আবার সেই কন্যার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে আর চিন্তার বিষয় কি আছে। বামদেব দ্বিগুণ উৎসাহে গুরু-প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া পরমানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

যোগানন্দ অনেকদিন আসিয়াছেন—আর এখানে থাকা ভাল দেখায় না। দুইটী প্রধান শিষ্যকে এই দুর্দ্দিনে মায়াময় সংসারে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছেন, পাছে তাহারা আত্মহারা হয়, পাছে তাহারা হতাশ হইয়া মধ্যপথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইহ পরকাল নষ্ট করে, এইজন্য তিনি তথায় আর কালবিলম্ব না করিয়া লোকালয়ে এবং তীর্থস্থানে তাহাদের অনুসরণ জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। যোগানন্দ সাধনমার্গে বামদেব হইতেও উন্নতি করিয়াছেন, তাঁহার আর পতনের সম্ভাবনা নাই। এইজন্য তাঁহাদের গুরুর আদেশে, যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম যোগানন্দই করিবেন। বামদেব এখন কিছুকাল আপনার কার্য্য বিশেষ যত্নের সহিত প্রতিপালন করুন। এতদিন যেরূপভাবে জীবন কাটাইয়াছেন, এখন আর সেরূপ করিলে চলিবে না, গণা দিন ফুরাইয়া আসিতেছে।

ধর্ম্ম উপার্জ্জনের জন্যই মানবদেহ ধারণ, এই সুদুর্লভ দেহ ধারণ করিয়া যাহার ধর্ম্মোপার্জ্জন না হইল তাহার ত সমস্তই পণ্ড, অতএব গুরুর আদেশে, বামদেব এখন কিছুকাল অনন্যচিত্ত হইয়া আপনার জীবনের পথ পরিষ্কার করুক। এই দেবাদেশেই বামদেব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে বনচারী হইয়াছেন, দুশ্চর তপশ্চরণে দেহপাত করিতেছেন। বিন্ধ্যাচল তখন তাপস-আশ্রমের কেন্দ্র

ছিল, বহু তাপস সেই নির্জ্জন গিরিকন্দরে বাস করিতেন। এই সকল তাপসের প্রতি লক্ষ্য করিলে, তাহাদের তপঃক্লিষ্ট দেহজ্যোতিঃ ও বদনমণ্ডলের প্রফুল্ল ভাতি দেখিলে বাস্তবিকই তাহাদের চরণ সরোজে প্রণিপাত করিয়া স্বতঃই ধন্য হইতে ইচ্ছা হইত। একদিন এই সিদ্ধাশ্রমবাসী সন্ন্যাসীগণ ধর্ম্মের বন্যা প্রবাহিত করিয়া জগৎ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দেশের কথা।

প্রবোধের গৃহত্যাগের পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরের মধ্যে দেশের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কত পুরাতন গিয়াছে, কত নূতন আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। কত অরণ্য নগর হইয়াছে, আবার কত জনপদ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। কত জানা লোক ইহ-সংসার হইতে চিরতরে প্রস্থান করিয়াছে, তাহার স্থলে কত অজানা লোক আসিয়া আবার কয়েকদিন সংসার উজ্জল করিতেছে। দেশের অবস্থা এখন অতীব ভয়ানক, চারিদিকে ঘোর দুর্দ্দৈব উপস্থিত। সিরাজুদ্দৌলার অত্যাচারে দেশ ছারেখারে যাইতে বসিয়াছে। সে সময় রাজা রাজবল্লভের ধনের অবধি ছিল না; নবাব তাহার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া—তাঁহার ধন দৌলত কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রাণভয়ে কলিকাতায় ইংরাজের শরণাপন্ন হইলে দেশের অনেক বড় বড় লোক আসিয়া ইংরাজকে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে উৎসাহিত করিতে লাগিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বতোভাবে ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিলেন। নবাব, দেশের লোকের এইরূপ অন্যায় আচরণ ও তাহারা ইংরাজের সহিত একত্র হইয়া ষড়যন্ত্র করিতেছে দেখিয়া, বিপুল বিক্রমে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধে নবাবের জয় হইল। নবাব এই যুদ্ধে ইংরাজের

কলিকাতার কেল্লা জয় করিয়া লইলেন—এই কেল্লা জয়ের পর নৃশংস নবাব যেরূপ ভয়ানক অধর্ম্ম করিলেন—তাহা ইতিহাসে অদ্যাবধি স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। খাম-খেয়ালী নবাব—সেই ক্ষুদ্র দুর্গে কতকগুলি লোক আবদ্ধ করিয়া প্রাণে মারিলেন। ইহাই অন্ধকূপ-হত্যা—ইতিহাসে ইহার বিশদ বিবৃতি রহিয়াছে—এ স্থলে আর তাহার অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। এইবার লর্ড ক্লাইব আসিয়া ইংরাজের পক্ষ সমর্থন করিলেন। ক্লাইবের উপস্থিত বুদ্ধি বড়ই প্রখর ছিল। তিনি নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফরকে কৌশলে হস্তগত করিলেন। দেশের গণ্যমান্য বড় লোক ত পূর্ব্ব হইতেই ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। ক্লাইব ইহাদের সহায় করিয়া প্রথমবার যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন এবং প্রাণপণে সসৈন্যে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু জয়লাভ করিতে পারিলেন না।

ইংরাজ ছাড়িবার পাত্র নহেন। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বিপুল উৎসাহে দ্বিতীয়বার নদীয়ার সন্নিকট পলাশী ক্ষেত্রে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। লঙ্কাধিপতি রাবণ যেমন গৃহশত্রু বিভীষণের জন্য সবংশে নিধন হইয়াছিলেন, বিভীষণ রামের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সমস্ত গুপ্ত বিষয় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন এবং বিভীষণের নির্দ্দেশ অনুসারে রঘুবীর রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। কর্ব্বুরপতি ত্রিলোক-বিশ্রুত বীর লঙ্কেশ্বর সেই যুদ্ধে হতবল, হতমান হইয়া অবশেষে নির্ব্বংশ হইয়াছিলেন, বংশের জলপিণ্ড পর্য্যন্ত লোপ হইয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধে সেইরূপ কেবল মিরজাফরের কূট মন্ত্রণায় নবাবের পরাজয় হইয়াছিল। যদিও দেশের অপরাপর

লোক ইহাতে সাহায্য করিয়াছিল, তথাপি মিরজাফরের দুরভি-সন্ধিই প্রধান। এই যুদ্ধে তাহার শঠতা—তাহার প্রবঞ্চনার কথা শুনিলে বাস্তবিক মানুষকে হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও ভয়ানক বলিয়া মনে হয়। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া মিরজাফর যে কার্য্য করিয়াছিলেন—অতি বড় শত্রু হইলেও তাহা করিতে পারে না। শুধু কি নবাবের পরাজয় হইল—শুধু কি নবাব রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পলায়ন করিলেন! শেষে মিরজাফরের পুত্র মীরণের হস্তে তাঁহাকে নিহত হইতে হইয়াছিল। হায় অর্থ! হায় রাজ্য-লোভ! তুমি মানুষকে পশুত্বে পরিণত করিয়া কিরূপ পাপাভিনয় করিতে পার—তাহা মিরজাফরের চরিত্রে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, কিন্তু সে লোভের বশবর্ত্তী হইয়াই বা কি হইল, সেই রাজ্যই বা কত দিন ভোগ হইল। কেবল কলঙ্ক অর্জ্জন ব্যতীত ইহাতে আমরা লাভালাভ আর কিছুই দেখিতে পাই না। এই পলাশীর যুদ্ধে একটী যুবক দেশের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল; সে আর কেহই নহে,—আমাদের চির-পরিচিত দেশ-হিত-ব্রতে ব্রতী প্রবোধচন্দ্র! প্রবোধ নলিনাক্ষের নিকট হইতে বিদায় হইয়া কিছুদিন প্রচ্ছন্নভাবে নদীয়ায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজের প্রতি এতদিন দৃঢ় ভক্তিমান্ ছিলেন, এইজন্য তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য এতদিন নদীয়ায় তদীয় রাজধানী কৃষ্ণনগরে যাতায়াত করিতেন, তিনি সাধুভক্ত বলিয়াই তাঁহাকে মান্য করিতেন; কিন্তু তাঁহাকে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে দেখিয়া প্রবোধের আর তাঁহার সহিত দেখা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি যুদ্ধ দেখিবার জন্য কিয়দ্দিন পলাশী প্রাঙ্গণের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন;—

এইরূপ ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া নবাবের সৈন্যগণ তাঁহাকে বিপক্ষ-পক্ষ মনে করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহারে উদ্যত হইল। প্রবোধ প্রাণের মায়া করেন না—জন্ম মৃত্যু ত তিনি এখন সমান জ্ঞান করেন—প্রাণে তাঁহার এইরূপ বিবেক ভাব আসিয়াছে। তিনি তিলমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন "আমি বিপক্ষ-পক্ষ নহি, স্বদেশভক্ত,—দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমারও প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে—কিন্তু কি করিব, এ যুদ্ধ করিয়া কোন ফল হইবে না।" নবাবের সৈন্যগণ তাঁহাকে নিজের দলভুক্ত হইতে আদেশ করিল, বলিল—"জয় পরাজয় পরের কথা, তুমি যদি আমাদের দলভুক্ত না হও—তাহা হইলে তোমাকে শত্রু জানিয়া বিনাশ করিব।" প্রবোধ কি করিতে আসিয়া কি করিলেন, শেষে জীবহিংসায় ব্রতী হইতে হইল। কিন্তু দেশের হিতকর কার্য্যে প্রাণপণ করাও ত মহাধর্ম্ম; কেন বৃথায় যবনগণের হস্তে নিহত হইবেন—তাহা অপেক্ষা সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারিলে, শাস্ত্রানুসারে অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে। তাঁহার সংসারের মায়া মমতা, সংসারের প্রলোভন ত আর নাই। তিনি নবাব সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন—কিন্তু জয়ের আশা নাই। পাপের পক্ষ কখন জয়লাভ করিতে পারে না জানিয়া, একদিন গুপ্তভাবে তথা হইতে পলায়ন করিয়া নিজের গন্তব্য পথের অনুসরণ করিলেন।

সেদিন নলিনাক্ষ একভাবে গৃহত্যাগ করিয়াছেন। আর আজ প্রবোধচন্দ্রও একভাবে গৃহত্যাগ করিলেন। প্রবোধ সংসারের পাপাভিনয় দর্শনে হতবুদ্ধি হইয়া, নিজের পাপ কলুষিতচিত্ত বিবেক-বহ্নির সাহায্যে নির্ম্মল করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া-

ছেন। তিনি নানা প্রকার বিভীষিকা দেখিয়া সংসারে বীত-শ্রদ্ধ হইয়াছেন। আর নলিনাক্ষ বুঝিয়াছিলেন জগতের সমস্তই নশ্বর, কিছুই চিরস্থায়ী নহে, এই মায়াময় সংসারের সমস্তই মায়ার খেলা; মায়া-ঘোর কাটিলে, নেশা ফুরাইলে যে যাহার স্থানে চলিয়া যাইবে। এ জগৎ-প্রপঞ্চে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। স্ত্রী পুত্র, পরিবার, ধন-জন-যৌবন—এ সকলই ক্ষণস্থায়ী। দুই-দিন আছে, দুইদিন ইহাদের অস্তিত্ব জগতে বর্ত্তমান, মায়ামুগ্ধ জীব জীবিতাবস্থায় আমার আমার করিয়া বড়ই গণ্ডগোল করিতেছে, যেন এ সংসার তাহার চিরস্থায়ী বাসস্থান, বুঝি এখান হইতে আর তাহাকে কোথাও যাইতে হইবে না। এইরূপ ভাবে বদ্ধজীব জগৎ সংসারে আত্মহারা হইয়া কাল-যাপন করে; কিন্তু নলিনাক্ষ ত সংসারে, আত্মহারা হন নাই। তিনি ইহার ক্ষণস্থায়ী সুখ-দুঃখের বিষয় বিশেষরূপে বিদিত আছেন। তবে আশ্রম-ধর্ম্মের নিয়মানুসারে তাঁহাকে গুরুর আদেশে সংসারে প্রবেশ করিতে হইয়াছে; স্ত্রীপুত্র, ধন ঐশ্বর্য্য লইয়া কিয়দ্দিন থাকিতে হইয়াছে। নলিনাক্ষের আসক্তি কিছুতেই বর্দ্ধিত হয় নাই। থাকিতে হয়—তাই ছিলেন; সংসার করিতে হয়, তাই করিতেন। আত্মীয়তা, পরোপকার সংসারের প্রধান কর্ত্তব্য—ইহা না করিলে নয়, তাই তাহার জন্য এই সকল করিতে যত্নবান হইতেন। এ সকল কার্য্যে ধর্ম্মশিক্ষা হইয়া থাকে, সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম ধর্ম্মশিক্ষার জন্যই আর্য্যঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এইজন্য পূর্ব্বের প্রত্যেক ঋষিগণই আশ্রমী ছিলেন, আশ্রমের মধ্যে থাকিয়া তাঁহারা ভগবানের প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া চরমে পরমগতি লাভ

করিতে পারিয়াছিলেন। এমন কি ভগবদ্দর্শন করিয়া মানব-জন্ম সার্থক করিয়াছেন। মনুষ্য জন্মই দুর্লভ জন্ম; জগতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মানুষ যদি এই জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার জন্মই বৃথা, সে মানুষ নামের অযোগ্য। একেবারে সাধন-মার্গের শীর্ষ দেশে উঠিতে পারা যায় না বলিয়াই মনীষিগণ, এই আশ্রম-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই আশ্রমে মানুষ শাস্ত্রানুসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলে, তাহার পরকাল নিস্তারের আর কোন ভাবনা থাকে না, ইহাই মহাজন বাক্য।

নলিনাক্ষের ন্যায় প্রবোধ এতাদৃশ উন্নত না হইলেও—তাহার চিন্তা অধুনা এরূপ নির্ম্মল ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহার হৃদয়-ক্ষেত্র এরূপ উর্ব্বরা হইয়াছে যে যোগানন্দের প্রদত্ত ইষ্টবীজ তাহাতে শীঘ্রই উপ্ত হইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মানুষ এইরূপ করিয়াই ভগবদ-সান্নিধ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়।

পলাশী যুদ্ধের পর দেশের অবস্থা, দেশবাসীর অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল। হৃদয়বান্ ব্যক্তি এ দৃশ্য দেখিলে বাস্তবিক মর্ম্মাহত হইতেন; যে দেশ মা অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, যে দেশের অধিবাসীকে সংসার চিন্তায় কখন চিন্তিত, ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত না। এই সময় হইতেই সেই চিন্তা, দেশের সেই দুর্দ্দশার সূত্রপাত হইল।

মিরজাফরের পর তদীয় জামাতা মীরকাসিম নবাব হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনিও ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার না করায় রাজ্য-চ্যুত হইয়া পলায়ন করেন। ভগবানের কোপদৃষ্টি দেশের

প্রতি পতিত না হইলে রাষ্ট্রবিপ্লব কদাচ সম্ভবপর নহে। ইহা ভগবদিচ্ছা- মানব ইচ্ছায় এ ঘটনা ঘটিতে পারে না। দেশ পাপ ভারাক্রান্ত না হইলে, ধরিত্রী চঞ্চলা না হইলে-প্রজাবর্গ বিশেষ ভাবে উৎপীড়িত না হইলে,—ভগবানের আসন কখন টলে না। নানা প্রকারে লোকক্ষয় করিয়া দেশের শান্তি বিধান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। অতএব এরূপ রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় দেশের লোকের কষ্ট হইবে না ত কি? কিন্তু হৃদয়বান্ ব্যক্তি দেশের এ দুর্দ্দশা দেখিতে পারে না। প্রবোধের হৃদয় এখন দয়ামায়ায় পরিপূর্ণ, কাযেই দেশের দুর্গতি দেখিয়া তিনি লোকালয় পরিত্যাগ করত কিছুদিনের জন্য অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যোগানন্দের প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কাশী-ধাম।

যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর না কেন,—হৃদয়ে ভেদভাব থাকিলে, তাহা সমস্তই পণ্ড হইবে। ভেদভাবপূর্ণ সাধনাকে সাধনা নামে অভিহিত করা যায় না। আমাদের দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবে বিবাদ-বিসম্বাদ চির প্রসিদ্ধ। শাক্ত বৈষ্ণবকে দেখিতে পারেন না; নানাবিধ দোষ দেখাইয়া তাহাকে অপদস্থ ও অপমানিত করিতে চেষ্টা করেন। বৈষ্ণবও শাক্তের প্রতি বিষনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন; তাহার দোষ দেখাইয়া লোকসমাজে গ্লানি করিতে পারিলে বৈষ্ণব মনে মনে বড়ই সুখানুভব করেন। আমাদের সমাজে সাধুভক্ত-গণের এরূপ মতিচ্ছন্ন হওয়ায় ধর্ম্ম-জগতে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। এক সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়কে পরাস্ত করিতে পারিলে যেন, তাহাদের কতই আনন্দ লাভ হয়। কিন্তু ইহাই কি ধার্ম্মিকের রীতি, ইহাই কি সাধনায় সিদ্ধি লাভের মহত্ব! একজনের নিন্দা বা অপমান করিয়া যাঁহারা হৃদয়ে প্রভূত আনন্দলাভ করেন—তাঁহারা কিরূপ ভক্ত, ভগবানের কিরূপ প্রিয়পাত্র, তাহা ভগবানই জানেন, আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে ইহা বুঝিতে একান্ত অক্ষম। সেই অদ্বৈত বিরাটপুরুষ, চৈতন্যময় নিরাকার পরব্রহ্ম, স্ত্রী কি পুরুষ, বালক কি বৃদ্ধ, কাল কি সাদা—তাহা কে বলিতে পারে? শাস্ত্র বলিয়াছেন—

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপ কল্পনা। সেই চৈতন্যময় ব্রহ্ম যাহা তাহাই আছেন, চিরকাল ছিলেন, পরন্তু চিরকালই থাকি-বেন—তাঁহার ক্ষয় হয় না। তিনি অক্ষয় অব্যয়, বিশুদ্ধ আনন্দ-ময়, পরমাত্মা। তবে মানবের সামান্য বুদ্ধি, সামান্য মস্তিষ্কে তাঁহার ধারণা হইতে পারে না বলিয়াই, সাধকগণ নিজ ইষ্ট-সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে যেরূপ ভাবে কল্পনা করেন, তিনি সেইরূপ ভাবেই আমাদের নিকট প্রকাশমান, নতুবা তাঁহার স্বরূপ মূর্ত্তি কিছু নাই। তুমি মা বলিয়া ডাকিলে তিনি তোমাকে মাতৃরূপে দর্শন দান করিয়াই চরিতার্থ করিবেন, আর পিতা বলিয়া ডাকিলেও তিনি তোমাকে সেই ভাবেই দর্শন দানে সুখী করিবেন। তুমি বাবা বলিয়া যাঁহাকে ডাকিয়া সুখী হইবে, তাঁহাকেই আমি মা বলিয়া ডাকিয়া হৃদয়ে প্রভূত আনন্দ উপভোগ করিব। যিনি প্রকৃত সাধক তাঁহার ভেদ-ভাব থাকা একান্ত অন্যায়; থাকিলে তিনি প্রকৃত সাধক নহেন, তাঁহার সাধনায় প্রকৃত সিদ্ধিলাভ হয় নাই। যিনি যথার্থ ভক্তি ভাবে ভগবানের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিয়া-ছেন, তাঁহার চরণে রতিমতি নিযুক্ত করিয়া তন্ময় হইতে পারিয়াছেন; তাঁহার নিকট ভেদভাব নাই—তিনি যে মূর্ত্তি দেখিবেন, সেই মূর্ত্তিই তিনি অভীষ্টদেবের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইবেন। তাই ত সাধক অভেদ ভাবে তন্ময় হইয়া গাহিয়াছেন।—

শ্যামা হলি মা রাসবিহারী,
নটবর বেশে শ্রীবৃন্দাবনে।

(অথবা) হৃদয়-রাসমন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে।
একবার হয়ে বাঁকা দেমা দেখা শ্রীরাধারে বামে লয়ে।
নরশির মুণ্ডমালা, ত্যজে পর মা বনমালা,
কালী ছেড়ে হও মা কালা, হ্যাদেগো পাষাণের মেয়ে।
নরকর কোটীবেড়া, ত্যজে পর মা পীত ধড়া,
মাথায় পর মা মোহন চূড়া চরণে চরণ দিয়ে।
হৃদ্‌মাঝারে কাল শশী, দেখ্‌তে বড় ভালবাসি,
একবার অসি ছেড়ে ধরমা বাঁশী, ভক্তের প্রতি সদয় হয়ে।

সাধক যখন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার আর আরাধনার আবশ্যকতা থাকে না; তখন তিনি সোহংভাবে বিভোর হইয়া কেবল আনন্দময়ের পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন; তখন তাঁহার কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কোন ভাব ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা থাকে না, তখন সেই আনন্দময় পুরুষ কেবল শ্রীভগবানের ভাবে বিভোর, তাঁহার কথা কহিবার শক্তি কোথায়? আর কথা কহিয়া ভাষার দ্বারা কি সেই অব্যক্ত বিষয় ব্যক্ত করিতে পারেন? তাই তখন ঈশ্বর প্রকৃতি কি পুরুষ, তাহা আর সাধক বলিয়া প্রকাশ করিতে পারেন না। যাঁহারা সামান্য ভাবের ভাবুক, যাঁহারা সাধন পথে কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারেন নাই তাঁহারাই কেবল শাক্ত-বৈষ্ণব লইয়া কলহ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করেন, সাধনার পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিয়া কোনও পথে অগ্রসর হইবার অধিকার লাভ করিতে পারেন না। প্রকৃত সাধক হইলে তিনি কালীকৃষ্ণ একাধারে দর্শন করিয়াই ধন্য হন। আর যিনি হৃদে কালী, বাহিরে শিব এবং বদনে কেবল শ্রীহরির

গুণানুকীর্ত্তন করিয়া সাধন-মার্গের কণ্টকাকীর্ণ অন্ধকারময় পথ ধীরে ধীরে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করেন, তাঁহারই চেষ্টা সফল হয়—তিনিই অন্ধকার হইতে আলোকে আসিয়া প্রাণ জুড়াইতে পারেন। নলিনাক্ষের ভেদ ভাব ছিল না; তিনি শাক্ত হইলেও বৈষ্ণবের সহিত সখ্যতা করিতেন; মায়ের সেবক হইয়া তিনি অনবরত শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তন করিয়া হৃদয়ে প্রভূত আনন্দ লাভ করিতেন; তিনি বিষ্ণু মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মাতৃ-মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেন। মা মা বলিয়া অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেন। আবার কখন কালীমন্দিরে যাইয়া "হা মধুসূদন বিপদবারণ ঠাকুর! দাসের প্রতি কৃপা কর" বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেন। আজ নলিনাক্ষ বহুদিন গৃহত্যাগী হইয়াছেন, বহুদিন আমরা সেই শাক্ত-ভক্ত ব্রহ্মচারীর দর্শন লাভে বঞ্চিত হইয়াছি। পাঠক আসুন, অদ্য আমরা পুনরায় তাঁহার তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হই।

এখন বিভাবরী অবসান হয় নাই। স্বর্গীয় দীপমালাস্বরূপ তারকাবলী এখন সমুজ্জ্বল করে ধরাপরে আলোকরশ্মি বর্ষণ করিতেছে। জীবজগৎ এখন সুষুপ্তি-দেবীর সেবায় নিমগ্ন। বিরাট নৈশ অন্ধকার এখন কাশী-ক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ কলেবর আবৃত করিয়া রহিয়াছে। চারিদিক নিঃশব্দ-নিস্তব্ধ। বোধ হইতেছে যেন, বারাণসী নগরী বিশ্বেশ্বরের বিচিত্র লীলা অনু-ধ্যান করিয়া ঘোর সমাধিতে চিত্ত সমাধান করিয়াছে। কোন সাড়া শব্দ নাই—ঝিল্লি রবও নীরব। কেবল দশাশ্বমেধ ঘাটের অনতিদূরস্থ ভাগীরথীর সন্নিহিত একটী ক্ষুদ্র কুটীর হইতে একটি সুললিত সঙ্গীত ধ্বনি নিঃসারিত হইয়া নৈশ বায়ুর মৃদুল প্রবাহ

বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক গঙ্গাগর্ভ এবং উভয় তীরস্থ বহুদূর-ব্যাপী স্থলভাগ প্রতিনাদিত করিতেছিল। কাশীশ্বরের পবিত্র কাশীক্ষেত্রে সেই রজনীর শেষভাগে নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভক্ত প্রাণের ভক্তিময় উচ্ছ্বাস বড়ই মনোমদ, বড়ই প্রাণারাম, বড়ই হৃদয়স্পর্শী। একজন সন্ন্যাসী আত্মহারা হইয়া গাহিতেছিলেন—

এবার আমি সার ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশে রজনী নাই মা,
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
'আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা,
সন্ধ্যারে বন্ধ্যা ক'রেছি।
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই,
যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে,
সোণাতে রং ধরায়েছি।

এই অবধি গাহিয়া কি ভাবে বিভোর হইয়া সন্ন্যাসী ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইলেন। পরে পুনরায় পঞ্চমে গলা চড়াইয়া সেই সঙ্গিতের অবশিষ্টাংশ গাহিলেন—

মণি মন্দির মেজে দিব,
মনে এই আশা করেছি॥

প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি,
উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামা নাম ব্রহ্ম জেনে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি॥

দেখিতে দেখিতে রজনী অবসান হইল। উষা সুন্দরী বালারুণের সুবর্ণ কিরণ-মণ্ডিত-কিরীট শিরোদেশে পরিধান করিয়া পূর্ব্ব গগনে দেখা দিলেন। বিহঙ্গমগণ কলরবচ্ছলে নিদ্রিত নরনারীকুলকে প্রভাতবার্ত্তায় প্রবুদ্ধ করিবার জন্য আপনাপন কুলায় পরিত্যাগ করিয়া দিগ্‌দিগন্তে প্রস্থান করিতে লাগিল। সমস্ত রজনী জাহ্নবীবক্ষে কোনরূপ তরঙ্গোচ্ছ্বাস ছিল না, এক্ষণে প্রভাত বায়ুর মৃদু মন্দ হিল্লোলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মির উৎপত্তি হইয়া ঈষৎস্ফুটধ্বনি সহকারে তটভূমি স্পর্শ করিতে লাগিল, বোধ হইল যেন দেবী সুরধুনীও যামিনীযোগে স্বামী সহবাসে সুখ নিদ্রায় নিমগ্না ছিলেন এক্ষণে প্রভাত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া সুখ-শয্যা পরিত্যাগান্তে তরঙ্গলীলাচ্ছলে বারংবার মস্তক-দেশ আন্দোলন এবং হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তি প্রকীর্ত্তন পূর্ব্বক প্রাণপতি বিশ্বেশ্বরের বিশ্বারাধ্য পদারবিন্দে প্রণাম করিতেছেন। ক্ষণকালের মধ্যে উষাসুন্দরীও অন্তিম-দশা প্রাপ্ত হইলেন। সকল ভুবন-প্রকাশক, নিখিল-মঙ্গল-নিলয় দেব অংশুমালী বিপুল আলোকমালায় মণ্ডিত কলেবর হইয়া ক্রমে ক্রমে উদয়াচলে প্রকাশমান হইতে লাগিলেন। প্রাতঃস্নানার্থী নাগরিকগণ, একটি একটি করিয়া আসিতে আসিতে, অবশেষে বিপুল সংখ্যায় আসিয়া দশাশ্বমেধ ঘাট পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। যোগী, ভোগী, দণ্ডী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর নানা লোকের

কণ্ঠ সমবায়ে এক অভিনব ধ্বনির সৃষ্টি হইয়া গঙ্গাগর্ভ শব্দায়মান করিয়া তুলিল! তখন সেই সন্ন্যাসীটি পুনরায় গাহিলেন,—

"ডুব দে মন কালী ব'লে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধজলে॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন,
দুচার ডুবে ধন না মেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও,
কুলকুণ্ডলিনীর মূলে॥
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝেরে মন,
শক্তিরূপা মুক্তা ফলে!
তুমি ভক্তিকর কুড়ায়ে পাবে,
শিবযুক্তি মতন নিলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে,
আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক হলদি গায়ে মেখে যাও,
ছোঁবেনা তার গন্ধ পেলে॥
রতন মাণিক্য কত,
পড়ে আছে সেই জলে॥
রামপ্রসাদ বলে ঝাঁপ দাও মন,
মিলবে রতন ফলে ফলে॥

বেলা ক্রমশঃ অধিক হইয়া উঠিল, দশাশ্বমেধ ঘাটের বিপুল জন-কোলাহলও ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল, সকলেই স্নান-ক্রিয়া সমাপনান্তে আপন আপন গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করিতে লাগিল। কেবল একটি দরিদ্র যুবক ঘাটের একধারে নিঃশব্দে

উপবেশন করিয়া রহিল। আহা! এতলোক আসিল, আবার চলিয়া গেল, ঐ হতভাগ্য দরিদ্র যুবকটীর প্রতি কেহ একবার চাহিয়াও দেখিল না। হায়! এ সংসারে কয়জন লোক দুঃখীর দুঃখে দয়ার্দ্রচিত্ত হয়? কয়জন লোক শোকাতুরের শোকাগ্নিতে সান্ত্বনা-বারি বর্ষণ করে? যে ব্যক্তি চিরসুখী, চিরদিন সুখের কোলে লালিত পালিত, দুঃখের দাবদাহন কিরূপ অসহনীয়, কেমন করিয়া সে তাহা অনুভব করিবে? সর্পদষ্ট ভিন্ন সর্প-দংশনের জ্বালা অন্যের বুঝিবার উপায় নাই।

দরিদ্র যুবকটির কটিদেশে একখণ্ড অতি মলিন চীরবসন— তাহাও আবার স্থানে স্থানে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, অংশদেশ-বিলম্বী ভ্রমর-কৃষ্ণ চাঁচর চিকুরদাম, অযত্নে জটার আকারে পরি-ণত; তৈলাভাবে সর্ব্বাঙ্গে খড়ি উড়িতেছে; কঙ্কাল-মালা যেন গাত্রচর্ম্ম ভেদ করিয়া উহার অনাহারজনিত শোচনীয় অবস্থা অভিব্যক্ত করিতেছে। আহা! দীনতার দারুণ নিষ্পীড়নে উহার সুমোহন গৌরকান্তি, যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া মলিন ভাব ধারণ করিয়াছে। অঙ্গের স্থানে স্থানে আঘাতের চিহ্ন, তাহা হইতে অল্পে অল্পে রুধির ক্ষরণ হইতেছে। ঘাট জনশূন্য হইলে, যুবক রোদন করিতে লাগিল, —অশ্রুর প্রবল প্রবাহ, গণ্ড ও বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত করিয়া ধরণী-পৃষ্ঠে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে ক্রন্দন করার পর, সে হতাশ-নয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল,—"হা অদৃষ্ট! এখানেও দর্শন পেলাম না? অনাহারের আশীবিষ দংশন, অনিদ্রার উৎকট অবসাদ উপেক্ষা ক'রে কত দেশেই না ঘুরিলাম; কত গ্রামে, কত নগরে, কত

রাজ্যেই না পর্য্যটন করিলাম, কোথাও অন্বেষণ পেলেম না। শেষে বড় আশা করিয়াছিলাম—দেবাদিদেব মহাদেবের পবিত্র-ক্ষেত্র বারাণসীধামে নিশ্চয়ই তাঁর দর্শন পাবো,—কিন্তু হায়! আর সে আশা কোথায়? কয়দিন হ'লো, এখানে এসেছি,—দিবারাত্র অনুসন্ধানের বিরাম নাই,—পাঁতি পাঁতি ক'রে প্রত্যেক স্থানে খুঁজেছি, যাঁকে সম্মুখে পেয়েছি, তাঁহাকেই গুরু কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করেছি,—কোথাও দর্শন পাই নাই,—কেহই তাঁর সংবাদ ব'লতে পারে নাই। আমার কথা শুনে সকলেই আমাকে পাগল ব'লে কত উপহাস করে, কাল কতক-গুলি বালকের হাতে কি লাঞ্ছনাই না হয়েছে,—আমি যাই তাহাদিগকে গুরুকন্যার কথা জিজ্ঞাসা করেছি, অম্নি তারা "হো হো" শব্দে হাস্য করে, পাগল! পাগল! ব'লে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। উঃ কি কষ্টই না দিয়াছে—সে অবস্থা মনে হ'লে এখনও যেন হৃৎকম্প হয়,—দারুণ প্রহারে সর্ব্বশরীর জর্জ্জরিত - ক্ষত বিক্ষত, এখনও শোণিতস্রাব হ'চ্ছে। আহা! আমি তাদের কোন ক্ষতি করি নাই, একটিও কর্কশ কথা বলি নাই, কাঙ্গালের ন্যায় কেবল গুরুকন্যার কথাই জিজ্ঞাসা ক'রে-ছিলাম, হরি! হরি! তাহাতেই কি তা'দের অপমান বোধ হ'ল? তা'তেই কি তারা আমাকে পাগল ঠিক ক'রে, শেষে প্রহার পর্য্যন্ত ক'র্‌লে? হা জগদীশ্বর! যদি এত কষ্ট-ভোগের পরও গুরুকন্যার দেখা পেতাম, তা'হলে কিছুমাত্র আক্ষেপ কর্‌তাম না। হা গুরুকন্যে! তোমার মনে কি এই ছিল মা? মাগো! কি দোষে এ দাসকে দর্শনদানে বঞ্চিত ক'রছ? হা বিশ্বেশ্বর! হা কৃপানিধান! হা বাঞ্ছা কল্পতরু! শুনেছি নাথ, যে যা মনে

ক'রে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তুমি তার সেই বাঞ্ছা পূর্ণ কর। দয়াময়! আমার বাঞ্ছা কি পূর্ণ হবে না? আশুতোষ! কৃপাসিন্ধো! কৃপা ক'রে আমার গুরুকন্যার দর্শনের উপায় ব'লে দাও? হা গুরুদেব! হা জ্ঞানদাতা আচার্য্য! বুঝ্‌লাম প্রভো! এ পাপাত্মা হ'তে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি হবে না,—এ অকর্ম্মণ্য নরাধম হ'তে আপনার কন্যার উদ্ধারের আশা নাই। গুরো! আপনার কাছে ব'লে এসেছি,—"যদি কখন আপনার কন্যার সাক্ষাৎ পাই—তবেই আবার ফিরিব, নচেৎ এই শেষ বিদায়।"—জগদীশ্বর জানেন, আমি ক্রটী করি নাই,—কপালদোষে সকলই বিফল হ'ল। আপনার সহিত দেখা হইলে, তখন আবার কি ব'লে আপনার কাছে দাঁড়াব? কি ব'লে আবার আপনার কাছে এ মুখ দেখাব? তাই আজ আপনার কাছে শেষ বিদায়ের প্রার্থনা ক'র্‌ছি।" যুবক সহসা উত্থিত হইল এবং সুরধুনীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া আবার বলিতে লাগিল, —"মা পতিতোদ্ধারিণি, ত্রিতাপতারিণি ত্রিপথগে! শুনেছি মা, কেবল তুমিই নাকি পাপী, তাপী, পুণ্যবান্, সকলকেই সমান স্নেহে, সমান যত্নে আপন অঙ্কে স্থান দাও। তাই মা আজ এই অন্তিম কালে তোমারই আশ্রয় গ্রহণে অভিলাষী হ'য়েছি। মা! আমি বড় পাপী, এই দেখ মা পাপানলের প্রচণ্ড শিখায় পলকে পলকে হৃদয়ের প্রত্যেক স্তর ভস্মীভূত হ'য়ে যা'চ্ছে; মাগো! আমার জুড়াইবার স্থান আর কোথাও নাই- তাই আজ শেষে তোমারই কাছে জুড়াতে এসেছি, তোমার পূত-শীতল কোলে স্থান দিয়ে আমার সকল যন্ত্রণার অবসান কর।"

এই সকল কথা বলিয়া যুবক যেমন গঙ্গাগর্ভে ঝম্প প্রদানে উদ্যত হইবেন, অমনি পশ্চাৎ দিক হইতে একটি অপরিচিত লোক আসিয়া সহসা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

পাঠক মহাশয়কে বলিয়া দিতে হইবে না যে, ঐ যুবা-লোকটি নলিনাক্ষ। দুই বৎসরের পর আজ উঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইল। গৃহ হইতে বিদায় গ্রহণের পর নানা জনপদে গুরুর ও গুরুকন্যার অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে কাশীধামে আসিয়াছেন। এখানে আসিয়া তাঁহাকে কিরূপ দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছে, সে সকল কথা আপনারা উঁহার নিজ মুখেই শুনিয়াছেন।

নলিনাক্ষ জাহ্নবী জলে জীবন সমর্পণকালে যে লোকটির দ্বারা ধৃত হইলেন, উনি সেই যোগানন্দ কাপালিক,—যিনি রজনীযোগে এবং প্রভাত কালে, অপূর্ব্ব স্বরলহরী বিস্তার করিয়া, সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের মনোহর সঙ্গীতের অমৃত সিঞ্চন করিয়াছিলেন। দশাশ্বমেধ ঘাট নির্জ্জন হইলে, উঁনি কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া, মৃদুপাদক্ষেপে গঙ্গার তীরে ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ঐরূপ অবস্থায় উক্ত ঘাটের নিতান্ত সন্নিহিত হইলে, নলিনাক্ষের করুণ ক্রন্দন এবং কাতর উক্তি উঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। তৎপরে তাহার বিমল মুখ-কান্তি দর্শনে এবং অদ্ভুত বিলাপ শ্রবণে উঁহার অন্তঃকরণে যুগপৎ কৌতূহল ও করুণার উদ্রেক হইলে, ভ্রমণে বিরত হইয়া, উহার অজ্ঞাতসারে পশ্চাৎদিকে দণ্ডায়মান হইলেন। উক্ত অবস্থায় যুবকের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া উঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সন্ন্যাসী পূর্ব্বের ক্ষণেক দর্শনের

অনুমান বশে বুঝিতে পারিলেন যে, এ সেই যুবক, বড় সামান্য নহে। যে সকল লক্ষণ থাকিলে, মানুষ ভগবদ্ সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়, যে সকল চিহ্ন থাকিলে, মানুষ ভব-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, মোক্ষমার্গে প্রবিষ্ট হইতে পারে, এই যুবকটীতে সেই সকল লক্ষণ, সেই সকল চিহ্ন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল আশ্চর্য্য দৈব-লক্ষণ দর্শন করিয়া, উঁহার মনে যুবকের সবিশেষ পরিচয় জানিবার লালসা বলবতী হইয়া উঠিল এবং তজ্জন্য উঁহার বিলাপের নিবৃত্তি-কাল পর্য্যন্ত স্থিরভাবে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। তৎপরের ঘটনা পাঠক! আপনার অবিদিত নাই।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"বৎস! মৃত্যু-কামনা পরিত্যাগ কর। কাঁটা দেখিয়া কমল তুলিতে ক্ষান্ত হইও না। দুঃখ বিনা সুখের বিমল ভাতি কখন হৃদয়-কন্দর আলোকিত করে না। তুমি এক্ষণে যে পথের পথিক হইয়াছ- তাহাতে দুঃখে, শোকে, অপমানে কাতর হইলে চলিবে না। তুমি অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছ, এক্ষণে দুঃখে মুহ্যমান হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে— তোমার সমস্ত নষ্ট হইবে। কাদা ঘাঁটাই সার হইল, কণ্টকে কেবল হস্ত পদই ক্ষত হইল, অমল কমল লাভের অপরিসীম সুখ উপভোগ হইল না। বৎস ক্ষান্ত হও, এস আমার সঙ্গে কুটীরে, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিবে।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী যুবককে লইয়া নিজ আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। নলিনাক্ষ হতাশ-হৃদয়ে বড়ই ম্রিয়মান হইয়াছিলেন, এক্ষণে সন্ন্যাসীর উৎসাহ বাক্যে পরমোৎসাহিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন।

ভক্ত-বৎসল ভগবান্ তাঁহার প্রিয় ভক্তগণকে তিলমাত্র নয়নের অন্তরাল করেন না। ভক্ত সামান্য মাত্র উৎসাহ বিহীন হইলে, তৎক্ষণাৎ তিনি প্রকারান্তরে তাহার উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। ইহা দেখাইবার জন্যই ভগবান উৎসাহ-বিহীন নলিনাক্ষের নিকট মহাপুরুষ যোগানন্দকে প্রেরণ করিলেন—তাঁহারই অশেষবিধ উৎসাহ বাক্যে নলিনাক্ষ পুনরায় প্রবুদ্ধ হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মহতের কৃপা।

সন্ন্যাসী নলিনাক্ষকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়া আপনার কুটীরে লইয়া গেলেন। যুবক ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল, এজন্য প্রথমতঃ তাঁহার কুটীরের ফলমূল এবং সুশীতল পানীয় প্রদানে তাহার ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করিলেন। যুবক কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, পরিশেষে অপরিচিত ভাবে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়া কি কারণে যে এত কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেছেন, আনুপূর্ব্বিক তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নলিনাক্ষ সন্ন্যাসীর প্রশ্ন অনুসারে, তাহার শৈশবকালে পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ, আচার্য্যের অনুকম্পায় তাঁহার গৃহে অবস্থান এবং অধ্যয়ন, আচার্য্যের সংসার-বৈরাগ্য এবং তজ্জন্য পাঠার্থিগণের বিদায় দান, তাহার গুরুদক্ষিণা দানের অভিলাষ এবং তাহাতে আচার্য্যের নিরুদ্দিষ্টা কন্যার অনুসন্ধানের অনুমতি ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া, অদ্যকার ঘটনা পর্য্যন্ত একে একে আদ্যন্ত বর্ণনা করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী এই সকল ঘটনা শুনিতে শুনিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং অদম্য কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তোমার পরিচয় পাইয়া এবং অসামান্য গুরুভক্তি দেখিয়া, আমি যার পর নাই বিমোহিত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার নিরুদ্দিষ্টা গুরুকন্যার বিবরণ একটু বিস্তৃতভাবে

শুনিবার বাসনা করি। যদি বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকে—তবে তাঁহার নাম, রূপ এবং বয়সের কথা প্রকাশ করিয়া বল। তোমার কষ্ট দেখিয়া আমিও অত্যন্ত ক্লেশানুভব করিতেছি। যদি আমার দ্বারা তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির পথ কিয়ৎ পরিমাণেও প্রসর হয়, তাহা হইলে পরমানন্দ উপভোগ করিব।”

নলি। মহাত্মন্! আপনার নিকট আমার কোন বিষয়ই অপ্রকাশ্য নাই। আমি আচার্য্য মহাশয়ের নিকট যেমন যেমন শুনিয়াছি, অবিকল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুণ; আমার আচার্য্য বলেন, তাঁহার কন্যার অনেকগুলি নাম আছে, কিন্তু তিনি প্রধানতঃ ‘কালী’ নামেই বিখ্যাত। বয়সের পরিমাণ তিনি ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই; তবে এইমাত্র বলিয়াছেন যে, তাঁহার কন্যাকে দেখিতে ষোড়শ বর্ষের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। রূপ উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ। শিরোদেশে আভূমি-লম্বিত উন্মুক্ত কেশদাম, বিবসনা, নিরাভরণা। বসন ভূষণের পরিবর্ত্তে নরকর-শির-বিনির্ম্মিত আভরণ পরিধান করিয়া থাকেন।

নলিনাক্ষের কথায় বাধা দিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, “বুঝিয়াছি বৎস! সকলই বুঝিয়াছি, আর তোমাকে কিছুই বলিতে হইবে না, সমস্তই আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। মা অন্নপূর্ণা অবশ্যই তোমার আশা পূর্ণ করিবেন, ঐরূপ একটী রমণীর কথা আমি এক সময়ে অনেক লোকের কাছে শুনিয়াছি। অতএব তোমার হতাশ হইবার কোনই কারণ দেখিতেছি না। পুনরায় নব উৎসাহে উৎসাহিত, নব উদ্যমে উদ্দীপিত হইয়া অন্বেষণ কর, যখন অপর দশজন লোক তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, তখন

অবশ্য তুমিও পাইবে।" এই সকল কথা বলিয়া সন্ন্যাসী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "উঃ! কি অসাধ্য সাধন, আমি অনায়াসে এই যুবককে উৎসাহিত করিতেছি? ভগবদ্ সাক্ষাৎ-কার লাভ কি সহজ ব্যাপার? কত মুনি, ঋষি, যোগিবৃন্দ যুগ-যুগান্তর কঠোর তপস্যা করিয়াও যাঁহার কৃপালাভ করিতে পারেন না, যোগেশ্বর হরি, দুষ্কর যোগাবলম্বনে যাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ, লোক পিতামহ ভগবান্ চতুর্মুখ চতুর্মুখে যাঁহার গুণ বর্ণন করিতে অশক্ত, পঞ্চানন যাঁহার লীলাপ্রপঞ্চ পঞ্চাননে প্রকাশ করিতে না পারিয়া পরিশেষে পদারবিন্দে প্রপন্ন, এই তরল-মতি সরল যুবক কেমন করিয়া তাঁহার সন্দর্শন পাইবে? আহা! সরল যুবক, আচার্য্যের চাতুরিজাল ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই—অথবা এইরূপ অসাধ্য সাধন করিতেই বুঝি ভগবান ইহাকে ধরাতলে পাঠাইয়াছেন। আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, ঐকান্তিক সরলতাগুণে তাহাতেই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, বুঝিতে পারে নাই যে, তিনি তাহাকে কি কঠোর ব্রতেই ব্রতী করিয়াছেন, কি দুর্লভ রত্নেরই আহরণে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক ব্রাহ্মণ কিন্তু অযোগ্য পাত্রে ভারার্পণ করেন নাই, বোধ হইতেছে, এই যুবক কর্ত্তৃক নিশ্চয়ই তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। যুবকটিতে যে সকল শুভ লক্ষণ রহিয়াছে, তাহা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। গুরুদেব ইহাকে দীক্ষিত করিয়াছেন বটে; কিন্তু মন্ত্র সজীব হয় নাই। আমার ইচ্ছা হইতেছে, উঁহাকে পূর্ণাভিষিক্ত করিয়া দিই, তাহা হইলে ঐ দেবতার বীজমন্ত্র সতেজ হইয়া আশু ফল প্রদান করিবে। ক্ষেত্র উর্ব্বরা বটে, বীজ-বপন কখনই বিফল হইবে

না। শুধু মন্ত্র জানিলে ইষ্ট সিদ্ধি হয় না—মন্ত্র সজীব করিতে হয়। বৃক্ষের মূলদেশে জল সিঞ্চন না করিয়া, কেবল অগ্রভাগে জল সিঞ্চন করিলে, যেমন বৃক্ষ সজীব হয় না, পরন্তু সেচন-কারীর পরিশ্রম পণ্ড হয়, সেইরূপ সজীব মন্ত্র জপ না করিয়া কেবল দেবতার নাম ধরিয়া ডাকিলেও, দেবতার চৈতন্য হয় না। অপিচ সাধকের সকল পরিশ্রম বিফল হইয়া থাকে; তাই বলিতেছি, অগ্রে বীজের সজীবতা, তারপর দেবতা। যাহা হউক ব্রাহ্মণ যেমন চতুরতার সহিত দেবতার পরিচয় দিয়াছেন, আমিও সেইরূপ উহাকে পূর্ণাভিষিক্ত করিব। আসল কথা প্রকাশ করিব না, কি জানি, ছেলে মানুষ, প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলে হতাশ অথবা ভগ্নোৎসাহ হইলেও হইতে পারে।

নলিনাক্ষ সমস্তই বুঝিয়াছেন, তথাপি সরল বিশ্বাস ও ভক্তি হৃদয়ে বদ্ধমূল আছে বলিয়া তিনি এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন। যোগানন্দ তাহা অবগত হইতে পারেন নাই।

সন্ন্যাসীকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরব দেখিয়া নলিনাক্ষ বলিল,—"মহাশয়! আমাকে হতাশ হইতে নিষেধ করিয়া, যথেষ্ট উৎসাহ দিতেছেন বটে, কিন্তু আমার আশান্বিত হইবার কোনও কারণ দেখিতেছি না। বিশাল ভারতবর্ষের কোন লোকালয়ইত দেখিতে ক্রটী করি নাই—সর্ব্বত্রই বিফল হইয়াছি। সাধে কি আমাকে হতাশ হইতে হইয়াছে।"

স। বৎস! ভারতের সমস্ত লোকালয় অন্বেষণ করিয়াছ বলিয়া যে, সকলই দেখা হইয়াছে, এমত বিবেচনা করিও না। সুবিস্তীর্ণ ভারতের বহুতর স্থান এখনও তোমার নেত্রগোচর

হয় নাই।—কত বিস্তৃতায়তন প্রান্তর, কত দিগন্তবিস্তারী অরণ্যানী, কত বহু যোজনব্যাপী অভ্রস্পর্শী অচলশ্রেণী এখনও তোমার অপরিদৃষ্ট রহিয়াছে। বৎস! আর একটি কথা তোমাকে বলিতে ভুল হইয়াছে,—যে সকল লোক তোমার গুরু-কন্যার ন্যায় লক্ষণাক্রান্তা কামিনীর কথা আমার নিকটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বলেন,—"সেই মেয়েটি লোকালয়ে থাকিতে বড় ভালবাসে না।" সেই জন্য, বৎস! তোমাকে হতাশ হইতে নিষেধ করিতেছি, এখন বহুতর নির্জ্জন স্থান তোমার নয়নগোচর হয় নাই, ভাল করিয়া অনুসন্ধান কর, নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে।

এ সন্ন্যাসী কে এবং কাহার প্রেরিত, নলিনাক্ষ এখনও তাহা জানিতে পারেন নাই। একদিনের ক্ষণিক সাক্ষাতে কি এ সমস্ত ব্যক্তিকে চিনিতে পারা যায়—বিশেষতঃ এখন তিনি পূর্ব্বের বেশ ভিন্নভাবে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

সন্ন্যাসীর বাক্যাবলী শ্রবণে নলিনাক্ষের মনে অপরিসীম আনন্দের উদয় হইল। হতাশার দুর্ব্বলতা অকস্মাৎ তিরোহিত হইয়া, উদ্দীপনার নব তাড়িত-স্রোত তাহার শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। নিরাশার নিবিড় অন্ধকারে আবার যেন সে আশার আলোকচ্ছটা দেখিতে পাইল। যুবকের এই অভাবনীয় আকস্মিক অবস্থান্তর দর্শনে সন্ন্যাসীও যারপর নাই প্রসন্ন হইলেন। নলিনাক্ষ বলিল,—"হে মহাত্মন্! আপনার উপদেশামৃত পানে, যেন আমার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইল—আবার যেন আমি নব কলেবরে নবজীবন লাভ করিলাম।

স। 'বৎস! আমার স্থিরবিশ্বাস হইতেছে, ভগবান্ তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন,—হতাশ হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। আমার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিও। বৎস! তোমাকে আর একটী উপদেশ দিবার ইচ্ছা আছে।

নলি। কৃপাময়! আপনার অমূল্য উপদেশ অমৃতাধিক সুমধুর। কৃপা করিয়া আবার অভিনব উপদেশ দানে কৃতার্থ করুন। আপনার অযাচিত অনুগ্রহ, অপার করুণা, অপরিসীম স্নেহ ইহজীবনে ভুলিবার নহে।

স। বৎস নলিনাক্ষ! আমার কাছে একটী আশ্চর্য্য মন্ত্র আছে। কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ দয়া করিয়া আমাকে সেই মন্ত্রটি দান করিয়াছিলেন। সেই মন্ত্রটির প্রভাব এমি অতুলনীয় যে, যে ব্যক্তি যাহা অভিলাষ করিয়া উহা একাগ্রচিত্তে জপ করেন, নিশ্চয়ই তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ হয়। তোমাকে দেখিয়া অবধি তোমার প্রতি আমার অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছে, তাই ঐ অমূল্য মন্ত্র-উপদেশটী তোমাকে প্রদান করিবার ইচ্ছা।

নলি। দয়া করিয়া মন্ত্রটি প্রদান করুন।

স। বৎস! এই মন্ত্রটি বড়ই গুহ্য,—প্রকাশ্যে উচ্চার্য্য নহে, কোন প্রকারে অন্য লোকের কর্ণগোচর হইলে, বিফলতার আশঙ্কা আছে। ইহা পবিত্র দেহে, শুদ্ধচিত্তে, সবিশেষ ভক্তি-সহকারে গ্রহণ করিতে হয়। ঐ দেখ দুইখানি গৈরিক বসন রহিয়াছে; পুণ্যতোয়া সুরধুনি-সলিলে অবগাহন করিয়া, উক্ত বস্ত্রদ্বয়ের একখানি পরিধেয় ও অপরখানি উত্তরীয় রূপে গ্রহণ কর, পশ্চাৎ আমি মন্ত্রপ্রদান করিতেছি।

সন্ন্যাসীর আদেশ অনুসারে নলিনাক্ষ গঙ্গাস্নান করিয়া বস্ত্র যুগল পরিধান করিলে সন্ন্যাসী তাঁহাকে পূর্ণাভিষিক্ত করিলেন। পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধামে, পূত-সলিলা জাহ্নবীতীরে নলিনাক্ষ পূর্ণাভিষিক্ত হইলেন। অবিদ্যার অন্ধকারময়ী যবনিকা যাহা ছিল অপসারিত হইয়া, এইবার তাহার জীবন-নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় আরব্ধ হইল। এতদিন পরে তাহার সিদ্ধি-মার্গের অর্গলিত দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। এইবার সন্ন্যাসী বলি-লেন,—শত শত উৎকট বিপদ উপস্থিত হইলেও ভীত বিহ্বল হইয়া তোমার গুরুদত্ত মন্ত্র জপে বিরত হইও না। বরং বিপ-দের সময় দ্বিগুণ প্রযত্নে মন্ত্র স্মরণ করিও। দিনমণির অভ্যুদয়ে যেমন অনন্ত অন্ধকাররাশি অন্তর্হিত হয়, এই মন্ত্রের স্মরণ মাত্রেই তোমারও সেইরূপ অনন্ত বিপদ পরম্পরা মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। পূর্ণাভিষেকের পর সেই সিদ্ধ-মন্ত্র তীব্র বেগে নলিনাক্ষের কর্ণরন্ধ্র দিয়া হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া গেল। সাধক নলিনাক্ষ নবোদ্যমে সেই মন্ত্রের ক্রিয়া সমাধা করিয়া প্রভূত শক্তিমন্ত হইতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিজন অরণ্যে।

নলিনাক্ষ কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে বিজন বিপিনে একাকী। নিবিড় অরণ্যে গভীর অন্ধকার। যে দিকে চাও, কেবলই অন্ধকার। এ যেন অন্ধকারের রাজ্য। অনন্ত অন্ধকাররাশি যেন আকাশ মেদিনী আচ্ছন্ন করিয়া আপনার অধিকার সীমা দৃঢ়ীকৃত করিয়া রাখিয়াছে। অনন্ত-সংখ্যক গগনস্পর্শী পাদপশ্রেণীর অনন্ত সংখ্যক শাখা পল্লব, পরস্পর ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া দিবাভাগেও আলোকের গতি নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই ভীষণ কানন মধ্যস্থ তমসা গর্ভে প্রবেশ করিলে দিবানিশার পর্য্যায়ক্রমিক গতি নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়। কাননস্থলীর অবস্থা স্থিরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্বতঃই অনুমিত হয়, যেন উহাতে কস্মিন্‌কালেও জন-মানবের সমাগম হয় নাই। মানুষের গতিবিধি থাকিলে, অবশ্যই তাহার একটা পরিচিহ্ন থাকিত। একটি মানুষ স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতে পারে, এমন একটি ক্ষুদ্র পথের অস্তিত্বও কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবলমাত্র স্থানে স্থানে কণ্টকাকীর্ণ নিবিড় লতা গুল্মরাশি ভেদ করিয়া কাননবিহারী হিংস্র পশুগণের পদচিহ্নাঙ্কিত সুড়ঙ্গবৎ সঙ্কীর্ণায়তন দুই চারিটি সুদীর্ঘ পথ কাননের বহির্দ্দেশ হইতে ভীর্য্যগ্‌ভাগে অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিয়াছে। অরণ্যের দক্ষিণ দিকে বিশাল প্রান্তর,

উত্তরে হিমানি-মণ্ডিত-শীর্ষ গিরিরাজ হিমালয় আকাশমার্গ ভেদ করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান, পূর্ব্ব পশ্চিমে আমাদের বর্ণিত এই ভয়ঙ্কর অরণ্যানী হিমাদ্রির পাদদেশ অধিকার করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত কলেবর বিস্তার করিয়াছে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বেলা অপরাহ্ণ, সন্ধ্যা আগত-প্রায়, সূর্য্যদেব সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমে আরক্ত কলেবর হইয়া, অস্তাচলের বিশ্রাম-শয্যায় গমনোন্মুখ হইয়াছেন। হিমাদ্রির তুষার ধবল কলেবরে অস্তগত রবির স্বর্ণ-কিরণসমূহ প্রতিফলিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় রমণীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সায়াহ্নকালে পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী যিনি স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন, তাঁহাকে সেই সকল ব্যাপার বর্ণন করিয়া বুঝান সুকঠিন।

রবির অস্তমিত ছবি ক্রমশঃ দৃষ্টি-পথের সীমা অতিক্রম করিল। রাজ্য অরাজক হইলে দস্যু, তস্করাদি দুর্বৃত্তগণ যেমন প্রহৃষ্ট মনে আপনাপন আধিপত্য বিস্তার করে, জগৎ প্রকাশক দিনমণির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ নৈশ অন্ধকারও বিপুল তৎপরতার সহিত স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিতে লাগিল। নিশা যত গভীর হইতে লাগিল, তমসারাশি যেন ততই ঘনীভূত হইয়া অধিকৃত স্থান দৃঢ়ীকৃত করিতে লাগিল। রবির রাজ্য গেল, রজনীর রাজ্য হইল। কিন্তু হে রজনি! তুমি এত প্রভুত্ব প্রকাশ করিতেছ কেন? তোমার এত দর্প, এত বজ্র আঁটুনি কেন? কতক্ষণ তুমি রাজ্য পাইয়াছ? কতক্ষণ তুমি রাজ্যেশ্বরী হইয়াছ? হে রজনি! তোমার রাজ্যের অস্তিত্ব কতক্ষণ, ভাবিয়াছ কি? ভাবিয়াছ কি তোমার লীলাখেলা অতি ক্ষণ-

স্থায়ী, অতি ক্ষণভঙ্গুর, জান না কি—উত্থানের পতন আছে? উত্তেজনার পর অবসাদ আছে? আঘাতের পর প্রতিঘাত আছে? তাই বলিতেছি, বৃথা গর্ব্ব করিও না, বৃথা আস্ফালন করিও না,—কিছুই চিরস্থায়ী নহে, শীঘ্রই তোমার প্রভুত্ব ঘুচিবে, শীঘ্রই তোমার দর্প চূর্ণ হইবে,—আবার রবির উদয় হইবে, আবার রবির রাজত্ব আসিবে। তাই বলিতেছি, এত বাড়াবাড়ি কেন?

আমরা নিয়ত দেখিতে পাই, প্রকৃতির এই নিয়ম, কি জড়জড়তে, কি জীব-জগতে সর্ব্বত্রই তুল্যরূপে কার্য্যকারিণী। কেবল ভাঙ্গা আর গড়া, গড়া আর ভাঙ্গা, কেবল পরিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তনই যেন প্রকৃতির প্রাণ। প্রকৃতি প্রতিনিয়তই যেন আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে, "কিছুই চিরস্থায়ী নয়।" আমাদের সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য সকলই ঐ একই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, একই দুশ্ছেদ্যসূত্রে সংগ্রথিত রহিয়াছে। হে রোগি! রোগের উৎকট যন্ত্রণায় তুমি বড় ছট্ ফট্ করিতেছ? হে দুঃখি! দুঃখের ভীষণ কশাঘাতে তোমার সর্ব্ব শরীর জর্জ্জরিত হইয়াছে? হে দরিদ্র, দীনতার দারুণ দংশনে তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে? হে শোকি! শোকের দুর্ব্বিসহ দাবানলে তুমি অহরহ দগ্ধ হইতেছ? হতাশ হইও না, কিছুকাল অপেক্ষা কর, দেখিবে শীঘ্রই তোমাদের সকল যাতনার শান্তি হইবে, ঐ দেখ তোমাদের দুঃখান্ধকারময় আকাশে আবার উষার আলোক রেখা দেখা দিতেছে—এখনই সুখরবির উদয় হইবে। ঐ শুন প্রকৃতির অভয়বাণী,

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি"

হে সুখি! হে বিলাসি! সুখবিলাসে তোমরা বড়ই বিভোর হইয়াছ দেখিতেছি। ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্বে অন্ধ হইয়া যেন ধরাটাকে সরার মত দেখিতেছ,—ভাবিয়াছ কি তোমাদের জীবন তটি-নীতে চিরদিনই এইরূপ সুখের জোয়ার প্রবাহিত থাকিবে? কিন্তু জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে যে আবার ভাঁটা আছে, সেটা বুঝি ভাবিবার অবসর পাও নাই? কিয়ৎক্ষণ পরেই যে আবার দুঃখ-ভাঁটার একটানা স্রোতে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতে হইবে, সেটা মনে করিয়াছ কি? তাই বলিতেছি, হে মোহান্ধ, সাবধান!—সময় থাকিতে সতর্ক হও, সুখের মলয়ানিল উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের অনলোচ্ছ্বাস সহিবার শক্তি ধারণ কর। তাহা হইলেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। ঐ শুন প্রকৃতির ভেরী নিনাদ, "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

পাঠক মহাশয়, আমরা প্রসঙ্গক্রমে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এইবার আমরা নলিনাক্ষের বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইব। কাশীধামে সেই সন্ন্যাসীর নিকট পূর্ণাভিষিক্ত হওয়ার পর, দুই মাস গত হইয়াছে, আমরা আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই! সম্ভবতঃ সে এখন সন্ন্যাসীর উপদেশ মত নির্জ্জন কানন প্রান্তরে গুরুকন্যার উদ্দেশ করিতেছে। আসুন, আমরা এই অন্ধকারময় গহন কাননে প্রবেশ করিয়া একবার তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখি। উঃ! কি বিকট অন্ধকার! নৈশ অন্ধকারে কাননান্তর্গত গভীর অন্ধকারকে আরও যেন গভীর করিয়া তুলিয়াছে। এই ভীষণ আঁধারে কোলের মানুষ দেখি-বার যো নাই, কেবল অন্ধকারের পর অন্ধকার-শ্রেণী যেন স্তরে

স্তরে বিন্যস্ত হইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। কার সাধ্য এই ঘন নিবিড় অন্ধকারে পদাগ্রভাগ প্রসারণ করে? উঃ, কি বিকট গর্জ্জন! সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ পশুগণের গভীর নিনাদে যেন, কানন-ভূমি বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আসুন পাঠক মহাশয়, আমরা একটু অগ্রসর হইয়া, এই ভীষণ কাননের ভীষণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি। ও কি ও? ও কিসের শব্দ? ঠিক যেন মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি? যেন কোন বিপন্ন অভাগার হতাশ-ব্যঞ্জক হৃদয়ের কাতর আর্ত্তনাদ? আহা কে তুই অভাগা? এই নিবিড় নিশীথে, বিজন বিপিনে, কে তুই? এই হিংস্র জন্তু-সঙ্কুল ভয়াবহ স্থানে, কে তুই দুঃসাহসী একাকী ভ্রমণ করিতেছিস্? আহা! তোর কি প্রাণের মায়া নাই? অপঘাতেও কি তোর আশঙ্কা হয় না? অথবা হয় ত, আমি ভুল বুঝিয়াছি, বোধ করি তুমি এই কাননের অধিষ্ঠাতৃ কোন দয়াময় দেবতা, কাননবিহারী দিগ্‌ভ্রান্ত বিপন্ন পথিকগণকে, হিংস্র বন্যপশুদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া, পথ প্রদর্শনের জন্য, এই গভীর নিশায় কাননময় বিচরণ করিতেছ। হে করুণাময় প্রভো! তোমার চরণোপান্তে কোটী কোটী প্রণাম করি। পাঠক মহাশয় আসুন! আমরা আরও একটু অগ্রসর হইয়া এই মহাপুরুষের বিচিত্র কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন সার্থক করি। হরি হরি! একি! এ স্বর যে আমাদের পরিচিত! এ যে আমাদের সেই নলিনাক্ষের কণ্ঠধ্বনি! এ যে আমাদের সেই যুবক নলিনাক্ষের ব্যাকুল হৃদয়ের আকুল উচ্ছ্বাস! আ—হা—হা!! মরি মরি মরি!! কি সাধুতা!! কি একাগ্রতা!! কি ধর্ম্মপরায়ণতা!! কি ভক্তিপ্রবণতা!!

ধন্য! ধন্য! ধন্য যুবক! ধন্য নলিনাক্ষ! ধন্য তোমার গুরুভক্তি! ধন্য তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

বামদেবের পরামর্শানুসারে যোগানন্দ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি নলিনাক্ষ সম্বন্ধে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন, যোগানন্দ সে সমস্ত সমাধা করিয়া তাহাকে সাতিশয় উৎসাহিত করিয়াছেন—সেই উৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া নলিনাক্ষ এইবার অসাধ্য সাধনে বিজন বনে প্রবেশ করিয়াছেন। এখন আত্মপ্রকাশ করিলে পাছে, নলিনাক্ষের কোনরূপ অমঙ্গল হয়, পাছে তাহার গুরুদর্শনের ইচ্ছা বলবতী হয় এইজন্য তিনি কেবল কথা না বলিয়া নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় তাহার সৎসাধনার সাহায্য করিতেছেন। নিতান্ত বালক ভাব না হইলে, বালকের ন্যায় কাঁদিতে না পারিলে, এ পথে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। তাই—নলিনাক্ষ এক্ষণে যেন সমস্ত ভুলিয়া ঠিক বালকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বালকের ন্যায় ক্রন্দনের পবিত্র তীব্রতা উপস্থিত না হইলে মাতৃক্রোড়ে সাধক সন্তানের স্থান লাভ অসম্ভব, ভক্তির অশ্রুনীর ব্যতীত তাহা প্রাপ্তির আশা স্বপ্নবৎ অলীক। ভক্তি প্রাবল্যে মাতৃ-ক্রোড় সাধকের পক্ষে যে সহজ-সাধ্য, তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন না সত্য।

সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের পর ছই মাস কাল নলিনাক্ষ অন্নের মুখ দেখেন নাই; ছুই মাস কাল একমুষ্টি অন্নও তাঁহার উদরস্থ হয় নাই। এই অসম্ভব কষ্ট সহিষ্ণুতা দেখিয়াই বলিতে হয়, মানুষ ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইলে সমস্ত করিতে পারে, তাহার ক্ষমতার তুলনা নাই। এই জন্য পূর্ব্বে যোগী, ঋষি এবং ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা না করিয়া কখনও সংসারী হইতেন না। দুঃখের দাবদাহে দগ্ধ হইয়া অচল অটল ভাবে জীবন কাটাইতে কেবল ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ ব্রাহ্মণই পারেন, আর কেহই তাদৃশ কষ্ট সহ্য করিতে পারে না। এরূপ অনশন কষ্ট, কখন বা বনের কটু কষায় ফলমূল ভক্ষণ করিয়া কে কতদিন জীবিত থাকিতে পারে? ধন্য জগদীশ! ধন্য তোমার মহিমা, তোমার অদ্ভুত মাহাত্ম্য কল্পনারও অতীত, সকলই তোমার খেলা, তুমি কৃপা না করিলে, নলিনাক্ষের ন্যায় যুবক এত কষ্ট সহ্য করিয়া, এতদিন জীবিত থাকিতে পারিত না। কারণরূপী তুমিই তাহার মনে এতাদৃশ দৃঢ়তা আনিয়া দিয়াছ—যাহার বলে নলিনাক্ষ জাগতিক দুঃখকে দুঃখ বলিয়াই জ্ঞান করেন না। কাশী আগমনের পূর্ব্বে দুই বৎসরব্যাপী তীর্থ-পর্য্যটনেও তাঁহাকে এত ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় নাই।

একাদিক্রমে এরূপ দীর্ঘ অনশন ক্লেশ তাঁহার ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নাই। নলিনাক্ষ যদিও স্বয়ং যাচ্ঞা করিতেন না, তথাপি তখন মধ্যে মধ্যে আহার মিলিত, কোন কোন করুণ-হৃদয় মহাত্মা, উঁহার বুভুক্ষু-পীড়িত বদন সন্দর্শনে কৃপাপরতন্ত্র হইয়া, অযাচিতভাবে অন্ন প্রদান করিতেন। পাঠক মহাশয়, এই দুই মাস নলিনাক্ষ নির্জ্জন প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছেন, সুতরাং অন্ন কোথায় পাইবেন। তিনি স্বয়ং চেষ্টা করিয়াও একদিনও আহারের অন্বেষণ করেন না। দৈবাৎ কোন কোন দিন কোন বন্যফল বা গলিত বৃক্ষপত্র সম্মুখে পাইলে অনাহার-জনিত ক্লেশ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনিচ্ছা সত্বেও তাহা আহার করিতেন, দারুণ পিপাসায় প্রাণ যায় যায় হইলে, অঞ্জলি-পূর্ণ বারি পানে তৃষ্ণার শান্তি করিতেন। সময়ে সময়ে উচ্চৈঃস্বরে গুরুকন্যাকে ডাকিতেন, "মা গুরু কন্যে, দিগম্বরি! মা কোথায় তুমি"—বলিয়া কানন-ভূমি প্রতি-ধ্বনিত করিতেন। "মা কালি! আর কষ্ট দিস্‌নে মা! তোর কাঙ্গাল সন্তানের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর্ মা"—এই বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেন। "মা! ভাল লোকের মুখে শুনেছি, তুই নাকি নির্জ্জন প্রদেশে থাক্‌তে বড় ভালবাসিস্, তাই মা লোকালয় ছেড়ে, অসহ্য কষ্ট সহ্য ক'রে এখানে এসেছি মা, দেখা কি দিবি না; অভাগার সকল আশা কি বিফল হবে? এইরূপে আর কতদিন বাঁচ্‌বো মা? জীবন কি বৃথায় যাবে; গুরুদেবের ঋণ কি পরিশোধ করিতে পারিব না মা! এত করিয়া ত কই দেখা পেলাম না, সন্ন্যাসী ঠাকুরের আদেশে শত শত প্রান্তর; কত কানন, কত দুর্গম অরণ্যানী খোঁজ

করিলাম, তথাপিও দেখা পেলাম না। গুরুমুখে শুনেছিলাম— তুই বড় দয়াময়ী, কাহারও কষ্ট দেখ্‌তে পারিস্‌ না, এখন দেখ্‌ছি তুই পাষাণী, তোর হৃদয়ে দয়ামায়ার লেশ মাত্র নাই। এই গহন কাননে অহোরাত্র মা মা বোলে ডাক্‌ছি, সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রদত্ত মন্ত্রটী একাগ্রচিত্তে অহরহঃ জপ ক'র্‌ছি, কিন্তু ফল হ'ল কই?' তবে কি সন্ন্যাসীর কথাও মিথ্যা? না না তাহা হইতে পারে না; আমার কপালই নিতান্ত মন্দ, নতুবা মাকে প্রসন্ন করিতে পুত্র কি এত কষ্ট পায়?" নলিনাক্ষ সমস্ত দিন অরণ্য পরিভ্রমণ করিয়া একাকী বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। দেহ অবসন্ন হইয়াছে, প্রাণ অস্থির হইয়াছে। শরীরে আর কিছুমাত্র বল নাই, হতাশ অবসাদে নলিনাক্ষ বৃক্ষে দেহভার ন্যস্ত করিয়া গাহিলেন —

ঈশানী পাষাণী কি মা হয়েছ অধীনের বেলা।
তারিতে তনয়ে কাতর, পা তোর দিতে হলি পাথর,
পিতার ধর্ম্ম রাখিলি মা তোর, তাই আমায় ক'রিলি হেলা॥

ক্রমে রজনী হইল, অন্ধকারে নলিনাক্ষ আর কোথাও যাইতে পারিলেন না। হিংস্রজন্তুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি একটী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কেবল চিন্তা, চিন্তার বিরাম নাই; জননীর পাদপদ্ম চিন্তা করেন, আর সেই সন্ন্যাসীর অমোঘ উপদেশ হৃদয়ে ধারণা করিতে লাগিলেন। কখন সন্ন্যাসীর কথায় অবিশ্বাস হইতেছে, আবার কখন মনে হইতেছে—না না তাকি হইতে পারে, আমার ন্যায় নিরাশ্রয়কে প্রতারণা কি সেরূপ ত্যাগী ব্যক্তি কখন

করিতে পারেন? তাঁহার সেই কারুণ্য-পূর্ণ মুখখানি, তাঁহার সেই সুধামাখা উপদেশ বাণী, সেই অযাচিত অনুগ্রহ, সেই স্বর্গীয় জ্যোতিরুদ্ভাসিত দেবকান্তি মনে হ'লে, কখনই তাঁকে প্রতারক ব'লে বিশ্বাস হয় না। সাধু তিনি, তাঁর কি দোষ, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। প্রবল বাষ্পস্রোতে চিন্তাস্রোত কিছু কালের জন্য মন্দীভূত হইয়া যুবক রোদন করিতে লাগিলেন। নলিনাক্ষ হতাশ-বিহ্বল হইয়া রোদন করিতেছেন, এমন সময়ে একটী ভীষণাকার ব্যাঘ্র সেই বৃক্ষতলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল; অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে বোধ হইল কোন প্রাণী তথায় আসিয়াছে। নলিনাক্ষ বৃক্ষের অতি নিকটেই ছিলেন। মনে করিলেন—আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া বুঝি গুরুকন্যা দর্শন দিতে আসিয়াছেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে যে মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন—তাহাতে ত কোন বিপদই আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তবে মা নিশ্চয়ই আমার প্রতি সদয় হইয়াছেন। এই বলিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া সুমধুর স্বরে মাতৃনাম উচ্চারণ করিতে করিতে নলিনাক্ষ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্র তাঁহার সেই ভীষণ কণ্ঠস্বর শ্রবণে ভীতচিত্তে পলায়ন করিল। তাহার ত্বরিত পাদক্ষেপপিষ্ট শুষ্ক বৃক্ষপত্রসমূহ হইতে অস্ফুট ধ্বনির উৎপত্তি হইতে লাগিল। নলিনাক্ষ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া অন্ধকারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ব্যাঘ্র প্রমাদ গণিয়া বিকট শব্দে একটী গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। নলিনাক্ষ অতঃপর আর কোন শব্দ না পাইয়া

নিরাশার দারুণ দংশনে অবসন্ন দেহে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন।

ক্রমে তিমির-বসনা শর্ব্বরীর গাঢ়তা হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পূর্ব্বাকাশ উদয়োন্মুখ প্রভাকরের লোহিত কিরণে অনুরঞ্জিত হইয়া নিশার অবসান সংবাদ বিজ্ঞাপন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দিনমণি সমুদিত হইলেন। পাঠক মহাশয় আসুন, আমরা এইবার দিবালোকে একবার নলিনাক্ষের অবস্থা প্রত্যক্ষ করি। ঐ দেখুন, নলিনাক্ষ অরণ্যগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া হিমালয়ের পাদদেশ সমীপবর্ত্তী এক শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া আছেন। আহা কি করুণ দৃশ্য! উহাঁর মলিন অবস্থা নিরীক্ষণ করিলে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়। ঐ দেখুন, কণ্টকাকীর্ণ বল্ললতাগুল্মে উহাঁর সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া অনর্গল শোণিতধারা প্রবাহিত হইতেছে, চক্ষুর্দ্বয় কোটরগত, দেহ অস্থিপঞ্জরাবশিষ্ট, সেই রম্য গৌরকান্তি অদৃশ্য হইয়া সর্ব্বাঙ্গব্যাপী পাণ্ডুবর্ণে যেন মৃত্যুর বীভৎস ছায়া প্রকটিত হইয়াছে। সাধারণ মানুষ কি এত কষ্ট সহ্য করিতে পারে! ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ দারুণ কষ্ট-সহিষ্ণু না হইলে, এ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করা কাহারও সাধ্য নাই। মৃত্যুর দারুণ যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে, কালভয়নিবারিণী কালীর করুণা লাভ করিতে হইলে, ভবভয় হইতে নিস্তার পাইতে হইলে, প্রথমতঃ এইরূপ যন্ত্রণাই সহ্য করিতে হয়, নতুবা জীবের ভবকারামোচন হইবে কিসে, কিসে এই অনবরত গতায়াত হইতে নিস্তার পাইবে!

নলিনাক্ষ আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, আস্তে

আস্তে সেই বিস্তৃত প্রস্তর-খণ্ডে শয়ন করিলেন। বহুদিন গত হইল, তিনি এতাদৃশ অলস কখন হন নাই, মুহূর্ত্তের জন্তও তিনি কখন শয়নের ইচ্ছা করেন নাই; জানি না আজ তাঁহার কিসের এত অবসাদ। শয়নের অব্যবহিত পরে তাঁহার নিদ্রাবেশ হইল। তিনি দীর্ঘকাল হইতেই নিদ্রাসুখে বঞ্চিত, তাই যেন আজ সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবী তাঁহার তন্দ্রাভাব-জনিত মলিনতা দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া অসময়ে নলিনাক্ষকে কোলে টানিয়া লইলেন। তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া গভীর নিদ্রার সুখানুভব করিলেন। পরে নিদ্রার গভীরতা তিরোহিত হইলে নিদ্রাসহচরী স্বপ্ন আসিয়া দেখা দিলেন। নলিনাক্ষ স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন—যেন তিনি সেই দুঃখময় জগৎ পরিত্যাগ করিয়া এক স্বর্গীয় রাজ্যে উপনীত হইয়াছেন, এমন অদ্ভুত রাজ্য তিনি কখনও দেখেন নাই। নলিনাক্ষ দেখিলেন এ রাজ্যের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি সকলই বিচিত্র। এ রাজ্যে দুঃখ দারিদ্র্য নাই, আধিব্যাধি নাই, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, জরা বার্দ্ধক্য নাই, এ রাজ্যে শোকের উষ্ণ অশ্রু নাই। বিরহের বৃশ্চিক দংশন নাই, হতাশের কাতর আক্ষেপ নাই। এ রাজ্যে আলোক আছে—উত্তাপ নাই, সংযোগ আছে বিয়োগ নাই, মিলন আছে—বিচ্ছেদ নাই, এ রাজ্যে দিনেশ আছে—দিবস নাই, সুধাংশু আছে—সর্ব্বরী নাই, বারিদ আছে—বর্ষণ নাই। এখানকার সকল লোকই চিরসুখী, চিরপ্রফুল্ল, সকলেই যেন নব যৌবনের অপূর্ব্ব পূর্ণতায় নিয়ত সহাস্য-বদন! ঋতুরাজ বসন্ত যেন এখানে বারমাস মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

নলিনাক্ষ যেন দেখিতে লাগিলেন এ রাজত্বে অত্যাচার

অবিচার নাই, রাজা প্রজাগণের প্রতি উৎপীড়ন করিয়া রাজস্ব আদায় করেন না। এখানকার রাজার রাজ্য চির-শান্তিময়! কেহ কাহারও প্রতি হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা প্রকাশ করে না; সকলের প্রতি সকলের সহানুভূতি অটুটভাবে বর্ত্তমান। মানুষ হইয়া মানুষের সর্ব্বনাশ করিতে, কোন প্রকার বিপাকে ফেলিয়া তাহার রক্ত শোষণ করিতে—এখানকার লোক আদৌ অভ্যস্ত নহে। সকলেই যেন এক প্রাণ—এক আত্মা হইয়া হাসিখেলায় দিনপাত করিতেছে; কোন অভাব অভি-যোগ নাই, শঠতা প্রতারণা এখানকার লোকের অন্তর কলু-ষিত করিতে পারে না। এ রাজ্যে সকলেই সমভাবে বিহার করিয়া আপন অভীষ্টসিদ্ধি করিতেছে। এখানে লোকাপবাদে কেহ মর্ম্মাহত হয় না; আর্ত্তের সেবা, পরের প্রতি সদয়ভাব এখানকার নিত্যকর্ম্ম। মরি! মরি! এমন স্থান কি আর আছে; এমন পবিত্রতা, এমন শান্তির আগার পবিত্র রাজ্য মানবচক্ষুর অগোচর, যাহারা এস্থানে আসিতে পারি-য়াছে, তাহাদের কত সুখ, কত শান্তি; এখানে প্রকৃতি বিপর্য্যয় নাই, কালে সমস্তই হইয়া থাকে। এখানকার তরুলতা সকল বড়ই বিচিত্র-দর্শন, বড়ই বিচিত্র গুণ-সম্পন্ন, রজতময় বৃক্ষে থরে থরে হীরকের ফল শোভা পাইতেছে, সুবর্ণময় ব্রততী-সমূহে মণি, মুক্তা, মরকতাদি রত্নরাজি স্তবকে স্তবকে সমুৎপন্ন হইয়া স্রষ্টার অদ্ভুত রচনা কৌশল অভিব্যক্ত করিতেছে। নানা জাতীয় পুষ্পোদ্যানে নানাজাতীয় বিচিত্রকুসুমাবলী বিচিত্র বর্ণ জ্যোতিতে দিক্‌সমূহ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐ সকল কুসুম চিরদিনই অপরিম্লান ও বিকসিত থাকিয়া এক অনাঘ্রাত-

পূর্ব্ব অপূর্ব্ব সৌরভ নিঃসারণ পূর্ব্বক অনুক্ষণ সমস্ত রাজ্য আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। নলিনাক্ষ দেখিলেন, এ রাজ্যের রাজা বড়ই ন্যায়নিষ্ঠ, বড়ই প্রজারঞ্জক, বড়ই নিরপেক্ষ। প্রজামণ্ডলীর সুখ সমৃদ্ধির অবধি নাই; নানা বর্ণের নানাজাতীয় প্রজা একই শাসন নীতিতে পরিচালিত, একই রাজানুগ্রহে অনুগৃহীত এবং একই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত; এখানে বর্ণভেদে বিচার ভেদ নাই, বিচার ভেদে পক্ষপাতিত্ব নাই; সকলেরই সমান সুখ, সকলেরই সমান সঙ্গতি, সকলেরই সমান ঐশ্বর্য্য। নলিনাক্ষ আরও দেখিলেন, প্রজাবৃন্দের রাজভক্তির ইয়ত্তা নাই, সকলেই অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া অনুক্ষণই রাজার জয় ঘোষণায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। রাজার জয় ঘোষণা ভিন্ন যেন তাহাদের আর কোন কার্য্যই নাই। সকলেই সমস্বরে কেবল "জয় মা জগদম্বার জয়, জয় মা পতিত-পাবনীর জয়, জয় মা কালিকার জয়, জয় মা বিপদনাশিনীর জয়, জয় মা দিগম্বরীর জয়, জয় মা দিনতারিণীর জয়, জয় মা অন্নপূর্ণার জয়" ইত্যাদি বাক্য পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিয়া আনন্দ ভরে নৃত্য করিতেছে। স্বপ্নাবেশে এই সকল ব্যাপার দেখিতে দেখিতে তিনি যার-পর-নাই বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ প্রজাগণের উক্তির অন্তর্ভূত কয়েকটী কথায় তাঁহার আর আশ্চর্য্যের অবধি রহিল না। নলিনাক্ষ ভাবিতে লাগিলেন,—"কালী, দিগম্বরী" নাম ইঁহারা কোথায় পাইলেন? এ নাম যে আমার আচার্য্য কন্যার? ইঁহারা কি তবে আমার গুরুকন্যাকে চেনেন? ইঁহাদের কাছে কি তবে আমার গুরুকন্যার সন্ধান পা'ব? আহা! এইবার কি আমার সকল পরিশ্রম সফল হ'বে?

ইঁহারা কি আমার গুরুকন্যার প্রজা? আমার গুরুকন্যাই কি এ দেশের রাজরাণী? প্রজাগণের উক্তি হ'তেই স্পষ্টই উপলব্ধি হ'চ্ছে, এটা স্ত্রীলোকশাসিত রাজ্য; তবে সত্য সত্যই কি আমারই গুরুকন্যা এ রাজ্যের অধিশ্বরী? অসম্ভব—অসম্ভব! কখনই তিনি এ রাজ্যের অধিস্বামিনী নহেন,—এটা আমার মোহমুগ্ধ মানসের ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত অলীক কল্পনা মাত্র। ঐত প্রজাগণ আরও অসংখ্য নামে উহাদের রাজেশ্বরীর গুণগান করিতেছেন? বোধ হয় এ দুইটী নামও ঐ অসংখ্য নাম-সিন্ধুর দুইটী ক্ষুদ্র বারিবিন্দু। কিন্তু একটী বিষয়ে যে আমার মনে অত্যন্ত সংশয় উপস্থিত হ'চ্ছে, আমার আচার্য্য মহাশয় আমাকে ব'লেছিলেন,—"বৎস! আমার কন্যার অনেকগুলি নাম আছে,"—এখন যদি আচার্য্যের কথা সত্য হয়, তবে "কালী, দিগম্বরী" ব্যতীত অন্যান্য নামগুলিও যে আমার গুরু-কন্যার নাম হতে পারে না, এ কথা অস্বীকার করিব কিরূপে? যাহা হউক, যখন এ দেশে এসেছি, তখন ইহাদের অধীশ্বরীকে একবার না দেখে যাচ্ছি না, তাঁকে দর্শন ক'র্‌লেই সকল সংশয় নিরাকৃত হবে।" এইরূপ বিতর্ক করিতে করিতে নলিনাক্ষ, সেই প্রজাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে মহাত্মন্‌গণ! আপনারা দয়া করিয়া একবার আমাকে আপনাদের রাজ্যে-শ্বরীর কাছে লইয়া চলুন! বিদেশী আমি, এ স্থানের সমস্তই আমার অপরিচিত। আপনাদের রাজ্যেশ্বরীর অনন্ত মহিমা এবং করুণার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য বড়ই সাধ হইয়াছে।" কেহই নলিনাক্ষের কথায় কর্ণপাত করিল না, সকলেই নাম সঙ্কীর্ত্তনে বিহ্বল, আত্মহারা, উদ্‌ভ্রান্ত;—কেহই

তাঁহার কথা শুনিল না। নলিনাক্ষ তাহাদের উদাস ভাব দেখিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং অতঃপর কি উপায়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে, তাহার ইতি-কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হায়! এ জগতে দুর্ভাগার প্রতি কেহই দৃষ্টিপাত করে না, দুর্ভাগার কথায় কেহই মনোযোগী হয় না"—এইরূপে আক্ষেপ করিতে-ছেন, এমন সময়ে হঠাৎ যেন দৈববাণী হইল, "বৎস নলিনাক্ষ! চিত্ত-দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ কর, কাতর হইবার কোনই কারণ নাই, সেই মহামন্ত্রটি একাগ্রচিত্তে জপ করিতে থাক, শীঘ্রই তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।"—নলিনাক্ষ দৈববাণী শুনিয়া একান্ত বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বোধ হইল, এ যেন ঠিক সেই মহারাজার সভা-সমাগত মহাপুরুষ রামপ্রসাদের কণ্ঠস্বর, সেই করুণ নির্ঝরিণীর অমৃত প্রবাহ আজ স্বপ্নরাজ্যে অকস্মাৎ তাঁহাকে পথ দেখাইতে আসিয়াছেন! অতঃপর যুবক দৈববাণীর আশ্বাস-সূচক বাক্যে অধিকতর প্রোৎসাহিত হইয়া নিমীলিত নয়নে সেই মহামন্ত্র জপে মনো-নিবেশ করিলেন। বহুক্ষণ এইরূপ ভাবে মন্ত্র জপ করার পর তিনি যেন আবার শুনিতে পাইলেন,—"বৎস! নয়ন উন্মীলন কর, আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে এই রাজ্যের অধিশ্বরীকে দেখাইব।" এই কথা শুনিয়া তিনি নয়ন উন্মীলন করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন, বাস্তবিকই তাঁহার অনুমান সত্য হইয়াছে; যাঁহার প্রাণস্পর্শী ভক্তিমাখা সঙ্গীত শ্রবণে নলিনাক্ষের হৃদিপদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, যাঁহার ইচ্ছায় তিনি সকল ছাড়িয়া ভক্তি-পথের পথিক হইয়াছিলেন, নলিনাক্ষ

তাঁহারই নিকটে আগমন করিয়াছেন। সেই সন্ন্যাস-বেশী প্রসাদকে দেখিবামাত্র আনন্দে অধীর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার পদ বন্দনা করিলেন এবং একান্ত ভক্তিসহকারে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া, কিরূপে তিনি এখানে আগমন করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"বৎস! জগদম্বা তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন, তাই সিদ্ধমন্ত্র এতদিন পরে তোমার কর্ণকুহর পবিত্র করিয়াছে, তোমাকে পূর্ণাভিষিক্ত হইতে দেখিয়া এবং তোমার কাশীধাম হইতে প্রস্থান করার পর তোমার হৃদয়ের একাগ্রতা দেখিয়া সিদ্ধি স্থির নিশ্চয় করিয়াছি। আমি কার্য্যানুরোধে কয়েকটি স্থানে গমন করিয়াছিলাম। সেই সকল কার্য্য শেষ করিয়া সম্প্রতি এই দিকেই আসিতেছি। বৎস! এ রাজ্যের আমিও একজন ক্ষুদ্র প্রজা। এই বলিয়া গাহিলেন "আমিই ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা।" আমার গমনপথ হইতে হঠাৎ তোমার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া, কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে প্রচ্ছন্নভাবে ইতোপূর্ব্বে তোমার নিকটে আসিয়াছিলাম এবং পরিশেষে আমাদের রাজ্যেশ্বরীর দর্শনে তোমাকে সাতিশয় অনুরক্ত ও আগ্রহান্বিত দেখিয়া আমিই দূর হইতে আশ্বস্ত করিয়াছিলাম। বৎস! আমাদের রাজ্যেশ্বরীর দর্শনলাভ সহজ-সাধ্য নহে, কঠোর ক্লেশ স্বীকার না করিলে, কেহই তাঁহার সাক্ষাৎ পায় না। তিনি বড়ই দুর্গম স্থানে বাস করেন, তাঁহার দর্শনার্থী যাত্রিগণকে পথে বহুতর বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। বারাণসীধামে সন্ন্যাসী তোমাকে যে মন্ত্রটি দিয়াছেন, তাহা একান্তচিত্তে জপ করিলে তৎপ্রভাবে তোমার সর্ব্ববিধ দুরপনেয়

ত্তরে আশার উপাসক কোন্ ব্যক্তি নহে? যোগী, শোকী, দীন, দরিদ্র হইতে রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত কোন্ ব্যক্তি আশার উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত না হয়? ফলতঃ এ দুঃখময় জগতে আশাই একমাত্র সুখের নন্দন কানন, আশাই হতাশপীড়িত নরনারীকুলের জীবন-দায়িনী মৃতসঞ্জীবনী। আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বে পরিশেষে নিরাশারই পরাজয় হইল। নলিনাক্ষ পরিশেষে আশার অনু-প্রবেই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইল, গুরুকন্যা নিশ্চয়ই এই খানেই আছেন। অতঃপর তিনি সানন্দমনে রাজপুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, সে দৃশ্য অতুলনীয়, কল্পনা সে আলে-খ্যর একটি রেখাও অঙ্কিত করিতে সমর্থ নহে। সেই স্বর্গীয় রত্নরাজীতে অলঙ্কৃত, স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্যে গৌরবান্বিত, স্বর্গীয়গন্ধে আমোদিত, স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত, স্বর্গীয় পুরীর স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিবার উপযুক্ত শব্দ বুঝি ভাষায় নাই। নলি-নাক্ষ দেখিলেন, সেই সুবর্ণময়ী পুরী দিগন্ত বিস্তৃত, তাহার মধ্য-স্থলে এক দিগন্ত বিস্তৃত মর্ম্মরময় প্রাঙ্গন, প্রাঙ্গনের চতুষ্পার্শে বিবিধ রত্ন খচিত অসংখ্য হৈম অট্টালিকাশ্রেণী মণ্ডলাকারে শোভা পাইতেছে। সেই সকল অট্টালিকা আবার অনন্ত সংখ্যক প্রকোষ্ঠে বিভক্তিকৃত, সেই সকল প্রকোষ্ঠে আবার অনন্ত সংখ্যক দেবতা অনন্ত সংখ্যক সিদ্ধ মুনি ঋষিগণ দ্বারা নিসেবিত। কোন প্রকোষ্ঠে ব্রহ্মা, কোন প্রকোষ্ঠে বিষ্ণু, কোন প্রকোষ্ঠে বাসব, কোন প্রকোষ্ঠে সূর্য্য, কোন প্রকোষ্ঠে শশাঙ্ক, কোন প্রকোষ্ঠে বায়ু, কোন প্রকোষ্ঠে বরুণ, কোন প্রকোষ্ঠে যম, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন দেবতাগণ এবং সিদ্ধ মুনি ঋষি বৃন্দ

বিরাজমান। সকলেই মুদিত নেত্রে যুক্ত করে রাজেশ্বরী কালিকার স্তোত্রপাঠ করিতেছেন। নলিনাক্ষ কালিকার এই অবাঙ্‌মানসগোচর ঐশ্বর্য্য ও মহিমাদর্শনে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"বৎস! এইবার আমাদের রাজ্যেশ্বরীর দর্শন পাইবে। ঐ দেখ, এই সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনের কেন্দ্রস্থানে তাঁহার সমুন্নত রাজপ্রাসাদ শোভা পাইতেছে! চল, এখন আমরা ঐদিকেই গমন করি। নলিনাক্ষ সন্ন্যাসীর কথায় আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না, কেবল সেই রাজপ্রাসাদ লক্ষ্য করিয়াই দ্রুতগতি তদভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যে স্থানে এই প্রাসাদ অবস্থিত সেই স্থানকে আনন্দনগর বলে। এইরূপে গমন করিতে করিতে, রাজ্যে-শ্বরীর প্রাসাদ সমীপস্থ হইলে, তিনি সেই অপূর্ব্ব প্রাসাদের সৌন্দর্য্য দর্শনে অবাক হইয়া গেলেন। দেখিলেন, প্রাসাদটির আদ্যন্ত স্পর্শমণিতে বিনির্ম্মিত, প্রাসাদ গাত্রের স্থানে স্থানে কোটী কোটী প্রভাকরের উজ্জ্বল কিরণোদ্যোতক এক এক খণ্ড বিচিত্র পদার্থ গ্রথিত রহিয়াছে, তন্নিঃসৃত সুখদ-শীতলস্পর্শ জ্যোতিতে সমস্ত রাজপুরী এবং সমস্ত নগরী যেন এক অনির্ব্বচনীয় আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও যে সকল অপূর্ব্বদৃশ্য রহিয়াছে, তাহাদের অপার সৌন্দর্য্য-সম্ভার বর্ণনা করা অসাধ্য। নলিনাক্ষ, হতবুদ্ধি হইয়া সেই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছেন, এমন সময় সন্ন্যাসী বলিলেন, "আইস বৎস! এইবার আমরা প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি, তাহা হইলেই তুমি আমাদের রাজেশ্বরীর দর্শন পাইবে। সন্ন্যাসীর কথায় নলিনাক্ষ, সেই মহামন্ত্রটি ভক্তিপূর্ব্বক জপ

করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, মনে স্থির বিশ্বাস, সন্ন্যাসী বলিয়াছেন,—"মন্ত্রের কৃপায়, এইবার তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে।" অনতিবিলম্বে তিনি প্রাসাদ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়া তিনি যাহা দেখিলেন— তাহাতে তাঁহার হৃদয়কন্দরে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইল। তিনি দেখিলেন—এ যে তাঁহারই সেই গুরু-কন্যা কালিকা!! সেই গুরু-কন্যা দিগম্বরীই, এই রাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বরী!! এ যে সেই কালরূপের অম্লান প্রতিবিম্ব! গুরুমুখ বিনিঃসৃত এ যে সেই কালরূপ! যে কালরূপের অমল বিভায় ত্রিভুবন আলোকিত হয়, এ যে সেই কালরূপ! এ যে সেই ধরণীলুণ্ঠিতা আলুলায়িত কুন্তলা এলোকেশী! এ যে সেই ত্রিনয়না, চতুর্হস্তা, নরকরশির-সমালঙ্কৃতা দিগম্বরী ষোড়শী রূপসী! মরি মরি! এ কি রূপ রে! এ রূপ দেখে যে আর নয়ন ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয়, দিবানিশি ঐ কালরূপ-সাগরে ডুবে থাকি। ধন্য গুরুদেব! ধন্য প্রভো আচার্য্য! ধন্য তোমার সৌভাগ্য! এমন মেয়ের জনক যে জন—আহা, তাঁর ভাগ্যের কি আর সীমা আছে? আর শত শত ধন্যবাদ আমাকে, সহস্র সহস্র ধন্যবাদ আমার সৌভাগ্যকে, সার্থক আমার জীবন, সার্থক গুরুভবনে গমন, সার্থক আমার গুরুসন্নিধানে অধ্যয়ন, সার্থক আমার গুরুদক্ষিণাদানে মনন, সার্থক আমার অনিদ্রা অনশন, সার্থক আমার দেশে দেশে পর্য্যটন, আজ আমার সকল পরিশ্রম সার্থক হইল। নলিনাক্ষ আনন্দে আত্মহারা। এইবার তিনি গুরু-কন্যার কাছে তাঁহার মনের কথা বলিলেন; কন্যাহারা আচার্য্য তাঁহার অদর্শনে, কি কষ্টে কালযাপন করিতেছেন, একটি একটি

করিয়া, বিনাইয়া বিনাইয়া ব্যক্ত করিবেন, কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুকন্যার দুটী পায়ে ধরিয়া, তাঁহাকে পিতৃভবনে যাইতে বারংবার অনুরোধ করিবেন, আরও কত কি বলিবেন, মনে কত সাধ, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

নিদ্রাভঙ্গের পর নলিনাক্ষ দেখিলেন, তিনি সেই কাননাচল মধ্যবর্ত্তী শিলাতলেই শয়ন করিয়া আছেন। কোথায় বা সেই রাজ্য, কোথায় বা সেই সন্ন্যাসী, কোথায় বা সেই রাজপুরী, আর কোথায়ই বা সেই গুরুকন্যা কালিকা! কোথাও কিছুই নাই, স্বপ্নের কুহক, সব স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সব গিয়াছে, কিন্তু স্মৃতি যায় নাই, সেই প্রজাবৃন্দের সুধাময় নাম সংকীর্ত্তন, এখনও যেন তাঁহার কর্ণপটহে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সেই বিচিত্র পুষ্পরাজির বিচিত্র গন্ধ এখনও যেন তাঁহার নাসা-রন্ধ্র আমোদিত করিতেছে,—সব গিয়াছে, কিন্তু স্মৃতি যায় নাই। সেই সন্ন্যাসী, সেই স্বর্গীয় রাজ্য, সেই বিচিত্র তরুলতা, সেই বিচিত্র পুষ্পকানন, সেই অমৃত নদীর অমৃত প্রবাহ, এখনও যেন তাঁহার স্মৃতি-পথে জাজল্যমান রহিয়াছে,—সব গিয়াছে, কিন্তু স্মৃতি যায় নাই। সেই বিচিত্র রাজপুরীর বিচিত্র দৃশ্য, সেই স্বর্গীয় সমৃদ্ধিসম্ভার, সেই স্বর্ণময় অগণিত প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠে ব্রহ্মা বিষ্ণু বাসবাদি অসংখ্য দেবতা এবং অসংখ্য মুনিঋষিগণ, সেই স্পর্শমণি বিনির্ম্মিত বিচিত্র রত্নোজ্জ্বলিত বিচিত্র প্রাসাদে গুরুকন্যা কালিকার বিচিত্র মূর্ত্তি এখনও যেন তাঁহার নয়নপ্রান্তে ভাসিয়া বেড়াইতেছে—সব গিয়াছে কিন্তু স্মৃতি যায় নাই। সব গেল ত স্মৃতি গেল না কেন? "যদি স্মৃতি না গেল ত আমার মৃত্যু হ'লনা কেন? হা দগ্ধ স্মৃতি! তুই গেলেই ত সকল জ্বালার শেষ হ'ত?

কেন তুই অভাগাকে দগ্ধ ক'রবার জন্য থাক্‌লি? অহো! আর যে যন্ত্রণা সহ্য হয় না? হা গুরুকন্যে! হা মা কালিকে! হা মা দিগম্বরি! কি ক'র্‌লি মা—কি ক'র্‌লি? যদি দেখা দিলি ত আবার কেন লুকালি? যদি তোর লুকাবারই ইচ্ছা ছিল, তবে কেন স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে আমারও নাম লুপ্ত ক'র্‌লি না? মা! আমি যে শুনেছি, তোর প্রজাগণ তোকে—পতিত-পাবনী, বিপদনাশিনী, দীনতারিণী, বাঞ্ছাপূর্ণকারিণী—ব'লে ডাক্‌ছিল? হ্যাঁ মা! এই কি তোর সেই সকল নামের মহিমা? মাগো! এ পতিত আর কতদিন পতিত থাক্‌বে? এ বিপন্ন আর কতদিন বিপদ সাগরে নিমগ্ন রহিবে? দীনতারিণি! এ দীনের কি আর পরিত্রাণ নাই? বাঞ্ছাপূর্ণকারিণি! আমার বাঞ্ছা কি আর পূর্ণ হবে না?" নলিনাক্ষ এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে সহসা উন্মত্তের ন্যায় উত্থিত হইলেন, উন্মত্তের ন্যায় পর্ব্বতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, দৃষ্টি—স্থির অপলক। তাঁহার বোধ হইল, যেন হিমাদ্রির এক উন্নত শৃঙ্গে তাঁহার গুরুকন্যা উপবিষ্ট রহিয়াছেন, গুরুকন্যা যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে সেইখানে যাইতে ইঙ্গিত করিতেছেন। এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত, দিগ্‌বিদিক বোধ তিরোহিত এবং হিতাহিত বিবেক অন্তর্হিত হইল, তিনি তখন সেই গিরিশৃঙ্গে স্থিরদৃষ্টি যোজনা করিয়া, বায়ুবেগে দুর্গম গিরি-পথ আরোহণে প্রবৃত্ত হইলেন। যে পথে আরোহণ করা—মানব ক্ষমতার অতীত, বড়ই বিস্ময়ের বিষয়, সেই দুরধিগম্য সুদীর্ঘ পথ তিনি অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিতে লাগিলেন। জানি না, তিনি আজ কোন্ শক্তিবলে এরূপ শক্তিমান্। তাঁহার শরীরে

আজ যেন বল ধরিতেছে না, বোধ হইতেছে, আজ যেন শত শত মত্ত মাতঙ্গও তাঁহার এই অমিতশক্তির কাছে পরাভূত হইয়া যায়।

নলিনাক্ষ অতি সত্বরে সমস্ত গিরিপথ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে সেই শিখর সমীপে উপনীত হইয়া দেখিলেন, যেন—প্রকৃতই তাঁহার গুরুকন্যা শীর্ষচূড়ে অবস্থিত রহিয়াছেন। তখন তিনি আবার সেই গিরি-শিখরে আরোহণ করিতে লাগিলেন। আরোহণ করিতে করিতে তিনি যেই তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন, অমি তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে শৃঙ্গান্তরে প্রস্থান করিলেন। নলিনাক্ষও তৎক্ষণাৎ সেই শৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিয়া, গুরুকন্যা যে শৃঙ্গে প্রস্থান করিয়াছেন, দ্রুতগতি তদভিমুখে ধাবিত হইয়া পুনর্ব্বার তাহাতে আরোহণে প্রবৃত্ত হইলেন। পুনর্ব্বার তাঁহার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলে, পুনর্ব্বার তিনি শৃঙ্গান্তরে প্রস্থিত হইলেন। কয়েকবার এইরূপ করার পর, অবশেষে তিনি বহু দূরবর্ত্তী এক দুর্গম গিরিশিখর-গহ্বরে বিলীন হইয়া গেলেন। নলিনাক্ষ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া থাকিলেন, কিন্তু আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

দৈব-শক্তির নিকট মানব-শক্তি কতক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারে? পুনঃ পুনঃ আরোহণ অবরোহণ করিতে করিতে নলিনাক্ষ এক্ষণে নিতান্ত হীন-শক্তি হইয়া পড়িয়াছেন। উত্তেজনার পর অবসাদ অবশ্যম্ভাবী, ঘাত ও প্রতিঘাতের শক্তি উভয়তঃই তুল্যরূপ কার্য্যকারিণী, যে উত্তেজনা, অসীম আশাদানে নলিনাক্ষকে অসাধ্য-সাধনার্থে উত্তেজিত করিয়া হিমাদ্রিশিখরে উঠাইয়াছিল, এক্ষণে সেই উত্তেজনাই আবার অবসাদ মূর্ত্তি পরি-

গ্রহ করিয়া, তাঁহাকে নিরাশার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করিল। নলিনাক্ষ দেখিলেন, তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইতেছে, গুরু-কন্যা স্বয়ং ধরা না দিলে, তাঁহাকে ধরিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। তাঁহার ধরা দিবার ইচ্ছা থাকিলে কখনই তিনি উৎ-পীড়ন করিতেন না। অতঃপর ঐ দুর্গম গিরিশিখরে গমন করিয়া, তাঁহার অনুসন্ধান করাও আর সহজ-সাধ্য নহে। এইরূপ আন্দোলন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "আর কেন বৃথা চেষ্টা। বুঝিলাম, আমি নিতান্তই মন্দভাগ্য। আমার কপাল মন্দ না হইলে, গুরুকন্যার দর্শন পাইয়াও, তাঁহার কৃপা-লাভে বঞ্চিত হইব কেন? যার কপাল মন্দ এ সংসারে তার বাঁচিয়া ফল কি? আমার এ অদৃষ্ট-বিষবৃক্ষে কখনই অমৃত ফল ফলিবে না।" এইরূপ আলোচনার পর অবশেষে প্রাণত্যাগ করাই স্থিরনিশ্চয় করিয়া, পর্ব্বতের পাদদেশ লক্ষ্যপূর্ব্বক বেগে লম্ফ প্রদান করিলেন। লম্ফ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাহ্য-জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সিদ্ধিলাভ ও সাক্ষাৎকার।

ভক্তাধীনা ভগবতী এইবার প্রমাদ গণিলেন। তাঁহার প্রিয় ভক্ত, প্রাণাধিক নলিনাক্ষ, প্রাণনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে দেখিয়া দারুণ মর্ম্ম-ব্যথায় বিচলিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার করুণার প্রস্রবণ, সহস্র ধারায় উথলিয়া উঠিল। জগজ্জননী দেখিলেন, তাঁহার ভক্তশ্রেষ্ঠ কৃতিপুত্র, কৃতিত্বের চরম সীমায় উপনীত এবং সাধনার কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে সফলতার সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। সুতরাং এখন তাহার কামনা পূর্ণ করার সময় উপস্থিত, ইত্যাদি ভাবনা করিয়া দয়াময়ী পতনোন্মুখ নলিনাক্ষকে আপনার স্নেহশীতল কোলে ধারণ করিলেন। যুবক সচেতন হইয়া দেখিলেন, তিনি সেই কাননাচল মধ্যস্থিত শিলাখণ্ডোপরি এক অপরূপ রূপলাবণ্য-শালিনী যুবতীর অঙ্কদেশে উপবেশন করিয়া আছেন। এই অদ্ভুত রমণীতে, তাঁহার গুরুকন্যার আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য যেন প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান, যেন সেই কালরূপের অমল আলোক-রাশি এই আলোকময়ী রূপে ওতপ্রোত-ভাবে বিমিশ্রিত। সেই সব আছে। বর্ণগত বৈষম্য থাকিলেও রূপের ভাতি যেন একই প্রকার, সেই ত্রিনয়না নবীনা ষোড়শী এলোকেশী। প্রভেদের মধ্যে ইনি হেমাঙ্গী, কাঞ্চন-কিরীটিনী, দশভূজা সাম্বরা, আর তিনি কৃষ্ণাঙ্গী, মুক্তকুন্তলা, চতুর্ভুজা বিগতাম্বরা।

নলিনাক্ষ কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি মা, আমাকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিলে? মা গো! আমি বড় হতভাগ্য, বড় যন্ত্রণায় অহরহঃ জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি, নিরাশার তুষানল প্রতিমুহূর্তে হৃদয়ের প্রতিস্তর ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতেছে। মা গো! মহাপাপী আমি, এ জগতে বুঝি আমার স্থান নাই, মাতা ধরিত্রীও বুঝি তাই আমার পাপভার সহনে অক্ষম হইয়া, ধীরে ধীরে নয়নপথ হইতে সরিয়া যাইতেছেন। কোথায় যাইব মা? কোথায় যাইলে আমার স্থান হইবে? কোথায় যাইলে শান্তি পাইব? তাই মা, শেষে নিরুপায় হইয়া, মরণকেই একমাত্র শান্তিস্থান ভাবিয়া, বড় সাধে তাহারই শরণাগত হইয়াছিলাম। কেন তুমি মা, আমার সে সাধে বাদ সাধিলে? কেন তুমি মা, আমার শান্তির পথে কণ্টক প্রদান করিলে? হে বিচিত্র-রূপধারিণি দশভুজে ত্রিনয়নে! কে তুমি মা? মা গো, তুমি কি এই কাননাধিষ্ঠাত্রী করুণাময়ী দেবকন্যা? কি প্রজাপতি ব্রহ্মার অঙ্ক-লক্ষ্মী ভগবতী ব্রহ্মাণী? কিম্বা বাসবহৃদবিলাসিনী অনন্ত-যৌবনা দেবী ইন্দ্রাণী? অথবা হিমগিরিনন্দিনী কৈলাসেশ্বরী দশভুজা দুর্গা? কে তুমি মা? ছলনাময়ি! কেন এ হতভাগ্যের সহিত ছলনা করিতেছ? কেন আমার রক্ষার বৃথা চেষ্টা করিতেছ? এক্ষণে ছলনা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে ত্বরায় মৃত্যু হয়, সেই উপায় করিয়া দাও! হা গুরুকন্যে! কোথায় রহিলে? হা মা কালিকে! তোর মনে কি এই ছিল মা? হা দিগম্বরি! আমি যে তোর পিতার শিষ্য, তোর সন্তান তুল্য,—সন্তানের সহিত চাতুরী করা কি মায়ের কর্ত্তব্য? হা পাষাণি! পাষাণ-

হৃদয়া! তোর কঠোর প্রাণে কি বিন্দুমাত্র দয়া নাই?” নলিনাক্ষ কাঁদিতে লাগিলেন। ভক্তের করুণ ক্রন্দনে ভগবতীর বুঝি প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। জগন্মাতা স্বীয় অঞ্চলে ভক্তের নয়নজল মুছাইয়া বলিতে লাগিলেন,—“বৎস নলিনাক্ষ! বিলাপ পরিত্যাগ কর। আর তোমাকে গুরুকন্যার জন্য কাঁদিতে হইবে না। তোমার গুরুকন্যা আমারই আলয়ে আসিয়াছেন, এখনই তাঁহার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ করাইব।”

নলিনাক্ষ এই অদ্ভুত রমণীর অদ্ভুত উক্তি শ্রবণ করিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং ব্যগ্রতার সহিত বলিতে লাগিলেন, —“মা! আপনার অলৌকিক মূর্ত্তিদর্শনে এবং অলৌকিক বাক্যশ্রবণে আমি বড়ই বিস্মিত হইয়াছি, এক্ষণে কৃপা করিয়া ত্বরায় আপনার পরিচয় প্রদানে উৎকণ্ঠা দূর করুন। মা গো! গুরুকন্যার দর্শন জন্য আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। আর কতক্ষণ পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে? মা! আপনার একটি কথায় আমি যার-পর-নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, আপনার সহিত ত আমার কখনও আলাপ পরিচয় ছিল না, কিন্তু আপনি আমার নাম কিরূপে জানিতে পারিলেন?”

ভগবতী বলিলেন, “বৎস! গুরুকন্যার দর্শনের আশা পরিত্যাগ কর। এ সংসারে তোমার গুরুকন্যার অস্তিত্ব কোথাও বিদ্যমান নাই। আমার প্রিয়ভক্ত প্রসাদ কন্যারূপে আমার দ্বারা বেড়া বাঁধাইয়াছিল বলিয়া কি সকলেই পারিবে? তোমার আচার্য্য আপন ইষ্ট-দেবতার আরাধনায় অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে তোমার দ্বারা সেই কার্য্য-সিদ্ধির আশায়

তাঁহার অভীষ্ট দেবতার কল্পিত কন্যার নাম আরোপ করিয়া, তোমাকে প্রতারিত করিয়াছেন মাত্র। বৎস! আমিই তোমার আচার্য্যের কল্পিত-কন্যা এবং আমিই তোমার আচার্য্যের এবং তোমার আরাধ্যাদেবী কালিকা। বৎস! তুমি গুরুর প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাবান এবং স্থির-বিশ্বাসী বলিয়া তাঁহার চাতুর্য্যজাল ভেদ পূর্ব্বক যথার্থ তত্ত্ব উদ্ঘাটনে অমনোযোগী হইয়াছিলে, সেইজন্য আমার আরাধনায় তোমাকে অপেক্ষাকৃত অধিক আয়াস ভোগ করিতে হইয়াছে। মূলে প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলে সম্ভবতঃ এত কষ্ট পাইতে হইত না। তোমার অবিচলিত ভক্তি ও অটল বিশ্বাস দেখিয়া, আমিই তোমাকে আমার দর্শনের উপায় করিয়া দিয়াছিলাম। সে সকল কথা পরে জানিতে পারিবে। বৎস! কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান ঘটনা পরম্পরা সর্ব্বদাই আমার নখদর্পণে প্রতিবিম্বিত, কোন বিষয়ই আমার অগোচর নাই।"

ভগবতীর কথায় বাধা দিয়া নলিনাক্ষ বলিলেন, "বুঝিলাম মা, এখন আমার নাম পরিজ্ঞাত হওয়া তোমার পক্ষে কিছু মাত্র আশ্চর্য্যজনক হয় নাই।"

নলিনাক্ষের কথা শেষ না হইতেই ভগবতী বলিতে লাগিলেন,—"বৎস নলিনাক্ষ! ক্ষান্ত হও, পশ্চাৎ তোমার কথা শুনিতেছি। অগ্রে কিঞ্চিৎ আমার পরিচয় গ্রহণ কর। যুবক তুমি, আমার প্রকৃত পরিচয় বোধ করি—এখনও সম্যক্রূপে তোমার হৃদ্গত হয় নাই।"

নলি। মা, আপনি বলিলেন,—"কোটী ব্রহ্মাণ্ডের ভূত,

ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান ঘটনা সমস্তই আমি বলিতে পারি!"—

তা—মা, এই জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা কে?

ভগ। বৎস! এ জগৎ—আমার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে। বাছা! এ ত অতি ক্ষুদ্র জগৎ, ইহা অপেক্ষা কত কোটী কোটী গুণ বৃহৎ, অসংখ্য জগৎ আমার ইচ্ছামাত্রেই সৃষ্ট, পুষ্ট এবং বিনষ্ট হইতেছে। আমিই যাবতীয় জীবের একমাত্র গতিমুক্তিদায়িনী।

নলি। মুক্তি কিরূপ জিনিস মা?

ভগ। মুক্তি শব্দের অর্থ, নিত্যসুখপ্রাপ্তি; শরীর ও ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতে আত্মার বিশ্লেষ হইলে তাহার যে আত্মা প্রাপ্তি হয়—তাহার নাম মুক্তি। বৎস! আমার প্রধান ভক্তগণকে আমি তাহাদের অভিলাষ অনুসারে পাঁচ প্রকার—মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি।

নলি। মাগো সেই পাঁচ প্রকার মুক্তির বিবরণ একটু বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করিয়া আনন্দিত করুন।

ভগ। শুন বৎস! আমি একে একে আমার পাঁচ প্রকার মুক্তির কথা বলিতেছি। মধ্যের প্রথম প্রকারের মুক্তির নাম সাষ্টি, ইহার দ্বারা আমার ভক্তগণ আমার সহিত সমান ঐশ্বর্য্য উপভোগে সমর্থ হয়; দ্বিতীয় প্রকারের নাম সালোক্য, ইহার প্রভাবে আমার সমান লোকে অধিবাস করিয়া থাকে; তৃতীয় প্রকারের নাম স্বারূপ্য, ইহার কৃপায় আমার সদৃশ রূপ ধারণ করা যায়; চতুর্থ প্রকারের নাম সাযুজ্য, ইহার মহিমায় সর্ব্বদা আমার সমীপে বাস করিতে পারে এবং পঞ্চম প্রকারের নাম নির্ব্বাণ, ইহার কৃপায় আমার প্রিয় ভক্তবৃন্দ আমার সহিত একত্ব লাভ করিয়া থাকে।

এই সকল কথা বলিয়া ভগবতী আবার বলিতে লাগিলেন, "বৎস! আমার দর্শনলাভ বড়ই দুষ্কর। অবিচলিত ভক্তি এবং কঠোর তপস্যা ভিন্ন কেহই আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। আজ তুমি দুষ্কর সাধনবলে আমাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছ। এক্ষণে বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, আমি এখনই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতেছি।"

সাধকশ্রেষ্ঠ নলিনাক্ষ, কৃপাময়ী কালিকার এই সকল অমৃতময় বাক্য শ্রবণে পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। লৌহের অনুসন্ধানে আসিয়া যে তাঁহার অদৃষ্টে স্পর্শমণি লাভ হইবে, ইহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। যুবক আনন্দে অভিভূত হইয়া বলিতে লাগিল, "ধন্য গুরুদেব! ধন্য আপনার কৃপা!—ধন্য আপনার চাতুর্য্য, আপনার অসামান্য চাতুর্য্য প্রভাবে আজ আমি চতুর্ব্বর্গ লাভের অধিকারী হইয়া জন্ম জন্মান্তরের মত যম যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম।" তার পর নলিনাক্ষ ভগবতীকে বলিতে লাগিলেন,—"মাগো! আপনি আমাকে অভীষ্ট বর-গ্রহণের প্রার্থনা করিতে বলিতেছেন, কিন্তু মা, যখন আপনিই জীবের একমাত্র ইষ্টানিষ্ট বিধায়িনী, তখন আর আমি আপনার কাছে কি ইষ্ট প্রার্থনা করিব? আমার ইষ্টানিষ্ট সকলই আপনার হস্তে, যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহাই করিবেন। তবে মা, আপনার ঐ রাঙ্গা পদযুগলে আমার দুইটী প্রার্থনা আছে, একটী প্রার্থনা, আপনার কালিকামূর্ত্তি দর্শন এবং আর একটী প্রার্থনা, ঐ কালিকারূপে আমার আচার্য্যের বাঞ্ছা পূরণ।" ভগবতী নলিনাক্ষের—প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "বৎস! তাহাই হইবে, এক্ষণে তুমি মুহূর্ত্তের জন্য একবার

নয়ন মুদিত কর।" নলিনাক্ষ নয়ন মুদিত করিবামাত্র ভগবতী কালীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। যুবক যথাসময়ান্তে নয়ন উন্মীলন করিয়া, তাঁহার সাধনের ধন জগজ্জননী কালিকা মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার শিক্ষাগুরু আচার্য্য মহাশয়, তাঁহাকে যে রূপের কথা বলিয়াছিলেন, এ সেই রূপ। নলিনাক্ষ ভুবনমোহিনী কালরূপ দেখিলেন। আলোর অসদ্ভাবেই কালর উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু জানিনা, এ কেমন কাল, মরি মরি! কালরূপের ছটায় যে ত্রিলোক আলোকময় হইয়াছে! আহা! কোটী কোটী পূর্ণিমার শশী যেন ঐ কাল-রূপসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। কোকনদ-নিন্দিত রাতুলচরণতলে মকরন্দ লোভান্ধ মধুপবৃন্দ ভ্রান্তি-বশে আসিয়া গুঞ্জন করিতেছে। কেশরীলাঞ্ছিত উলঙ্গ কটিদেশ, সংগ্রথিত নরকরনিকরে সমাবৃত। গলদেশে আপাদমূলাবলম্বি সদ্যছিন্ন নরশিরমালা দোদুল্যমান। চতুর্ভুজা বামার বামেতর বাহুদ্বয়, যথাক্রমে রুধির রঞ্জিত তীক্ষ্ণধার উন্মুক্ত কৃপাণ এবং শোণিতস্রাব সদ্যছিন্ন নরশির ধারণ করিয়া পাপাত্মাগণের ভীতি এবং পুণ্যাত্মাগণের প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। নয়নত্রয় হইতে যুগপৎ করুণার অমৃতধারা এবং ক্রোধের বাড়বানল নিঃসৃত হইয়া যথাক্রমে যেন পুণ্যাত্মাগণের শান্তি এবং পাপাত্মাগণের ধ্বংস সাধনে উদ্যত হইয়াছে। শিরোদেশে আলুলায়িত নিবিড় কুন্তলজাল লম্বিত হইয়া ধরণীতল স্পর্শ করিতেছে। রূপ দেখিতে দেখিতে নলিনাক্ষের দুটী নয়ন দিয়া দর দর ধারে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল, পুলকে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, বাক্‌শক্তি তিরোহিত হইয়া গেল। যুবক কি করিবেন, কি

বলিবেন, কিরূপে মাকে মনের কথা শুনাইবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, কেবল চিত্রার্পিতের ন্যায় একদৃষ্টে মায়ের রূপ-রাশির পানে চাহিয়া রহিলেন।

পাঠক! সাধক যখন তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সাধনার উন্নত শিখরে আরোহণ করে, তখন তাহার বাক্‌শক্তি থাকে না, ভাষায় তাহা বক্ত্য করা যায় না! সাধক ব্যতীত মায়ের স্বরূপ কেহ জানে না, যে জানে সে বলিতে পারে না, কাজেই তিনি নিরাকার।

ভক্ত নলিনাক্ষের প্রগাঢ় ভক্তিতে আজ ভক্তাধীনা কালিকার অন্তঃকরণ করুণায় আপ্লুত। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণা সর্ব্বাণীর প্রিয়তম সন্তান, দীন হীন কাঙ্গালের ন্যায় ধূলায় লুণ্ঠিত—ইহা কি মায়ের প্রাণে সহ্য হয়? মা করুণাময়ী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, প্রাণের ভক্ত নলিনাক্ষকে সযত্নে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সোহাগভরে বারংবার তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। হতভাগ্য নলিনাক্ষ অতি শৈশবে মাতৃহীন, মাতৃস্নেহ যে কিরূপ অমূল্য জিনিস, জ্ঞান হইয়া অবধি, সে একদিনও তাহা উপভোগ করিতে পায় নাই, সে কেবল পালনকর্ত্রী মাতার স্নেহ-বর্দ্ধিত, সেই স্নেহই সে জানে। কিন্তু জগতে গর্ভধারিণীর স্নেহ সে এক দিনের জন্যও উপভোগ করে নাই; যে স্নেহসিন্ধুর বিন্দু পরিমিত বারি পুত্রকে আশাতীত ফল দানে সমর্থ, সে আজ তাহা অপেক্ষাও কোটীগুণ গভীর অগাধ অনন্ত মাতৃ-স্নেহ সিন্ধু-সলিলে নিমজ্জিত। যুবক জগন্মাতার অঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া এবং তাঁহার অপরিসীম সোহাগ প্রাপ্ত হইয়া তখন আব্দেরে ছেলের মত বলিতে লাগিল,—"হাঁ মা!

তোর যদি এত করুণা, এত দয়া—তবে আমাকে এতদিন এত কষ্ট দিলি কেন মা ?"

ভগ। বাছা! লৌহ চুম্বক হইতে দূরে থাকিলেও তাহার প্রতি যেমন চুম্বকের আকর্ষিণী শক্তি যায় না, লৌহ কোন প্রকারে তাহার সন্নিহিত হইলে, সে যেমন আপনা আপনি উহাকে ধারণ করে, সেইরূপ আমার ভক্তগণ, আমার নিকট হইতে দূরে থাকিলেও আমার স্নেহদৃষ্টি সর্ব্বদা তাহাদের উপর নিপতিত থাকে, সাধন বলে উহারা আমার সমীপবর্ত্তী হইলেই আমিও তাহাদিগকে আপন কোলে টানিয়া লই। বাছা! তোমার প্রতি আমার বরাবরই স্নেহদৃষ্টি ছিল, তবে এতদিন তুমি সিদ্ধিমার্গের অনেক দূরে ছিলে বলিয়া, আমার সেই স্নেহ অনুভব করিতে পার নাই। এক্ষণে তুমি সাধন বলে আমার সন্নিহিত হওয়ায়, আমিও তোমাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছি।

নলি। হাঁ মা! সত্যই কি এতদিন আমার প্রতি তোর স্নেহদৃষ্টি ছিল ?

ভগ। ছিল বই কি, বৎস! অবশ্যই ছিল।

নলি। কই মা, তোর সে স্নেহের পরিচয় ?

ভগ। বাছা! যে আচার্য্য তোমার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু, সেই বামদেব আমার প্রিয় পুত্র—তবে সে কেবল জ্ঞানমার্গে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, এতদিন আমার জন্য কাঁদে নাই ; তাই তাহার জন্য আমার মন চঞ্চল হয় নাই, এইবার কাঁদিতেছে—তাই দেখা পাইবে। আচার্য্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া যখন তুমি নিরাশ্রয় অবস্থায় পথে পথে ভ্রমণ করিয়া

ছিলে, তখন আমিই দিবানিশি ছায়ার ন্যায় তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, তোমাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম। আমার প্রিয়ধাম বারাণসীক্ষেত্রে দশাশ্বমেধ ঘাটে যখন তুমি জাহ্নবী জলে জীবন বিসর্জ্জনে উদ্যত হইয়াছিলে, তখন আমার এক প্রিয় পুত্রকে তথায় পাঠাইয়া, আমিই তোমাকে সে বিপদে রক্ষা করাইয়াছিলাম। তোমার অবিচলিত ভক্তি দর্শনে, আমার সেই প্রিয় পুত্র দ্বারা আমিই তোমাকে আমার বীজমন্ত্রের স্বরূপ তত্ত্ব প্রদান করাইয়াছি। বামদেব আর কিছুই চায় না, সে কোথাও আর যাইতে চাহে না; জগতের কিছুতেই দৃক্‌পাত করিতে চায় না, কেবল নির্জ্জন গিরি-গুহায় কাঁদিতেছে। তজ্জন্য যোগানন্দ দ্বারা সেই কার্য্য সমাধা হইয়াছে। সেই মহামন্ত্রের প্রভাবে বৎস! আজ তুমি আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিয়াছ। যখন বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া, নির্জ্জন নির্জ্জল দুস্তর প্রান্তরে পতিত হইয়া পিপাসায় ছট্‌ফট্‌ করিয়াছিলে, তখন আমিই জলাশয় রূপ ধারণ করিয়া জলদানে তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছি। তারপর হিংস্র জন্তু পূর্ণ ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিলে, আমিই প্রতিক্ষণ তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রহরীর ন্যায় থাকিয়া—ঐ সকল বন্য পশুর কবল হইতে তোমার প্রাণ বাঁচাইয়াছি। আমিই তোমাকে কৌশল পূর্ব্বক কাননের বাহিরে আনিয়াছি। আমিই তোমাকে অমিত বল প্রদানে পর্ব্বত শৃঙ্গে উঠাইয়াছি, শেষে আবার আমিই তোমাকে পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে পতন কালে রক্ষা করিয়াছি। বাছা! ভক্ত আমার বড়ই স্নেহের পাত্র, ভক্তকে আমি প্রাণ দিয়াও

রক্ষা করি, ভক্তের কষ্টে আমার কষ্ট হয়, ভক্ত আঘাত পেলে সেই আঘাতে আমিও আহত হই।

নলি। মাগো! অবোধ সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমি না বুঝ্‌তে পেরে—মা! তোমাকে মূর্খের ন্যায় প্রশ্ন ক'রেছি। বুঝ্‌লাম মা! তুমিই জীবের একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী, তুমি রক্ষা না ক'র্‌লে জীবগণের জীবন রক্ষার আর কোনই উপায় নাই।

ভগ। হাঁ বাছা! তুমি ঠিক অনুমান ক'রেছ। আমিই নানা উপায়ে আমার সন্তানদের রক্ষা ক'র্‌ছি! বায়ু, জল, অগ্নি, সূর্য্য, নানাবিধ ফল, মূল, ঔষধি—সকলই আমি আমার সন্তানদের মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।

নলি। হাঁ মা! তোমার গায়ে এসব কিসের দাগ? যেন সব ক্ষত চিহ্ন ব'লে বোধ হ'চ্ছে?

ভগ। বাছা! তোমার দেহেও কতকগুলি ক্ষতচিহ্ন দেখা যা'চ্চে না?

নলি। হাঁ মা! আমার গায়েও অনেকগুলি ক্ষতচিহ্ন আছে। কাশীধামে ভ্রমণ কালে, সেখানকার কতকগুলি বালক, আমাকে পাগল ব'লে অত্যন্ত প্রহার ক'রেছিল। তাহাদের প্রহারে আমার গাত্রচর্ম্ম স্থানে স্থানে ছিন্ন হ'য়ে অনেক রক্তপাত হইয়াছিল—এ সকল সেই প্রহার চিহ্ন।

ভগ। বাপ নলিনাক্ষ! আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই ব'লেছি, আমার ভক্তগণ কোন প্রকারে আঘাত পেলে আমিও সেই আঘাতে আহত হই। এই দেখ বাপ! কাশীধামে

বালকদের দ্বারা তুমি যে যে স্থানে আঘাত পেয়েছ, আমি ঠিক সেই সেই স্থানে আঘাত পেয়েছি। আমারও এই সকল ক্ষত দিয়া সেই সময় কত রক্তপাত হইয়াছিল। উঃ সেই প্রহার যাতনা মনে হলে, এখন যেন শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠে। আহা! বাছা আমার—মরি মরি না জানি, সে দিন তুমি কত কষ্টই পেয়েছিলে।

ভগবতী কালিকা এবং ভক্ত নলিনাক্ষ যখন উল্লিখিতরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই পর্ব্বত কন্দর ও কানন-স্থলী প্রতিধ্বনিত করিয়া সহসা একটী মনোহর সংগীতধ্বনি তাঁহাদের কর্ণ-কূহরে প্রবিষ্ট হইল। তাঁহারা সেই মধুর স্বর শ্রবণে কথোপকথনে বিরত হইয়া সংগীতের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। গায়ক গাহিতেছিলেন,—

"মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়ে ভক্তি দড়া॥"

সংগীতের কিয়দংশ শ্রবণ করিয়া নলিনাক্ষ চমকিয়া উঠিল, সংগীত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার এক অতীত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। এ স্বর যে তাহার পরিচিত। এ যে কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সমাগত সেই মহাপুরুষের কণ্ঠস্বর! এ যে আমার সেই ভক্তি-মার্গের পথপ্রদর্শক, সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদের মধুর সংগীত! স্বপ্নে যাঁহার কৃপাবলে জগজ্জননীর দর্শন পাইয়াছিলাম, এ যে সেই দয়াময় মহাপুরুষের সুললিত ধ্বনি! যাঁহার কৃপায় আমি আজ জগদম্বার কোলে স্থানলাভ করিয়াছি, এ যে সেই পরম কারুণিক গুরুদেবের হৃদয়োচ্ছ্বাস! এ স্বর কি ভুলিবার?

নলিনাক্ষ গুরুদেবকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, ভগবতী তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"বৎস! স্থির হও, এখনই তুমি উহাঁর দর্শন পাইবে। উনি এই দিকেই আসিতেছেন। বৎস! উনি আমার একজন পরম ভক্ত, উহাঁকে আমি একদিনও কাছ ছাড়া ক'রে থাক্‌তে পারি না। তোমাকে দীক্ষিত করিবার জন্য, আমি উহাঁকেই আদেশ করিয়াছিলাম!"

নলিনাক্ষ। হাঁ মা! উহাঁরই নিকটে আমি দীক্ষিত হয়েছিলাম। উহাঁরই কৃপায় আজ আমি আপনাকে লাভ ক'রেছি। দয়াময়ি! ঐ মহাপুরুষ কে, কৃপা করিয়া প্রকাশ করুন। শুনিয়াছি উহাঁর নাম রামপ্রসাদ।

ভগ। হাঁ বাছা! উহাঁর নাম কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। জাতিতে বৈদ্য। হালিসহর পরগণার অন্তর্গত কুমারহট্ট নামক গ্রামে উহাঁর জন্ম হয়। আমার ঐ ভক্তটি প্রধানতঃ সংগীতেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। উহাঁর মধুময় সংগীত শুনিবার জন্য আমি কতবার উহাঁর বাটীতে গিয়াছি। দেখা না হইলে রামপ্রসাদ নিজেই আসিয়া কাশীতে আমাকে সংগীত শুনাইয়া যাইত। উহাঁর ভক্তি গুণে আবদ্ধ হয়ে এক সময়ে আমাকে উহাঁর কন্যার রূপ ধারণ ক'রে, উহাঁর ঘরের বেড়া পর্য্যন্ত বাঁধিতে হইয়াছিল। ঐ শুন, আমার প্রসাদ ভক্ত সেই সময়ের সংগীতটিই গাহিতে গাহিতে এই দিকে আসিতেছে। উহার ভাবে মৃত্যু হইয়াছে, তাই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আসিতে পারিয়াছে। সন্ন্যাসী গাহিতেছিলেন—

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়ে ভক্তি দড়া॥
নয়ন থাকতে না দেখ্‌লে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া॥
মা ভক্তে ছলিয়া তনয়ারূপে, বেঁধে গেলেন ঘরের বেড়া॥
মায়ে যত ভালবাসে, দেখা যাবে মৃত্যু শেষে।
ম'লে দুচার দণ্ড কান্নাকাটি, শেষে দেবে গোবর ছড়া॥
ভাই বন্ধু সুত দারা, কেবলমাত্র মায়ার গোড়া।
ম'লে সঙ্গে দেবে মেটে কলসী, কড়ি দেবে অষ্ট কড়া!
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলি করিবে হরণ।
দোসর বস্ত্র গায়ে দেবে, চারকোণা মাঝখানে ছেঁড়া॥
যেই ধ্যানে একমনে, সেই পাবে মা তোমায় তারা।
তখন একবার এসে কন্যারূপে রামপ্রসাদের বেঁধো বেড়া॥

রামপ্রসাদ নিকটবর্ত্তী হইলে, নলিনাক্ষ ধীরে ধীরে ভগবতীর ক্রোড় হইতে অবতরণ করিয়া অশ্রুপ্লুত-নেত্রে হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহার পাদমূলে প্রণত হইল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিগদগদস্বরে বলিতে লাগিল,—"গুরুদেব! আপনার অপার করুণায়, আজ আমি করুণাময়ী কালিকার কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছি। কি বলিয়া আজ আপনার কাছে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব জানি না।"

রা। বৎস! ভক্তোত্তম নলিনাক্ষ, তোমার ন্যায় শিষ্য-রত্ন লাভ ক'রে আজ আমিও ধন্য হ'লাম। ধন্য বৎস! ধন্য তোমার সাধন, ধন্য তোমার ভক্তি-বল। কোটী কোটী জন্ম কঠোর তপস্যা ক'রে সাধকগণ যে চরণ লাভ ক'র্‌তে পারেন না, তুমি ক্রমান্বয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রমদ্বয়ে পরিভ্রমণ করিয়া একমাত্র

অকপট ভক্তিবলে, অনায়াসে সেই দুর্লভরত্ন লাভ ক'র্‌লে। আজ হ'তে তুমি জগতে এক আদর্শ-পথ আবিষ্কার ক'র্‌লে। আশ্রম ধর্ম্মের ভিতর দিয়া তুমি যেরূপ দেখাইলে, তোমার পর আর কেহই এই কলিযুগে ঐ সরল পথ অবলম্বন করিতে পারিবে না। তোমা হইতেই ইহার উচ্ছেদ হইল, যবন রাজত্বের পর আর কেহ এ পথ অবলম্বন করিবে না। বৎস! আমি তোমার নিকট আর কি কৃতজ্ঞতা লাভ ক'র্‌ব, যদি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একান্ত অভিলাষ হ'য়ে থাকে, তবে ঐ কালভয়হারিণী কালিকার কাছে এই প্রার্থনা কর, যেন আমার মন-মধুপ ঐ চরণারবৃন্দের মধুপানে নিয়ত নিরত থাকে।

নলিনাক্ষকে কৃতার্থ করিয়া ভগবতী পুনরায় বলিলেন,—"বৎস! এক্ষণে তোমার আর কিছু প্রার্থিত থাকিলে—প্রকাশ কর, তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই।"

নলি। মাগো! আর আমার কিছুই প্রার্থনা নাই, কেবল এইমাত্র প্রার্থনা, যেন আমার চঞ্চল চিত্ত ভ্রান্তিবশে মুহূর্ত্তমাত্রও তোমার পাদ-পদ্ম চিন্তনে বিরত না হয়। আর একটি প্রার্থনা, আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া, এরূপে একবার আমার আচার্য্যকে দর্শন দিতে হ'বে।

ভগ। বৎস! তোমার আচার্য্যকে দর্শন দিতে আমি ইতোপূর্ব্বেই সম্মত হ'য়েছি। এক্ষণে তুমি অগ্রসর হও, আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি।

নলি। না মা! আর আমি অগ্রসর হ'ব না, কত কষ্টে যখন একবার দেখা পেয়েছি, তখন আর তোমাকে চক্ষের অন্তরাল ক'র্‌ব না। তুমি অগ্রে অগ্রে চল, আমি তোমার ঐ

রাতুল চরণ দুটী দেখ্‌তে দেখ্‌তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করি। মা গো! আমাকে অগ্রসর হ'তে ব'লে, ছলনা ক'রে আর ছেড়ে যেও না।

ভগ। বৎস! আমি তোমাকে এমন কথা বলি নাই যে, তুমি আমাকে ছেড়ে যাও। বাছা! ভক্ত আমার প্রাণ, ভক্ত আমার ধ্যান, ভক্ত আমার জ্ঞান, ভক্তকে আমি তিলেক ছেড়ে থাক্‌তে পারি না। যে স্থানে ভক্ত থাকে, আমিও সেইস্থানে অধিষ্ঠিত থাকি। প্রাণাধিক নলিনাক্ষ! তুমি কিছুমাত্র চিন্তা ক'র না। আমি সর্ব্বদাই তোমার হৃদয়ে থাক্‌বো। তোমার যখন ইচ্ছা হ'বে, নয়ন মুদিত ক'রে ধ্যান করিলেই আমাকে হৃদয়ে দেখ্‌তে পাবে। আর যখন বহির্নেত্রে দেখ্‌বার বাসনা হবে, আহ্বান মাত্রেই আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হ'ব। এক্ষণে তুমি নির্ভয়চিত্তে আচার্য্য-ভবনে গমন কর।

এই সকল কথা বলিয়া ভগবতী ভক্তপ্রধান রামপ্রসাদ সহ তথা হইতে অদৃশ্য হইলেন। ভগবতী অদৃশ্য হইবামাত্র নলি-নাক্ষের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, মায়ের অদর্শন তাঁহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল। মা বলিয়াছেন, "যখন তোমার আমাকে দেখ্‌বার অভিলাষ হ'বে, হৃদয়ে ধ্যান ক'র, তখনই পাবে।" নলিনাক্ষ ব্যাকুল-চিত্তে অমনি ধ্যানস্থ হইল, ধ্যান করিবামাত্রই সে মাকে হৃদয়ে দেখিতে পাইল; তারপর আবার বহির্নেত্রে দেখিবার অভিলাষী হইয়া মাকে আহ্বান করিল, ভক্তের আহ্বান মাত্রই মা তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। নলিনাক্ষের অত্যন্ত চঞ্চলচিত্ত দেখিয়া জগন্ময়ী

বলিলেন,—"বৎস! আমার কথায় কি তোমার অবিশ্বাস হ'য়েছে?"

নলি। অবিশ্বাস হ'বে কেন মা? কিয়ৎক্ষণ তোমার দর্শন না পাওয়ায় আমার মন যারপর নাই অস্থির হইয়াছিল, তাই না, এত শীঘ্র আবার তোমাকে ডেকেছি।

দেবী স্নেহপূর্ণ বচনে নলিনাক্ষকে সান্ত্বনা করিয়া পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন। নলিনাক্ষ তিনটী আশ্রমে ক্রমশঃ সিদ্ধিলাভ করিয়া অতঃপর সানন্দমনে আচার্য্য-ভবন গমনে মনোনিবেশ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—০:)*(:০—

আনন্দ কানন।

এই মাত্র নলিনাক্ষ আচার্য্য-গৃহে উপনীত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ বহুদিনের পর তাঁহার প্রিয় ছাত্রকে প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আচার্য্য ঠাকুরের মনে আজ আর যেন আনন্দ ধরিতেছে না। পাঠক মহাশয়! বলিতে পারেন কি, কেন আজ উঁহার এত হর্ষ— কই এখনও ত উনি কন্যার কোন কুশল সংবাদ পান নাই, তবে এত হর্ষ কিসের? আছে— অবশ্যই উঁহার হর্ষের কারণ আছে। এক্ষণে দুইটি কারণে তিনি এত আনন্দিত। প্রথম কারণ এই যে, নলিনাক্ষকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করিয়া থাকেন, তাহাকে তিনি যে কঠোর ব্রতে ব্রতী করিয়াছিলেন, তাহা একপ্রকার অসাধ্য-সাধন, নলিনাক্ষ যে সেই অগ্নিপরীক্ষায় অক্ষত শরীরে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে, ইহার পর আর সুখের বিষয় কি হইতে পারে? দ্বিতীয় কারণ তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির আশা; প্রকৃত প্রস্তাবে এইটিই তাঁহার প্রফুল্লতার প্রকৃষ্ট কারণ। নলিনাক্ষের স্থির প্রতিজ্ঞায় তাঁহার বরাবর দৃঢ় বিশ্বাস আছে। বিদায়কালে নলিনাক্ষ বলিয়া-গিয়াছিল,—"যদি কখনও আপনার কন্যার দর্শন পাই তবেই আবার ফিরিব, নচেৎ এই-ই শেষ বিদায়"—অতএব সে যখন প্রত্যাগত হইয়াছে, তখন অবশ্যই শুভফলের আশা করা যায়।

যাহা হউক, অতঃপর ব্রাহ্মণ নলিনাক্ষের কুশল বার্ত্তা শ্রবণ

করিয়া পরিশেষে আপনার ইষ্টদেবতার সংবাদ শ্রবণে একান্ত অধীর হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! আমার কন্যার কোন অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছ কি? যদি তাহার দর্শন পাইয়া থাক, ত্বরায় সে সংবাদ প্রকাশ করিয়া তাপিত প্রাণ সুশীতল কর।"

নলি। হাঁ গুরুদেব! আপনার শ্রীচরণ প্রসাদে এ দাস তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছে। তিনি আমার সঙ্গেই আসিয়াছেন।

ব্রাহ্ম। কই বৎস! কোথায় আমার কন্যা? সত্যই কি সে তোমার সঙ্গে আসিয়াছে?

নলি। হাঁ গুরুদেব! সত্যই তিনি আমার সঙ্গে আসিয়াছেন। তাঁহাকে ডাকিলেই এখনই তিনি এখানে আগমন করিবেন।

ব্রাহ্মণ নলিনাক্ষের কথায় আশ্বাসিত হইয়া ইষ্টদেবতার দর্শনের নিমিত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব সহিল না, ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন, "বৎস! আমার বহুদিনের হারানিধি আজ নিকটে আসিয়াছে, শুনিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইয়াছে, এখনই তুমি তাহাকে আহ্বান কর।"

ব্যাধিতই ব্যাধির যন্ত্রণা অনুভবে সক্ষম, বিরহীই বিয়োগ যন্ত্রণার মর্ম্ম বুঝে, অন্ধই অদর্শনক্লেশ উপলব্ধি করিতে সমর্থ। নলিনাক্ষ ভুক্তভোগী, গুরুর অবস্থা সহজেই তাহার উপলব্ধি হইল, গুরুর অবস্থা দেখিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, অতঃপর সে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করা অনুচিত বোধে, তখনই করুণাময়ী

মাকে মনে মনে মনের কথা জ্ঞাপন করিয়া আহ্বান করিল। ভক্তের প্রার্থনা তখনই ভগবতীর কর্ণে পৌঁছিল। প্রিয়ভক্ত নলিনাক্ষের মনের অভিলাষ বুঝিতে পারিয়া, ব্রাহ্মণকে কৃতার্থ করিবার জন্য কৃতার্থময়ী অম্বি কালীরূপে আবির্ভূতা হইলেন। আনন্দময়ীর সন্দর্শনে, আনন্দ বিহ্বল নলিনাক্ষ তখন আনন্দ গদ্গদ কণ্ঠে আচার্য্যকে বলিলেন,—"গুরুদেব! ঐ দেখুন, ঐ দেখুন, আপনার নিরুদ্দিষ্টা কন্যা, আপনার সম্মুখে আগমন করিয়াছেন!"

ব্রাহ্মণ বেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখস্থিত ক্ষুদ্রতম তৃণ খণ্ডটি পর্য্যন্ত তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইতেছে। কিন্তু কই তাঁর বাঞ্ছিত ধন? নলিনাক্ষ কি বলিতেছে? আহা! বালক কি পাগল হইয়াছে? আহা! নলিনাক্ষ কি এতদিনের পর পাগল হইয়া ফিরিয়া আসিল? তাই বটে, নিশ্চয়ই উন্মাদ হইয়া আমার সহিত প্রলাপোক্তি করিতেছে। আমি উহার স্বভাব বেশ জানি, প্রকৃতিস্থ থাকিলে কখনই আমাকে প্রতারিত করিত না! প্রকৃতিস্থ থাকিলে কখনই মিথ্যা কথা বলিত না। কিন্তু উহাকে দেখিয়া ত পাগল বলিয়া বোধ হয় না? তবে কি আমারই চক্ষের দোষ হইল? বয়স অধিক হইলে চক্ষের দোষ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে, আমারও ত অনেক বয়স হইয়াছে। কিন্তু চক্ষের দোষ কেমন করিয়া বলিব? এইত আমি একটি ক্ষুদ্রতম কীট পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতেছি, এইত আমি নলির আপাদ মস্তক দিব্য দেখিতে পাইতেছি? তবে এ কি হইল?" এরূপ আন্দোলন করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন—"কই বৎস? কোথায় আমার কন্যা? কই, আমিত

তাঁহাকে দেখিতেছি না? তুমি কি আমার সহিত প্রতারণা করিতেছ?"

নলি। একি কথা গুরুদেব! প্রতারণা? আপনার সহিত আমি প্রতারণা করিতেছি? দাসের প্রতি এ কঠোর উক্তি কেন করিতেছেন—গুরো! ঐ যে আপনার কন্যা, ঐ যে আপনার নিরুদ্দিষ্টা নন্দিনী আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মানা! প্রতারণা করিব কেন? দাস আমি,—পুত্র আমি,—শিষ্য আমি, প্রভুর সহিত,—পিতার সহিত,—গুরুর সহিত, প্রতারণা কি সম্ভব?

ব্রাহ্ম। কই বৎস! কই? আমার কন্যা? হাঁ রে প্রাণাধিক ছাত্র, হাঁ বাপ, তুই কি আমার কন্যাকে দেখ্‌তে পাচ্ছিস্? বাপ্‌রে! সত্য ক'রে বল্‌, সত্যই কি আমার সেই কালমেয়ের কমনীয় কান্তি তোর নয়নে প্রতিভাত হ'চ্ছে?

নলিনাক্ষ ব্রাহ্মণের এই আশ্চর্য্য উক্তি শ্রবণ করিয়া যার-পর-নাই বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, একি? দেখিতেছি, আচার্য্য মহাশয়ের দর্শন শক্তির ত কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, সকল জিনিসই ত বেশ দেখিতে পাইতেছেন? কেন তবে এরূপ হইতেছে? কি কারণে গুরুদেব জগন্মাতার দর্শন পাইতেছেন না? আচার্য্য আমাকে প্রাণ তুল্য ভালবাসেন, পুত্রাধিক স্নেহ করেন, আমার কথায় চিরদিনই উঁহার অটল বিশ্বাস, মায়ের দর্শন না পাইয়া, আজ আমার প্রতিও উনি স্থির-বিশ্বাসী হইতে পারেন নাই, মনের আবেগে আজ আমাকে প্রতারক পর্য্যন্ত বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন না, মাকে দেখিতে পাইলে, এরূপ কঠোর কথা কখনও বলিতেন না। মা আমার

গুরুদেবকে কৃতার্থ করিতে ত ইতোপূর্ব্বে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন? তবে এরূপ হইতেছে কেন? কি কারণে গুরুদেব করুণাময়ীর কৃপালাভে বঞ্চিত হইতেছেন? নলিনাক্ষ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল,—"হে মোহান্ধ ব্রাহ্মণ! নলিনাক্ষ প্রতারক নহে, তুমিই প্রতারক, তুমিই প্রতারণা পূর্ব্বক আপন ইষ্টসিদ্ধির অভিপ্রায়ে ঐ সরলমতি যুবককে কল্পিত কন্যার অনুসন্ধানের জন্য অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছিলে। প্রতারণা না করিয়া প্রকৃত কথা বলাই কর্ত্তব্য ছিল। ছাত্রের সহিত কপটতা করা শিক্ষা-গুরুর একান্ত গর্হিত কার্য্য। হে ব্রাহ্মণ! সাধনার চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে এখনও তোমার বহু বিলম্ব, এখনও তোমার বহু জন্মকৃত কঠোর সাধনার প্রয়োজন। যাহা হউক, তোমার পরম সৌভাগ্য যে নলিনাক্ষের ন্যায় ছাত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলে। একমাত্র উঁহারই সাধন বলে, আজ তুমি মোক্ষ-মার্গের অধিকারী হইতে চলিলে। আমি নলিনাক্ষের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, তাহার প্রার্থনা অনুসারে তোমাকে দর্শন-দানে অঙ্গীকৃত আছি। কিন্তু হে ব্রাহ্মণ! আমাকে দর্শন করিতে হইলে দিব্যদৃষ্টির আবশ্যক, দিব্যদৃষ্টির অধিকারী হইতে হইলে, শুদ্ধচিত্ত ও পূতাত্ম হইতে হয়। এখনও তোমার চিত্ত নানাকারণে অপবিত্র ও পাপ সংস্পৃষ্ট রহিয়াছে, অতএব তুমি সর্ব্বাগ্রে আমার পরম ভক্ত নলিনাক্ষের অঙ্গ স্পর্শে নিষ্কলুষ হও, তাহা হইলেই দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া আমার দর্শন পাইবে।"

দৈববাণী শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র নলিনাক্ষকে বক্ষে ধারণ করিলেন। স্পর্শমণির স্পর্শে ব্রাহ্মণের লৌহ-দেহ কাঞ্চনে পরিণত হইল, ব্রাহ্মণ কৃতার্থ হইলেন।

এমন সময়ে যোগানন্দ গুরুদেবসহ তাঁহার কন্যাকে আশ্রমে লইয়া আসিলেন। এই আনন্দ-কাননে আজ আনন্দ-সম্মিলন। আজ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নীলাচলে এই শুভ ঘটনা ঘটিয়াছিল। জননীর কয়েকজন প্রিয়-শিষ্য এই সম্মিলনের নেতা। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারক হইলেও তিনি এই নীলাচলে শক্তি সম্মিলন দেখিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেন। সিদ্ধ মহাপুরুষ না হইলে এই আনন্দ-কাননে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা প্রকৃতির লীলা-নিকেতন, অতি নিভৃত স্থান, ভণ্ড সাধক ইহার সন্ধান জানে না, তথায় যাইতেও পারে না। এই আনন্দ-কাননে শ্রীধরের সেই চামুণ্ডা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। নলিনাক্ষ আজ কাল পাগলের ন্যায় হইয়াছেন। তাঁহার আর কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি নাই, নিবৃত্তিও তিনি চাহেন না। মা যাহা করাইবেন—তিনি তাহাই করিবেন। এ জগতে তাঁহার আর নিজস্ব কি আছে! মা ছাড়া এ জগতে জীবের নিজস্ব ক্ষমতা কিছু নাই; যাহাঁ কিছু হয় মায়ের ইচ্ছাতেই হয়; মানুষ কেবল ভ্রমান্ধ হইয়া আমি করিতেছি—এইরূপ অহঙ্কার করে। হায়! তাহাদের এ ভ্রান্তি কবে নাশ হইবে! পরে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মাতৃচরণে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণিপাত করতঃ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া কহিলেন –

আহামরি কিবা রূপ অপরূপ চমৎকার।
নীরদবরণী শ্যামা নাশে নিবিড় অন্ধকার॥
শোভে পদ বিল্বদলে, নর-মুণ্ডমালা গলে,
পতিত চরণতলে কেও হেরি শবাকার।

ভৈরবী ভৈরবী সঙ্গে, নাচিছে শ্যামা ভ্রূভঙ্গে,
নাশিতে অসুরে রঙ্গে ঘন করে হুহুঙ্কার।
পুত্র তব ভাবে মনে, এস মাতঃ হৃদাসনে,
ভকতি-প্রসূন তুলে পূজি চরণ তোমার ॥

শ্রোতাগণ সকলেই মুগ্ধ হইলেন। গান শেষ হইল তথাপি নলিনাক্ষের চৈতন্য নাই! তিনি তন্ময় হইয়া ভাব-সাগরে ভাসিতেছেন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্যোদয় হইলে সকলেই তাঁহার সাধনবল দেখিয়া স্তম্ভিত ও মোহিত হইয়া গেলেন। তারামায়ের প্রিয়-পুত্র নলিনাক্ষকে বিমলানন্দ ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া নৃত্য গীত করিতে লাগিলেন। আজ এই ভক্তসম্মিলনে ভক্তগণের সে প্রাণভেদী কালী-কীর্ত্তন, সেই নির্জ্জন পরিগুহা ভেদ করিয়া যেন স্বর্গ স্পর্শ করিতে লাগিল। এই সময় ভগবতী চামুণ্ডা মূর্ত্তির মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। সাধকগণ সকলেই দেবীচরণে প্রণাম করিলেন। গুরু বিমলানন্দ একবার বামদেবের নিরুদ্দিষ্টা কন্যাকে লইয়া বলিলেন—"বৎস! যে কন্যার জন্য তুমি গৃহত্যাগী হইয়াছিলে, যাহার জন্য তুমি অশেষ শাস্ত্রপাঠী হইয়া জ্ঞানের বিমল বিভায় বিভাসিত হইয়াও ইষ্টমন্ত্রে আস্থা স্থাপন করিতে পার নাই। যাহার জন্য তুমি ভগবতীর নিকট এত লাঞ্ছনা ভোগ করিলে— এই লও তোমার সেই প্রাণের কন্যা।" বামদেব আজ যে কিরূপ আনন্দে উন্মত্ত, তাহা লেখনীদ্বারা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আজ তাঁহার গুরুদেবও আনন্দ-কাননে সমুপস্থিত; একাধারে এত সৌভাগ্য আর কাহার ভাগ্যে ঘটে! বামদেবের এ সৌভাগ্যোদয়ের মূল কারণ আর কেহই নহে, তাঁহারই প্রিয়শিষ্য

নলিনাক্ষ! মুক্তযোগী বিমলানন্দ নলিনাক্ষকে আলিঙ্গন দানে ধন্য হইলেন; নলিনাক্ষ গুরুর গুরু বিমলানন্দ যোগীকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার পদবন্দনা করিলেন এবং গুরুকন্যা দিগম্বরীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন।

নলিনাক্ষের এ সৌভাগ্য আর কাহারও জন্য সংঘটিত হয় নাই, কেবল গুরুর অপহৃতা কন্যা দিগম্বরীর জন্য। তিনি নিরুদ্দিষ্টা না হইলে; গুরুদেব হতাশ হইয়া প্রকারান্তরে তাঁহার অন্বেষণে না পাঠাইলে কি আজ ত্রিলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয় আয়াসে নলিনাক্ষকে পদাশ্রয়ে আশ্রয় দান করিতেন। নলিনাক্ষ কয়েক দিন এই সাধুসম্মিলনে মহামায়ার পূজায় মহা আনন্দে কাটাইলেন। বিমলানন্দ জ্ঞানগর্ব্বী বামদেবকে বলিলেন – "বৎস বামদেব! কন্যাটীকে পরিণীত করিবার জন্য চেষ্টা কর, উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিয়া তোমার পত্নীর অনুরোধ রক্ষা কর। আর যোগানন্দ তুমি বামদেবের সহিত অবস্থান কর, তোমাদের পরম গতি লাভ হইবে। আর বৎস নলিনাক্ষ! তোমাকে আর কি বলিব – তুমি মায়ের সুসন্তান, ত্রিতাপনাশিনী জগজ্জননীর প্রিয় পুত্র, তোমার গৃহ ও অরণ্য উভয়ই সমান। যাহার প্রতি মায়ের এতাদৃশ কৃপা; যাহার জন্য ত্রিলোকতারিণী আপন অঙ্গে প্রহার যন্ত্রণা সহ্য করেন, পর্ব্বত-গহনে যাহার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে পরিভ্রমণ করেন, তাহার অরণ্যে ও সংসারে প্রভেদ নাই; তুমি যেখানেই অবস্থান কর না কেন; সকল স্থানেই স্বর্গ সুখানুভব করিবে; কারণ তোমার ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ আশ্রমে সম্যক্ সিদ্ধি লাভ ত হইয়াছে, এক্ষণে বাণপ্রস্থাশ্রমে তুমি সিদ্ধিলাভ করিয়া ধন্য হইলে, ইহার যাবতীয় নিয়ম তুমি

বিধিপূর্ব্বক প্রতিপালন করিয়াছ। তুমি সমস্ত দিবস অনাহার কিম্বা ফলমূলাহারী হইয়া অনিদ্রায় কাটাইতে পার; সারাদিন একপদে দণ্ডায়মান থাকিতেও তোমার কিছুমাত্র কষ্টবোধ হয় না। তুমি ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়াও দিন কাটাইতে পার, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও তুমি যেরূপ সুখানুভব কর, তৃণশয্যায়ও তোমার তদ্রূপ সুখাবেশ হইয়া থাকে। চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় আহারে তুমি যেরূপ পরিতৃপ্তি ও সুখানুভব কর, অনাহারেও তদ্রূপ তোমার কোন প্রকার মলিনতা ও স্ফূর্ত্তিহীনতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ধন্য তুমি বৎস! এই কলিযুগে তোমার ন্যায় প্রচ্ছন্ন-সাধক আর প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না; তুমি নিজেকে গুপ্তভাবে রাখিয়া যেরূপ ঐকান্তিক সাধনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলে, অধুনা এরূপ কেহ পারিবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। জ্ঞানে যাহা হয় না, কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনায় মানুষ যাহা করিতে পারে না—তুমি ভক্তি-প্রাবল্যে ঐকান্তিক অনুরাগ ভরে যাহা করিলে, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। প্রসন্নময়ীকে প্রসন্না করিয়া তাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে হইলে যে ভক্তিই একমাত্র সারবস্তু, ভক্তির তুল্য যে আর কিছুই নাই; জগতের ভক্তিহীন পাষণ্ডগণকে শিক্ষা দিবার জন্য মা ভগবতী তোমার দ্বারা তাহা প্রচার করিয়া লইলেন। মহাত্মা রামপ্রসাদের পর বলিতে তোমার মত ভক্ত—আর কেহই নাই। যাও বৎস! এইবার সংসারে গমন করিয়া স্ত্রীপুত্রাদির সহিত স্বর্গের সুখ অনুভব কর। তোমার পতিব্রতা স্ত্রী নিরুপমাও এই সুদীর্ঘকাল তপস্যায় রত আছে; জীবনে কেবল তোমার ধ্যান, তোমার চিন্তা লইয়াই সে কাল কাটাইতেছে। সে দেব দ্বিজের আরাধনা

করে না; যার ব্রত তাহার করণীয় মধ্যে গণ্য হয় না, সে কেবল তদ্গত প্রাণ হইয়া অহরহঃ তোমারই ধ্যানে তন্ময় হইয়া রহিয়াছে। বৎস! এইবার সেই শক্তি-স্বরূপিণী প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া মর্ত্তে প্রকৃত আনন্দের বিজয়ভেরী নিনাদিত কর। পুত্রটী উপনয়নের উপযুক্ত হইয়াছে, সংসারীর নিয়মানুসারে তাহাকে উপনীত কর; তাহাকে শিক্ষা প্রদান কর— এই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে যে কয় দিন সংসারে থাক, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া অন্তে পরমগতি লাভ কর। নীলাচলে এই আনন্দ-কানন অতি নিভৃত স্থান, সংসারী ইহার সন্ধান প্রাপ্ত হয় না, যত প্রকট কৌল এইস্থানে সম্মিলিত হইয়া চামুণ্ডার অর্চ্চনা করিয়া ধন্য হয়। মা এখানে সাক্ষাৎ চামুণ্ডা মূর্ত্তিতে সাধকের সিদ্ধি প্রদানে মুক্ত-হস্ত। যাবতীয় কুলাচারী সিদ্ধপুরুষদিগের ইহাই লীলা নিকেতন, ইহা অতিশয় গুপ্তস্থান; সংসারে ইহার কথা কেহ যেন ঘুণাক্ষরেও জানিতে না পারে।" যাহাতে সাধারণ জনগণ মধ্যে তাহা প্রচার না হয়—বিমলানন্দ তাই সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন। সকলে ভক্তিভরে চামুণ্ডার বরপুত্র বিমলানন্দের পদপ্রান্তে অবনত হইলে, সেদিনকার মত আনন্দ-কোলাহল প্রশমিত হইয়া কানন ভূমি নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

আনন্দ-কাননে আনন্দপ্রবাহ।

হায়! সে দিন গিয়াছে, যেদিন পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ধর্ম্ম ভিন্ন কোন কার্য্যই ছিল না। মানুষ যাহা করিত, মানুষ যাহা ভাবিত—তাহার মূলে একমাত্র ধর্ম্মেরই মহিমা প্রকটিত থাকিত। ধর্ম্মছাড়া যে কোন কার্য্য হইতে পারে, ধর্ম্ম ছাড়া যে কিছু করণীয় আছে, তাহা ভারতের লোকের বোধগম্য ছিল না। একদিন এই কানন-কুন্তলা শস্য শ্যামলা আর্য্যনিসেবিত ভারতেই, বনচারী ঋষি তপস্বীদের কোমল মধুর-কণ্ঠের শ্যাম-গানে জীবগণের সুষুপ্তি-ঘোর কাটিত, নিদ্রোত্থিত হইয়া কেমন পবিত্রমনে সকলে দিবসের কর্ম্মে নিয়োজিত হইত, ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে তৎপর হইত। হায় সে দিন গিয়াছে। যাহা লইয়া ভারতের ভারতত্ব, যাহা লইয়া ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব, ভারতবাসী যাহা লইয়া মহত্ব-মণ্ডিত, আজ তাহাই নাই—যাহারই বিহনে ভারত আজ শ্মশানের বিকট-দৃশ্যে পরিণত! অনুমান চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, যে সকল পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া মনপ্রাণ আনন্দে বিভোর হইত; যে ব্রহ্মচারী, গৃহী, বনচারী, সন্ন্যাসীর পবিত্র পাদস্পর্শে ভারতের ধূলী স্বর্গের স্বর্ণরেণু সদৃশ পবিত্র বলিয়া সকলে শিরোধার্য্য করিত; আজ কতকগুলি পিশাচের তাণ্ডব নৃত্যে কতকগুলি স্বধর্ম্মত্যাগী পাপাচারী মূঢ় জনগণের অনাচার

অত্যাচারে সেই দেশ—সেই পরম পবিত্র সাধু-নিসেবিত দেশের দুর্দ্দশা দেখিলে বাস্তবিকই প্রাণ গভীর দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হয়, হতাশ বিষাদে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিতে হয়—হায়! আমরা কি ছিলাম কি হইয়াছি! ছিলাম স্বর্গের দেবতা, হইয়াছি নরকের কীট! ছিলাম চির আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি, হইয়াছি চিরদারিদ্র্যের—চির-অসুখে শীর্ণ, দীন-দুঃখ পরিপূর্ণ অন্নশূন্য ক্লিষ্ট-মুর্ত্তি। যাহা আমরা নহি—যাহা আমাদের হইতে পারে না—হইবার আশা ছিল না, আজ ধর্ম্ম-হীন হইয়া আমাদিগকে তাহাই হইতে হইয়াছে। ইহা শুধু কাল-মাহাত্ম্য নহে, নিজ কৃতকর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল। পাঠক! প্রভাত হইয়াছে, রজনীর অন্ধতমসা কাটিয়াছে, বালার্ক-কিরণ-সঞ্জাত স্বর্ণ-রশ্মি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া প্রকৃতির অনুপম শোভা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে; কোথাও আর আঁধার-মলিনতা নাই, জাগতিক প্রত্যেক বস্তুই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। এই অরু-পম সূর্য্যালোকে ঐ দেখ,—নীলাচলের নিভৃত গুহায়, আনন্দের লীলানিকেতন আনন্দকাননে, এই মধুর প্রভাতে কিরূপ আনন্দের বাজার বসিয়াছে। ইহাঁরাও ভারতবাসী—ইহাঁরাও এই কলিযুই জীব; তবে ইহাঁরা এরূপ সুখময়—এরূপ আনন্দময় কেন, বদনে এরূপ আনন্দের বিমল ভাতি বিভাসিত কেন? কেন ইহাঁদের শ্রীমুখনিঃসৃত প্রভাতকালীন শ্যামগানে কাননভূমি মুখরিত, বাতাস সুখ-সঞ্চালিত, বিহগকুল নৃত্যগীতাপ্লুত। কেবল ধর্ম্মের পবিত্র ভাবে যে এখানকার প্রকৃতি এত শোভাময়—এত আনন্দময়, তৎপক্ষে আর সন্দেহ নাই। মুক্তযোগী মহাত্মাগণের পদরেণু স্পর্শেই আজ নীলাচলের আনন্দকানন অতুল শোভার

আস্পদ হইয়াছে। রণময়ী চামুণ্ডার মন্দির আজ কয়দিন যেন রণরঙ্গে নৃত্য করিতেছে। এ মন্দিরের শ্রীমূর্ত্তি আজ সজীব, বরাভয়-হস্তে ভক্তগণের অভীষ্ট পূরণে দেবী আজ মহা ব্যগ্র। সাধকগণের সাধনায় আজ দেবী জাগ্রত হইয়াছেন; নিদ্রিতা দেবীকে আজ সাধকগণ জাগাইতে পারিয়াছেন; সাধনার বলে আজ তাঁহারা দেবীকে প্রসন্ন করিয়াছেন—তাই দেবীর চৈতন্য হইয়াছে।

পাঠক! হয়ত এই শাক্ত-সাধকদলের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করেন, ইহাঁদের পরিচয় কিছুই নাই। ইহাঁরা কাহারও নিকট পরিচিত হইতে চাহেন না, ইহাঁদের প্রকৃত নাম জানাও অতীব কঠিন। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, যে বিমলানন্দ এই দলের প্রধান সাধক এবং মুক্তপুরুষ, তাঁহারই প্রিয়তম শিষ্য যোগানন্দ যে একজন যোগী এবং বামদেবের গুরুভ্রাতা, পাঠকগণ তাহা বহুপূর্ব্বেই অবগত আছেন। এক্ষণে নলিনাক্ষ আবার সেই দলের প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইলেন। অদ্য মধ্যাহ্নে আহারাদির পর সকলে একত্র বসিয়া আছেন, এমন সময় বামদেব কৃতাঞ্জলিপুটে গুরু বিমলানন্দের নিকট প্রস্তাব করিলেন—"প্রভু! এইবার দিগম্বরীর বিষয় যাহা অভিরুচি হয় ব্যক্ত করুন।"

বিমলানন্দ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"তাহাকে পাত্রস্থ করাই যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু দিগম্বরী সাক্ষাৎ মা ভগবতী বলিলেই হয়, সাধন-মার্গে সেও বড় কম দূর অগ্রসর হয় নাই, পাছে সে আমাদের সঙ্গচ্যুত হইলে তপোভ্রষ্ট হয়, এইজন্য তাহাকে পরিণীত করা একান্ত আবশ্যক, বিশেষ স্ত্রীজাতি যতই

উন্নত হউক না কেন, তাহাকে একেবারে স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে না। শাস্ত্রের কোথাও এরূপ উপদেশ নাই। বাল্যকালে তাহারা পিতার অধীন থাকিবে, যৌবনে ভর্ত্তার এবং বৃদ্ধ-বয়সেও পুত্রের অধীন হইয়া কাল কাটাইবার নিয়ম। এক্ষণে এমন একটী সাধক অন্বেষণ করিতে হইবে, যিনি বংশ-গত কৌল এবং মহাতান্ত্রিক।”

যোগানন্দ নিকটে বসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন—“প্রভো! আমার সন্ধানে এইরূপ একটী উপযুক্ত পাত্র আছে, কিন্তু সে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইবে কি না সে বিষয় সন্দেহ। সে এখন সংসার-ত্যাগী, পূর্ব্বে বড়ই নষ্টচরিত্র ছিল—অতিশয় ধনীর পুত্র—মহা তান্ত্রিকের বংশও বটে, একদিন হঠাৎ তাহার মতি-পরিবর্ত্তন হইয়া সমস্ত বিষয় আশয়ে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। বারাণসী-ধামে যাইলে, বোধ হয় তাহাকে পাওয়া যায়।”

বিমলানন্দ। কাহার পুত্র, তাহা কি তুমি অবগত আছ?

যোগানন্দ। প্রভো! সেও আমার শিষ্যপুত্র, আপনিও তাহার বিষয় সম্যক জানেন সে শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র—প্রবোধ, কাশীতে এখন সে জ্ঞানানন্দ নামে অভিহিত হইয়াছে। সে এখন মাতৃচরণে আত্মনির্ভর করিয়াছে, কালে তাহার দ্বারা যে বংশের মুখোজ্জ্বল হইবে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারা যায়। সামান্য কারণে ঈদৃশ বৈরাগ্য কাহারও হয় না।

বামদেব। হাঁ, হাঁ! প্রবোধকে আমি বিলক্ষণ জানি। সে কি এখন এইরূপ হইয়াছে, খুব সৌভাগ্যের কথা ত!

নলিনাক্ষ। প্রভো! আমি তাহার বিষয় সম্যক অবগত

আছি। তাহার জননীর মৃত্যুর পর, সে অকাতরে তাহার অতুল ধনসম্পত্তি দরিদ্রের সেবায় অর্পণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছে।

বিমলানন্দ। আমি যোগানন্দের শিষ্য শ্রীধরকে জানিতাম — সে বড় দুর্বৃত্ত ছিল, তাহারই পুত্র এরূপ ত্যাগী হইয়াছে। যাহা হউক, তাহাকে আনয়নের চেষ্টা কর। পরীক্ষা করিয়া তাহারই করে বামদেবের অপহৃতা কন্যা দিগম্বরীকে সম্প্রদান করতঃ আমরা কিছুদিনের জন্য এ স্থান ত্যাগ করিব এবং এই আদর্শ-ত্যাগী দম্পতীই নীলাচলে মা চামুণ্ডার সেবাইতরূপে এখানে অবস্থান করিবে। তাহারই কুলদেবী চামুণ্ডার সেবায় সস্ত্রীক ব্রতী থাকিয়া একদিন নিশ্চয়ই জননীকে প্রসন্ন করিতে পারিবে। আকর্ষণী-শক্তির ক্ষমতা অতীব সুন্দর, এই দম্পতীর মধ্যে যদি কেহ কোন বিষয় ন্যূন থাকে, তাহা হইলে উভয়ে একত্র হইলে আকর্ষণী-শক্তি-প্রভাবে নিশ্চয়ই দুইজনে এক হইয়া যাইবে। মা দিগম্বরীর তপঃপ্রভাবশক্তি অত্যদ্ভুত। যোগানন্দ! তুমি আর কাল-বিলম্ব করিও না, তাহাকে আনয়ন কর।

যোগানন্দ শ্রীগুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বারাণসী গমন করিলেন এবং তথায় প্রবোধ ওরফে জ্ঞানানন্দের সন্ধান করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব তাহার সহিত আনন্দ-কাননে উপনীত হইলেন।

প্রবোধ এখন আর সে প্রবোধ নাই। সে সাধন-ভজন কিছু জানে না বটে, কিন্তু তাহার হৃদয় এত নির্ম্মল, এত পবিত্র, এত ভক্তিময় হইয়াছে যে, সে তারা তারা বলিয়া কেবলই প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকে। ধ্যান, ধারণা, ভজন, পূজনের দিক দিয়াও সে যায় না। মা, মা, বলিয়া অনবরতই তাহার

চক্ষে প্রেমধারা প্রবাহিত হইতেছে। জ্ঞানানন্দ যখন আনন্দ-কাননে চামুণ্ডার মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন দেবীমূর্ত্তি যেন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

দিগম্বরী এতক্ষণ জননীর সমীপে ধ্যানস্থা ছিলেন। হঠাৎ মায়ের আনন্দময়ী মূর্ত্তি ধ্যানে দেখিয়া কারণ জানিবার জন্য চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, সেই সময় সকলেই মন্দির-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। প্রবোধ বা জ্ঞানানন্দ মন্দির প্রবিষ্ট হইয়া, তাহার সেই কুলদেবী চামুণ্ডা মূর্ত্তি দর্শন করতঃ ভক্তিগদ্গদ-কণ্ঠে প্রাণের কবাট খুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—"পাষাণি! এই কি উচিত; পিতৃহারা করিয়া এ পবিত্র বংশের প্রতি এরূপ ভাবে বিরূপ হইলে কেন জননি? তারা! এই কি তোমার ধারা মা!" এই বলিয়া গলদশ্রুলোচনে কাঁদিতে কাঁদিতে অজ্ঞান হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। সকলে প্রবোধের এই ভক্তি-প্রাবল্য দেখিয়া তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। তাহার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য সকলেই সমস্বরে মাতৃগুণগান করিতে লাগিলেন। দিগম্বরী ও নলিনাক্ষ তাঁহার ন্যায় ভক্তের গাত্রে হস্তাবমর্ষণ করিয়া ধন্য হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রবোধের চৈতন্য হইলে, তিনি সম্মুখে এই সকল তপঃপ্রভাব সম্পন্ন যোগীগণকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, "প্রভুগণ! আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির প্রতি আপনাদের এতাদৃশ কৃপার কারণ কি? আমি যে মহাপাপী?"

বিমলানন্দ। বৎস! তুমি মহাপাপী নহ, তুমি মহা-পুণ্যাত্মা, যাহার মাতৃনামে এতাদৃশ অশ্রুপাত হয়, তাহার ন্যায়

সাধক আর কে আছে। তাহার ভজন সাধনের আবশ্যক নাই। সে ভক্তিবলেই মুক্তির পথ প্রশস্ত করিতে সমর্থ। সে জন্য তুমি আত্মগ্লানি করিও না। এক্ষণে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা শ্রবণ কর। মা! চামুণ্ডা তোমারই পৈতৃক সম্পত্তি, তোমার পিতার অবস্থা দেখিয়া যোগানন্দ দেবীকে এই নির্জ্জন স্থানে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তুমি যখন পুনরায় কৃতী হইয়াছ, তখন এ ভার তোমারই গ্রহণ করা উচিত, অবশ্য আমরা তোমার সহায় থাকিব। এ কার্য্যে শক্তির আবশ্যক, অতএব যোগানন্দের "দিগম্বরী" কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া এ কার্য্যে সিদ্ধিলাভ কর। দিগম্বরী সামান্যা কন্যা নহেন।

প্রবোধ ভক্তিবিজড়িতস্বরে বলিলেন,—"প্রভো! আমি নিতান্ত অজ্ঞ, গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য, আমি এই বিষয় আর কিছু বলিতে চাহি না। যদি উপযুক্ত হইয়া থাকি, তাহা হইলে যাহা আদেশ করিবেন—অমর্য্যাদা করিব না।"

বিমলানন্দ। বৎস! তোমার উপস্থিত অবস্থা দেখিয়া, তোমাকে সকল প্রকারেই উপযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে, অতএব তুমি আর ভিন্নমত করিও না, দিগম্বরীর পাণিগ্রহণ কর।

প্রবোধচন্দ্র মৌনভাবাবলম্বন করিলেন। পরদিন রজনী-যোগের শুভমুহূর্ত্তে দিগম্বরীর সহিত জ্ঞানানন্দের পরিণয় কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। ত্রিলোক-জননী বিশ্বেশ্বরী এই বিবাহের সাক্ষী, তাঁহার সম্মুখে এই দুইটী পবিত্র প্রাণ একত্রে গ্রথিত হইয়া তদীয় সেবায় নিযুক্ত হইল,—নীলাচলে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল। পাঠকগণ! আনন্দ-কাননে এই আনন্দ

সম্মিলনে আপনারা প্রাণ ভরিয়া আনন্দ উপভোগ করুন এবং চামুণ্ডার চরণে প্রণত হইয়া ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি এই নবীন দম্পতীর চরমোন্নতির প্রার্থনা করুন। এই বিবাহে বাহ্যিক কোন আড়ম্বর নাই, আনন্দময়ীর আনন্দ উপভোগই এ বিবাহের উদ্দেশ্য। দিগম্বরী মূর্ত্তিমতী শক্তি, তাঁহাকে দেখিলে শ্যামা প্রতিমা বলিয়াই ভ্রম হয়। তপঃপ্রভাবে জ্ঞানানন্দ যেন রজতগিরির ন্যায় প্রভাময়, আজ নবীন-নীরদ-নিন্দিত অপূর্ব্ব ভক্তির সংযোগ হইয়া, যেন স্বর্গীয় শোভার আধারভূত হইল। এরূপ মিলন নয়নগোচর করা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। পবিত্র দম্পতী আজ হইতে প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হইয়া সুখে আনন্দ কাননে জননীর চরণতলে আশ্রয়ভাগী হইলেন।

সপ্তাহব্যাপী আনন্দের স্রোতে নীলাচল ভাসমান রহিল। তৎপরে সকলেই স্থানান্তরে যাইবার জন্য উৎসুক হইলেন। নলিনাক্ষ শ্রীগুরুর নিকট বিদায় লইবার কালে বলিলেন,—"প্রভো! আমার প্রতি কি অনুমতি হয়।"

বামদেব। বৎস! তুমি এখন সংসারে যাও, পুত্রটীকে উপনীত করিয়া নিরুপমার সহিত সংসারেই অবস্থান কর। এখন তোমার সংসার ও অরণ্য উভয়ই সমান, তোমার আর পতনের সম্ভাবনা নাই। সংসার অতি পবিত্র স্থান! যে তরবারিতে আত্মহত্যা করা যায়, তাহাতেই আবার আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে। অতএব বৎস! সংসার তোমার পক্ষে আত্মরক্ষার প্রধান স্থান হইবে, বিশেষতঃ নিরুপমার ন্যায় লক্ষ্মী পাওয়া যায় না, যত দিন তুমি গৃহত্যাগী হইয়াছ, সেও সেই দিন হইতে সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমারই

ধ্যানে তন্ময় হইয়া আছে। যাও তুমি তাহার সন্তোষ-সাধন করগে।

নলিনাক্ষ। প্রভো! আমাকে এইরূপে প্রতারিত করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন কেন? প্রকৃত কথা বলিলে কি আমি আপনার কথা অমান্য করিতাম?

বামদেব। বৎস! ইহাতে আমার স্বার্থ পূর্ণ মাত্রায় ছিল। আর ঐরূপ না করিলে তোমার চিত্ত দৃঢ় হইত না। তুমি বিশ্বাস ও সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া নিশ্চয়ই চেষ্টা করিবে, তাহাতে তোমারও পরকালে নিস্তার হইবে, আমিও তোমার মত গুণবান্ ভক্তপ্রধান শিষ্যের অমানুষিক দক্ষিণা লাভ করিয়া ধন্য হইব। তোমার মহিমা চিরতরে অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই জন্য আমি এরূপ করিয়াছিলাম। অশ্বত্থামা নামক হস্তিকে বধ করিয়া যুধিষ্ঠির যেমন গুরু দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু সময়ে "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" বলিয়াছিলেন, আমারও সেইরূপ অপহৃতা দুহিতা পাইবার আশা ছিল, পরন্তু যদি তোমার ন্যায় ভক্তের দ্বারা আমার ভবে যাওয়া-আসা বন্ধ করিয়া লইতে পারি, সে আশাও মনোমধ্যে পোষণ করিয়াছিলাম। আমার কন্যা যে গুরুভ্রাতার দ্বারা স্থানান্তরিত হইয়াছিল, তাহা ত তুমি প্রত্যক্ষ করিলে। সাধকশ্রেষ্ঠ প্রসাদের নিকট যে দিন ঐ ভাবটী হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তুমি সেই দিনই দক্ষিণা দানের কথা বলিয়াছ। আমার তাহাই মনে জাগিতেছিল। আজীবন তার্কিক হইয়া শাস্ত্রের নানাপ্রকার পাণ্ডিত্যাভিমান আমাকে ভগবদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনে বড়ই বিপক্ষতাচরণ করিতেছিল। যদি তোমার

বিশ্বাস বলে আমা হেন মহাপাপীর উদ্ধার সাধন হয়, তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলাম। সেই চেষ্টার ফলে তোমার নিকট হইতে অপার্থিব সামগ্রী—বহু সাধনার ধন—মায়ের চরণ দর্শন করিয়া আমার ইহ-পরকাল ধন্য হইল। বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া এই পরমানন্দ উপভোগ কর। আর আমাকে সংসারে দর্শন পাইবে না। আমাদের কাহারও সংসার নাই। পৃথিবীতে মায়ার কোন আকর্ষণ নাই। তোমার আছে, তুমি সিদ্ধি-লাভের পর সেইস্থানেই অবস্থান করিতে পার, তাহাতে ক্ষতি নাই। বরং সংসারের অনেক উপকার হইবে।

নলিনাক্ষ আর কোন কথা না কহিয়া গুরুর চরণে প্রণিপাত করিয়া গৃহাভিমুখী হইলেন। একে একে সকলেই যাইতে লাগিলেন, আনন্দ-কাননের আনন্দ-মেলা ভাঙ্গিতে লাগিল। কেবল কাত্যায়নীর প্রাণের পুত্র প্রবোধ ও দিগম্বরী মাতৃসেবায় ব্রতী রহিলেন। পাঠক! প্রবোধের এই উন্নতি কি তাঁহার জননীর আশীর্ব্বাদ নহে?

চতুর্থ খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—※—

রুদ্রপুরে।

পরিবর্ত্তনশীল জগতে এই সময়ের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। রুদ্রপুরেও ঘোর পরিবর্ত্তন। নীলরতনের অট্টালিকা ভূমিসাৎ হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং অট্টালিকার উপর স্থানে স্থানে বৃক্ষও জন্মিয়াছে, তথাপি শ্রীহীন হয় নাই। নিরুপমা তাহাকে ঠিক সন্ন্যাস আশ্রমের মত করিয়া রাখিয়াছেন। যেন তাহা শান্তির আলয় বলিয়া বোধ হয়। নলিনাক্ষ আজ এই শান্তি-আগারে প্রবেশ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, নিরুপমাও কোন অংশে তাঁহা অপেক্ষা হীন নহে। তিনিও সতীত্ব বলে মহা তেজস্বিনী। সাধনমার্গে তিনিও যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। পুত্রটী ঠিক যেন ঋষিবালক—ধর্ম্মে মতিমান। নিরুপমা সকল দিক বজায় রাখিয়া আত্মোন্নতি করিয়াছেন। রুদ্রপুরের সে প্রভাব আর নাই। কালের পরিবর্ত্তনে দুইটি প্রতাপান্বিত জমীদারেরই পতন হইয়াছে। ধার্ম্মিক-প্রবর স্বর্গীয় নীলরতনের সংসারে সে দান ধর্ম্মের স্রোত—দরিদ্র অভুক্তগণের পরিতোষের সহিত ভোজনান্তে গগনভেদী আশীর্ব্বাদবাণী আর শ্রবণগোচর হয় না। এই সুবৃহৎ পরিবারের সকলেই কালকবলে কবলিত; অবশিষ্ট আছেন কেবল নিরুপমা ও তদীয় অষ্টম বর্ষীয় বালক পুত্র শ্যামানন্দ। নলিনাক্ষ

এতদিন গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন, এক্ষণে পুনরায় সংসারে আসিয়া পবিত্র মুখোপাধ্যায়-সংসারের পবিত্রতা পরিবর্দ্ধন করিতেছেন। আর আছে নীলরতনের পরমবিশ্বাসী ভৃত্য, নিরুপমার প্রতি-পালক রূপচাঁদ! সে জরাজীর্ণ স্থবীর হইয়া গিয়াছে, তথাপি সে মুখোপাধ্যায়-বংশের দাসত্ব পরিত্যাগ করে নাই। তাহার অসময় হইয়াছে বলিয়া, নিরুপমা তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সময়ে আহার দেন, সেবা করেন—এ জীবনে নিরুপমা সেবা-ব্রতই সার করিয়াছেন। জ্যোতিষপ্রসাদের অবস্থা এখন খুব ভাল। তিনি নবাব সরকারের কার্য্য ছাড়িয়া এখন ইংরাজ সরকারের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। কার্য্য-কুশলতা গুণে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তিও যথেষ্ট হইয়াছে। ইংরাজ এখন দেশে সম্যক্ রূপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে যাঁহারা নানাপ্রকার অত্যাচার-প্রপীড়িত হইয়া দেশে বাস করিতে অনিচ্ছুক হইয়া নানাস্থানী হইয়াছিলেন, ইংরাজের সুশাসনে তাঁহারা আবার স্বদেশে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেশের আর সে অবস্থা নাই। দুর্ভিক্ষ ও নানাপ্রকার ব্যাধি আসিয়া দেশের দুর্গতির একশেষ করিয়াছে। তবে রাজার কোনও প্রকার উৎপীড়ন নাই। স্বেচ্ছাচারী মুসলমান বাদসাহগণের শাসন অপেক্ষা এখন দেশে অনেক পরিমাণে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। ইংরাজরাজ প্রাণপণে প্রজাবর্গের সুখস্বচ্ছন্দের সহায়তা করিতেছেন।

রুদ্রপুরে শ্রীধরের আর সে প্রবল প্রতাপ নাই, তাহার ও তদীয় পুত্রের পাপাচরণে আর কাহাকেও মর্ম্মযাতনা ভোগ

করিতে হয় না। সেই স্থলে এখন পুণ্যের স্রোত প্রবাহিত। প্রত্যহই অসংখ্য অভুক্ত দরিদ্রগণের সেবা চলিতেছে। যে প্রাসাদ একদিন নক্কার-জনক অতি জঘন্য অভিনয়ে লোক লোচনে অশেষবিধ যাতনা প্রদান করিত, ভ্রমেও যাহার প্রতি তাকাইলে পাপের মাত্রা বৃদ্ধি হইত, এখন সেইদিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলে মন-প্রাণ আনন্দে বিভোর হয়, সে পুণ্য-কর্ম্মের পবিত্র অভিনয় দেখিলে হৃদয়ে যে কি স্বর্গীয় ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা বর্ণনাতীত। সাধ্বী সতী কাত্যায়নীর মনোগত ইচ্ছা এখন পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহার পবিত্র বংশে আজ পুণ্যের স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; তাঁহার প্রাণের কুমার প্রবোধচন্দ্রও এখন সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দান-কার্য্যে উৎসর্গ করিয়া তপস্বী হইয়াছেন। কাত্যায়নীর শুভ ইচ্ছা এত দিনে পূর্ণ হইয়াছে। মা! পতিব্রতে! এতদিন নিজ-সংসারের পাপাভিনয় দেখিয়া প্রাণে যার-পর-নাই দুঃখ অনুভব করিয়াছিলে, এক দিনের জন্যও সংসারে মনের সুখে থাকিতে পাও নাই। মা! এক্ষণে তোমার সেই শ্রীহীন সংসার কিরূপ ধর্ম্মের স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে, অর্থের কিরূপ সদ্ব্যয় হইতেছে, তোমার পবিত্র অমোঘ উপদেশে প্রবোধের কলুষিত চরিত্র কেমন ধর্ম্মজ্যোতিঃ পূর্ণ হইয়াছে, সে এই অল্পদিনের মধ্যে সাধনমার্গে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে। দেবি! স্বর্গ হইতে একবার লক্ষ্য করিয়া চিরদিনের আশা পরিতৃপ্ত কর। তোমার পবিত্র উপদেশ, সেই গভীর ধর্ম্ম শিক্ষাই যে প্রবোধের চরিত্র পরিবর্ত্তনের মূল কারণ, সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই। প্রবোধ এখন আর লোকালয়ে থাকে না; সে আর কাহারও

সহিত বৃথা বাক্যালাপ করিয়া সময় নষ্ট করে না। এখন সে নীলাচলের নিভৃত গুহায় চামুণ্ডার পদতলে আত্মসমর্পণ করিয়াছে; সস্ত্রীক দেবীর কৃপালাভে বদ্ধ পরিকর হইয়াছে। যেরূপ একাগ্রতা, যেরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস তাহার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে প্রবোধের পরকালে নিস্তার-বিষয়ে আর কোন প্রকার চিন্তার কারণ নাই। যে পবিত্র প্রণয়-স্রোতে প্রবোধ অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে; সেই মহামহিমময়ী দিগম্বরীর পূত প্রণয়ই তাহাকে স্বর্গীয় প্রণয়ের অধিকারী করিতে সমর্থ হইবে। প্রবোধ এখন আর কোন কায কর্ম্ম করেন না, দিনান্তে আহার করিতেও তিনি ভুলিয়া যান, কেবল অনবরত মায়ের সেবা করেন ও তাঁহার নিকট ক্রন্দন করিয়া আজীবন-অর্জ্জিত পাপের প্রতিকার কল্লে প্রার্থনা করেন। নারী-শিরোমণি দিগম্বরী এক্ষণে স্বামীর প্রতি বড়ই অনুরক্তা। প্রবোধ তাঁহার আজীবনের সমস্ত ঘটনা প্রণয়নীর নিকট প্রকাশ করিয়াছেন! যদি তাহার দ্বারা স্ত্রীর মনে ঘৃণার উদ্রেক করিতে পারেন, তাহা হইলে আর তাঁহাকে বিবাহের সুদৃঢ় বন্ধন বেশীদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। কিন্তু বামদেব-নন্দিনী দিগম্বরী তাহাতে স্বামীকে ঘৃণার চক্ষে না দেখিয়া বরং অধিকতর রূপে সেবায় স্বামীর মনস্তুষ্টি করিতেন। ভগবতীর নিকট স্বামীর আত্মোন্নতি প্রার্থনা করিতেন।

প্রবোধ কখন কখন আত্মনিন্দা করিলে সতী বলিতেন, "প্রভু! আত্মনিন্দা মহাপাপ, সংসার মোহে পড়িয়া মানুষ প্রথমে আত্মহারা হয়, তারপর সে নিজের কর্ত্তব্য নিজে চিনিয়া লইতে পারিলে, আর তাহার উদ্ধারের ভাবনা থাকে না, সামান্য

একটী. ধিক্কারে তাহার চৈতন্যোদয় হইয়া ভগবৎপ্রেমে মুগ্ধ করিয়া ফেলে, তাহা হইতে আর তাহার পতনের সম্ভাবনা থাকে না। আপনি অতীত চিন্তায় মনকে কেন ব্যতি-ব্যস্ত করেন। ভগবতীর পদে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন। তাঁহার কার্য্য তিনি করিবেন। এরূপ কথা বার বার আমার নিকট বলিবেন না। আমি আপনাকে চিনিয়াছি। আমার মনে ঘৃণার উদ্রেক করাইতে পারিবেন না। স্বামী স্ত্রীর গুরু হইতেও শ্রেষ্ঠ। তাঁহার গ্লানি শ্রবণ করিলে বাস্তবিক প্রাণে আঘাত লাগে। আপনি পুনঃ পুনঃ আর ঐসকল পূর্ব্বকাহিনী স্মরণ করিবেন না। ভগবতীকে সকল কার্য্যের মূলাধার জানিয়া চিত্তক্ষোভের নিবৃত্তি করুন।"

দিগম্বরী মনঃকষ্ট পান দেখিয়া সেইদিন হইতে প্রবোধ আর কোন কথা বলিতেন না, তিনি নিজের কাযেই ব্যস্ত থাকিতেন। প্রবোধ আত্মনির্ভর করিতে শিখিয়াছেন, জগতের প্রলোভন আর তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে পারে না, অনেক প্রলোভনে পড়িয়া, অনেক পাপকার্য্য করিয়া, ভগবানে যাহার চিত্ত স্থির হইয়াছে, তাহার চিত্ত কি সহজে স্খলিত হইতে পারে? যে একবার সে সুধাপানে পরিতৃপ্তিলাভ করিতে পারিয়াছে, তাহার ত সকল ক্ষুধাই মিটিয়াছে। দস্যু রত্নাকর যখন বুঝিতে পারিলেন, আমি কি করিতেছি, তখনই তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি সাধক-শ্রেষ্ঠ বাল্মিকী মুনি হইলেন। বিল্বমঙ্গলঠাকুরও এইরূপে মুক্তির পথ দেখিতে পাইয়াছিলেন। চৈতন্য হইলে পাপীই আবার

পুণ্যাত্মা হইতে পারে। প্রবোধ এক্ষণে যে অবস্থায় অবস্থিত, তাহাতে তাহার সম্যক জ্ঞানোদয় হইয়াছে।

এখন যে সে জ্ঞানানন্দ, সদাই আনন্দে বিভোর। এই আনন্দ-কাননে আসিয়া আজ যে তাহার সেই আনন্দের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। দিগম্বরী প্রবোধের সহিত মিলিত হইয়া উভয়ে উভয়ের সাধন ভজনে অনেক সহায় হইতে লাগিল। আনন্দ-কাননে মহামায়ার আনন্দে তাঁহারা ভরপূর হইয়া রহিলেন।

নলিনাক্ষ সিদ্ধি লাভের পর, পুনরায় সংসারে আসিয়াছেন। বন্ধু জ্যোতিষপ্রসাদ প্রবোধের বিষয়সম্পত্তি ঠিক বজায় রাখিয়াছেন। প্রবোধের মাতুল মহাশয় স্বর্গগত হইয়াছেন। তাঁহার একটী মাত্র পুত্র ও স্ত্রী বর্ত্তমান, তাঁহারা পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অনুসারেই সেই সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছেন। নলিনাক্ষের সংসার এখন আশ্রমে পরিণত, এখন দেখিলে ঠিক কোন তপস্বীর আশ্রম বলিয়া মনে হয়। অট্টালিকার উপর বড় বড় বৃক্ষ হইয়াছে, কিন্তু তাহার দ্বারা অট্টালিকা ভূমিসাৎ হয় নাই, রৌদ্র-তাপ হইতে ইহাকে আচ্ছাদিত করিয়া শীতলতাময় করিয়াছে। দারুণ গ্রীষ্মে পশু পক্ষী যখন একান্ত আকুল হইয়া ইহার আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন ক্ষণেকের জন্য তাহারা সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া প্রাণে অপার আনন্দলাভ করে। যখন পক্ষীকুল আকুলচিত্তে মনের আনন্দে পঞ্চমে তান ধরিয়া প্রকৃতির কোলে আপনার সুস্বরলহরী ছড়াইতে থাকে, তখন ভাবুক মাত্রেরই ভাবকূপ উথলিয়া উঠে। রুদ্রপুরের এই শান্তি-নিকেতন—তাই একসময় বহু প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। নলিনাক্ষ এই শান্তি নিকেতনে

পত্নীপুত্র লইয়া আনন্দে মগ্ন থাকিতেন। তাঁহাদের জীবনে এখন আনন্দ উপভোগ ব্যতীত সংসারের অন্য অশান্তি উপভোগ হয় না; কারণ তাঁহারা ভগবতীর প্রিয়পুত্র, ভগবানের পরম বিশ্বাসী এবং ধর্ম্মপথগামী।

এ সংসার-সংগ্রামে ধার্ম্মিক জীবনই জয়লাভ করিতে পারে। অধার্ম্মিক অশান্তির অনল-শিখায় পড়িয়া চির-দগ্ধ হয়, জীবন দুর্ব্বহ বোধ করে। এ ভীষণ-সংসারে ধর্ম্মপথের পথিক হইলে ভগবান তোমার সহায় হইবেন। এ ভীষণ-তিমিরে একদিন যে ধীরে ধীরে পার করিয়া দিবেন, তাহাতে আর সংশয় কি? নলিনাক্ষ গুরু-আশ্রম নদীয়ায়ও সময়ে সময়ে গিয়া পূর্ব্বের ন্যায় তাহারও শ্রীসম্পাদন করিয়া থাকেন।

আর প্রবোধ এখন দেবচরিত্র লাভ করিয়াছেন। তাঁহার গুরু-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রবোধ এখন নলিনাক্ষের নিকট কুটুম্ব। সময়ে সময়ে উভয়েই উভয়ের শুভ সংবাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। দ্বাদশ বৎসর পরে একবার পুণ্যভূমি জন্মস্থান দর্শনে মহাপুণ্য সঞ্চার হয়, ইহা সাধক-বাক্য। নলিনাক্ষ তাই প্রবোধকে একবার সস্ত্রীক স্বদেশে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। প্রবোধ আগামী শীত-ঋতুতে আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। প্রবোধও এখন আনন্দময়ীর কৃপায় আনন্দময়। পূর্ব্বের মেঘ-মলিনতা কাটিয়া এক্ষণে তাঁহার হৃদয়াকাশে পূর্ণজ্ঞান-চন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রবোধ এখন প্রকৃত মনুষ্যত্ব ফিরিয়া পাইয়াছে। পাঠক! আসুন, একবার আমরা নীলাচলে প্রবোধ ওরফে জ্ঞানানন্দের নিকট গমন করি। নীলাচলে প্রভাতের দৃশ্য অতি

মনোরম, তাই।সাধক মাত্রেই তথায় অবস্থান করিতে ভাল বাসিতেন। প্রকৃতি যেন নিজের সমস্ত পবিত্র দ্রব্য-সম্ভার একত্র খুলিয়া ইহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিতেছেন। ঐ দেখুন, পাঠক! অতি প্রত্যূষে প্রবোধ ও প্রবোধ-পত্নী দিগম্বরী পুষ্পচয়নে বাহির হইয়াছেন; মরি মরি! কি মাধুর্য্যময় উভয়ের দেহজ্যোতিঃ, দেখিলে সদাই চরণে প্রণত হইতে ইচ্ছা করে। মায়ের আমার সেই কালো রূপের আলো করা জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখিলে ভগবতীর অংশ-সম্ভূত, ঠিক মাতৃমূর্ত্তি বলিয়াই ভ্রম হইবে। অনেক সময় অনেক সাধক এই দিগম্বরীকেই সাক্ষাৎ দিগম্বরী বলিয়া অনুমান করিতেন।

নানাবিধ পুষ্পচয়নে পবিত্র-দম্পতী পর্ব্বতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিলেন। হিন্দু, দেবদেবীর পূজার সময় যে সকল অনুষ্ঠান, যে সকল আচরণ করেন, তাহা হৃদয়কে পবিত্র করিবার প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপায়। প্রথমতঃ পুষ্পচয়ন, গন্ধপুষ্পের দ্বারা ভগবানের পূজা করিতে করিতে ঐ আঘ্রাণ নাসিকার মধ্য দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলে, হৃৎপদ্ম বিকশিত হয়, মন প্রফুল্লভাব ধারণ করে। তার পর মন্ত্র,—যদি অর্থ উপলব্ধি করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে সেই মহিমময়ীর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মনের একাগ্রতা স্বতঃই উপস্থিত হইয়া থাকে। ভক্ত তাই, ভগবানের স্তোত্র পাঠ করিয়া ভাব-গদ-গদ-ভাবে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করেন। এইজন্য প্রবোধ এইরূপ ভাবে নশি নাক্ষের পন্থা অনুসরণ করিয়া এত শীঘ্র ধন্য হইতে পারিয়াছেন। পুষ্পচয়ন শেষ করিয়া নির্ঝরিণী-নীরে স্নান-কার্য্য সমাপনান্তর উভয়ে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জ্ঞানানন্দ মায়ের

পূজায় নিযুক্ত হইলেন, সম্মুখে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া গললগ্নীকৃতবাসা দিগম্বরী, পূজা হইলে উভয়ে সেই কুসুম লইয়া ভগবতীচরণে ভক্তিভরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। তাহার পর উভয়ে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া গুরুদেব প্রদত্ত প্রাতঃস্তোত্র পাঠ আরম্ভ করিলেনঃ—

ব্রহ্মময়ী সনাতনী সাকার রূপিণী।
নৃত্যকালী নিরাকারা নীরদ বরণী॥
মহেশ্বরী মহামায়া মহেশ-মোহিনী।
যোগেশ্বরী যোগমায়া জগত জননী॥
বিমলা বিরাজেশ্বরী বিপদ-নাশিনী।
কাতরে কর মা ত্রাণ ত্রিলোকতারিণী॥
বরদা বগলা বামা বরপ্রদায়িনী!
অন্নপূর্ণা শুভঙ্করী ত্রিগুণ-ধারিণী॥
চণ্ডিকা চামুণ্ডা শ্যামা দানব-ঘাতিনী।
দশভুজা দাক্ষায়নী নগেন্দ্র-নন্দিনী॥
সুখদা সারদা সতী কৈবল্য দায়িনী।
পার্ব্বতী পরমেশানী পতিতপাবনী॥
করাল-বদনা কালী কৈলাস-বাসিনী।
পশুপতিহৃদে পদ পঙ্কজ-নয়নী॥
ভৈরবী ভবানী ভীমা ভীষণ-ভাষিণী।
অসিধরা দিগম্বরা মৃগাঙ্কভালিনী॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া মহিষমর্দ্দিনী।
পাপতাপহরা তারা কৃতান্ত বারিণী।
বৈষ্ণবী বেদাদি বিদ্যা ব্রহ্মাণ্ড পালিনী।
অগতির গতি দুর্গা গণেশ জননী॥

সুরেশ্বরী সুরধনা সুরেশ বন্দিনী।
দুস্তরে নিস্তার তারা ভব-নিস্তারিণী ॥
দয়াময়ী দক্ষসুতা দুরিত-নাশিনী।
মম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করগো জননী ॥
নাহি জানি ধ্যান জ্ঞান ভজন পূজন।
নিজগুণে কৃপা করি দেহ শ্রীচরণ ॥

স্তোত্রপাঠ সমাপন করিয়া উভয়ে প্রেমাশ্রু-বিগলিত-নেত্রে দেবী-চরণে প্রণাম করতঃ দিনান্তে আহারের ব্যবস্থার জন্য গুহায় প্রবিষ্ট হইলেন। দিগম্বরী স্বহস্তে সাত্ত্বিক আহারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে স্বর্গীয় প্রণয়ের আবির্ভাব হইলে, তাহারা সহজেই দেবত্ব লাভ করিতে পারে।

হিন্দুর পবিত্র আশ্রমে, এ দৃশ্য আজ নূতন নহে। কতকাল পূর্ব্বে সুবর্ণযুগে আর্য্যের ঘরে ঘরে ইহার সুপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। হিন্দু আজ বিস্মৃতি-সলিলে নিমগ্ন বলিয়াইত ইহার নূতনত্ব উপলব্ধি করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আত্ম-কাহিনী।

নীলাচলের সান্ধ্যশোভা অতি মনোহর। যে দেখিয়াছে, সেই মজিয়াছে। পতি পত্নী আহারাদি সমাপন করিয়া মন্দিরের পাদদেশে আসিয়া একটী সুশীতল বৃক্ষতলে বিশ্রামসুখানুভব করিতে লাগিলেন। সতী স্বামীর পদদেশে শোভিত হইলেন। জ্ঞানানন্দ পরিণীত হইয়া অবধি যেন পূর্ব্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন। সাধন-কার্য্যে তাঁহার বিঘ্ন হওয়া দূরে থাক্, পূর্ব্বাপেক্ষা তাহা আরও উত্তমরূপে সুসম্পন্ন হইতেছে। তজ্জন্য তিনি দিগম্বরীকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন। জ্ঞানানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—"দিগম্বরি! তোমার জীবন-কাহিনী অতি অদ্ভুত। সেই ঘটনা-বৈচিত্র্য শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি, তিনি তোমার পালক-পিতা, আর প্রভু বামদেব তোমার পিতা, ইহার কারণ কি আমায় প্রকাশ করিয়া বল?"

দিগ। প্রভু! আমি অতি শৈশবাবস্থায়, পিতৃ-পরিত্যক্ত হইয়া গুরু-গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছি; যাহা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন।—

"অতি শৈশবাবস্থায় আমার জননী ইহলোক ত্যাগ করেন। পিতাই আমার একমাত্র অবলম্বন, কিন্তু তিনিও সংসার-বিরাগী হইলেন। আপনার গুরুদেব আমার পিতার গুরুভ্রাতা, তিনি

আমাদের বাটীতে তখন অধ্যয়ন করিতেন। আমাদের গৃহ নির্জ্জন ছিল। জননী আমাকে লইয়া সংসারকার্য্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে অধ্যয়ন করিতেন। সময়ে সময়ে মুক্তযোগী বিমলানন্দও শাস্ত্র-শিক্ষা প্রদান করিতে তথায় যাইতেন, শিক্ষা-বিষয়ে আমার পিতা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলেন, জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার গুরুদেব সাধনমার্গে উন্নতি লাভ করিলেন। গুরুর দুইটী শিষ্যই উন্নত। বিমলানন্দ মাঝে মাঝে আসিয়া গৃহ পবিত্র করেন। এমন সময় জননীর মৃত্যুতে পিতা হঠাৎ মুহ্যমান হইয়া সমস্ত ত্যাগ করিলেন। নদীয়ায় "বর্ণাশ্রম" প্রতিষ্ঠা করাইলেন। তাহার পর সাধক-শ্রেষ্ঠ শ্রীরামপ্রসাদের অনুগ্রহে সন্ন্যাসভাব হৃদয়ে উদ্দীপিত করিয়া সাধনমার্গে উন্নত হইয়াছেন। নলিনাক্ষ রামপ্রসাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, পূর্ব্ব হইতেই সাধন-মার্গে উন্নত হইয়াছিলেন। সেই সময় তিনি আশ্রম ত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে নলিনাক্ষ সমাবর্ত্তন কালে গুরু-দক্ষিণার প্রস্তাব করিলেন। কাযেই সে সময় কন্যা-অন্বেষণ ভিন্ন আর কি হইতে পারে। তিনি জানিতেন, নলিনাক্ষের ন্যায় ভক্ত অবশ্য সে কার্য্য করিতে সমর্থ হবেন। ইহা জানি-য়াই তিনি তাঁহাকে কন্যারূপিণী ভগবতীর অন্বেষণ করিতে প্রকারান্তরে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, যদি তাহাতে তাঁহার হৃদয় দৃঢ় হয়, তাঁহার উদ্ধার সাধন হয়। নলিনাক্ষকে তিনি প্রকৃত ভালবাসিতেন, তাঁহার প্রাণপ্রিয় শিষ্য নীলরতনের পালক-পুত্র বলিয়া তাঁহার প্রতি পিতার শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছিল। তিনি নিজ স্বার্থের জন্যই নলিনাক্ষকে প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ

করিয়া গুরুদক্ষিণা চাহিয়াছিলেন। নলিনাক্ষও প্রাণের তীব্র ইচ্ছায় সে কার্য্যে ব্রতী, সুতরাং সিদ্ধি হইবে না ত কি? নলিনাক্ষ সিদ্ধিলাভ করিয়া গুরুদক্ষিণা পরিশোধ করিলেন। যে দক্ষিণা দিতে কোন শিষ্যই পারে না, নলিনাক্ষ অম্লানবদনে গুরুদেবকে তাহাই প্রদান করিলেন। এরূপ শিষ্যের দ্বারা গুরুর পরকাল নিস্তার হইবে না ত কি? এইবার পিতাও আমার বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। যোগী বিমলানন্দ কখন আশ্রমে থাকিতেন, কখন লোকালয়ে থাকিতেন। যোগী বিমলানন্দ পিতার নিরুদ্দেশ হইবার পর আমাকে দুই বৎসরের শিশু লইয়া নানাস্থানে বাস করিতেন, যোগানন্দ আমার লালন-পালনের ভার লইয়া গুরু-দেবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন।"

"কখন কখন যোগীবরের আদেশে স্থানান্তরেও যাইতেন। অনেক সময়ে তিনি ভূ-কৈলাস কাশীতেই অবস্থান করিতেন। পিতার বৈরাগ্য হইয়া উদ্ধার সাধন হইবার পর, তিনি নীলাচলে সাধকগণের সঙ্গলাভে আসিয়া গুরুদেবের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইলেন এবং তাঁহার সংসারাশ্রমের প্রধান কার্য্য কন্যা-বিবাহ সমাধা করিয়া গুরুদেবের অনুগমন করিলেন। আমি আজীবন তাঁহারই আশ্রমে প্রভু যোগানন্দ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছি। আমি বয়স্থা হইলে পর তাঁহারা উভয়ে আমাকে নানা প্রকার শাস্ত্রীয় উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহাদের পবিত্র সঙ্গ লাভ করিয়া ক্রমশঃ ধন্য হইতে লাগিলাম। আমার দ্বাদশ বৎসরের পর হইতে গুরুদেব পিতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আমাকে সৎপাত্রে

সম্প্রদান করা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইয়া উঠিল। নতুবা তিনি আর কত কাল আমাকে লইয়া এরূপ ভাবে মায়া-বিজড়িত হইয়া থাকিবেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে সংসারীর সন্ধান করা বড় সহজ-সাধ্য নহে। যোগানন্দ নানাস্থানে অন্বেষণ করিয়াও তাঁহার সন্ধান পাইলেন না। এইরূপে বহুদিবস অতিবাহিত হইল। তাহার পর এক দিবস যোগানন্দ শ্রীরামপ্রসাদের প্রমুখাৎ শুনিলেন যে, রামদেব সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া নদীয়া হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তারপর তিনি নদীয়ায় আসিয়া নলিনাক্ষের সহিত দেখা করিলেন, কিন্তু আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন না।"

জ্ঞানানন্দ। তখন তুমি কোথায় থাকিতে?

দিগম্বরী। তখন আমাদের আশ্রম পুষ্কর-তীর্থের নিকট কোন নিভৃত অরণ্যে ছিল। আমি বিমলানন্দের নিকট থাকিতাম। যোগানন্দ পিতার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেন। কিয়ৎদ্দিন পরে তিনি সন্ধান পাইলেম যে, পিতা আমার নীলাচলের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহা জানিতে পারিয়া তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন এবং বিমলানন্দের নিকট সমস্ত বিবৃত করিলে, আমরা তাঁহার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমাকে নীলাচলের কোন নিভৃত গুহায় লুকায়িত রাখিয়া তাঁহারা উভয়ে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেই সময় নলিনাক্ষও গুরুদেবের ঋণ পরিশোধ করিতে তথায় আগমন করিলেন। বিমলানন্দ সেই অদ্ভুত তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন নলিনাক্ষকে দেখিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং পিতা যে এইরূপ শিষ্যের গুরু হইয়াছেন, তাহা দেখিয়া পিতাকে ধন্য ধন্য

করিতে লাগিলেন। পিতার প্রতি গুরুদেবের সমস্ত রোষানল এইখানে নির্ব্বাপিত হইল। পিতা নলিনাক্ষের নিকট গুরু-দক্ষিণালাভে কৃতকৃতার্থ হইলেন। এই দিবস হইতে আনন্দ-কাননে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রত্যহ নানা স্থান হইতে সাধকগণের সমাগম হইতে লাগিল। মুক্তযোগী বিমলানন্দকে সকলেই প্রণাম করিলেন। বিমলানন্দ ইহাদের সকলেরই গুরু। এইরূপে কিয়দ্দিন সকলে বিমলানন্দ উপভোগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এইবার পিতা যোগানন্দের নিকট আমার কথা উত্থাপন করিলেন এবং বিবাহাদি কার্য্য সমাধার বিষয়ে গুরুদেবের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। যোগানন্দ আমাকে সেই নিভৃত গুহাভ্যন্তর হইতে পিতার সম্মুখে আনয়ন করিলেন। তাহার পর বিবাহের জন্য পাত্র স্থির হইল।

জ্ঞানানন্দ। দিগম্বরি! তুমি কি কোন প্রকার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছ?

দিগম্বরী। প্রভু! স্ত্রীজাতির আবার সাধনা কি? তবে আমি প্রত্যহ শিবপূজা করিয়া গুরুদেবের কৃপায় যে আনন্দলাভ করিতাম, সেরূপ আনন্দ সাধারণ রমণীজাতির ভাগ্যে ঘটে না এবং সেই সাধনার ফলেই আমি আপনার ন্যায় দেব-চরিত্র স্বামী লাভ করিয়াছি।

জ্ঞানানন্দ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। মনে প্রাণে মহামায়াকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। তাপস তাপসী পুনরায় স্নান করিয়া চামুণ্ডার মন্দিরে প্রবেশ করতঃ সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে

লাগিলেন। সে দিন জ্ঞানানন্দ ভাবাবেশে মাতৃচরণে কেবল ভক্তিভরে প্রণাম করিতে লাগিলেন। আজ যেন তাঁহার সেই চির পরিচিত মূর্ত্তির মধ্যে কোন নূতন বস্তু দেখিতে লাগিলেন। তাই তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভক্তিগদ্গদ কণ্ঠে সেই মূর্ত্তির রূপ বর্ণনা করিয়া গাহিলেন।—

হের মা নয়নে তারা হর-মনোমোহিনী।
কাতরে কর মা কৃপা কাল ভয়-বারিণী॥
দেহি মা চরণ-তরি, দুস্তর সাগরে তরি,
শঙ্করী এ সুত তোরি, তার জননী।
পতিত হ'য়ে অকূলে, যোগী ডাকে মা মা ব'লে,
কূল দেহি এ অকূলে কূল-দায়িনী॥
তোমা বিনা নাহি আর, এ সঙ্কটে তারিবার,
তাই মা ক'রেছি সার চরণ দু'খানি॥

এত দিন যে প্রবোধ নানাবিধ পাপাচরণে জীবন কলুষিত করিয়াছিল, আজ তাহার হৃদয় জ্ঞানালোকে পূর্ণরূপে আলোকিত হইয়াছে। মায়ের করুণা-কটাক্ষ না হইলে কি শুধু তপ জপে এত শীঘ্র এরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারা যায়?

আজ স্ত্রী পুরুষে মায়ের সেবায় তন্ময় হইলে, তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইল। সমস্ত রজনী এইভাবে অতিবাহিত হইল। ঊষা সমাগমে তাঁহাদের চৈতন্য হইল! এই পরম রমণীয় পবিত্র সময়ে তাঁহারা সেই পর্ব্বতকন্দর প্রতিধ্বনিত করিয়া আপনাদের আন্তরিক কামনা স্তুতিসহকারে মাতৃচরণে নিবেদন করিতে লাগিলেন। এই নিভৃত গুহার বৃক্ষলতাও সে আত্ম নিবেদন, সে ভক্তিস্নিগ্ধ স্তবস্তুতি শ্রবণ করিয়া যেন আনন্দে

আন্দোলিত হইতে লাগিল। আজ দিগম্বরী মাতৃপ্রেমে একেবারে আত্মহারা হইয়াছেন। জ্ঞানানন্দ, মাতৃচরণে আত্ম-নিবেদন করিয়া ক্ষান্ত হইলে, দিগম্বরী প্রাণের আবেগভরে করযোড়ে বলিলেন—

বরদা অভয়া, কর মোরে দয়া
দেহি পদছায়া মোরে।
জানি না ভজন, জানি না পূজন,
তারিতে হবে আমারে।
(তুমি) মঙ্গল-কারিণী, বিপদ-নাশিনী,
শিখর-বাসিনী শিবে॥
ত্রৈলোক্য তারিণী, ত্রিগুণ-ধারিণী,
ত্রাণ কর ত্বরা ভবে।
উমা ত্রিনয়নী, গজাস্য জননী,
গতি নাহি তোমা বিনে।
জগতজননী, অচিন্ত্য-রূপিণী,
কি চিন্তা করিবে দীনে॥
আমি জ্ঞানহীনা, সাধন-বিহীনা,
নিজগুণে দয়া কর।
প'ড়ে ভব ঘোরে, ডাকি মা তোমারে,
তনয়ে ত্বরায় তার॥
অজ্ঞানান্ধকারে, সংসার [illegible],
পতিত পতিত-নারী।
পশুপতি বাণী, পতিত পাবনী,
দে মা পদতরি তরী॥

কর মা প্রদান, উভয়ে নির্ব্বাণ,
আর কিছু নাহি আশ।
বড় সাধ মনে, সহ পতিধনে,
ছাড়িব ভবের বাস।

মূর্খ প্রবোধ এখন জ্ঞানানন্দ হইয়াছেন। যে সকল সাধনার বিষয়, যে সকল পবিত্র শাস্ত্রীয় উপদেশ এখন তাঁহার মুখবিবর হইতে নিঃসৃত হয়, আজীবন শাস্ত্রপাঠী পণ্ডিতও তাহা বলিতে পারে না। দিগম্বরীর স্তবপাঠ শেষ হইলে দেবীচরণে উভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া স্বভাবের শোভা দেখিতে বাহিরে আগমন করিলেন। পতি পত্নীর মিলন এইরূপ না হইলে সংসারে সুখের আশা করা যায় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উপনয়ন।

নলিনাক্ষ এখন আর জগতের কোন প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ নহেন। জাগতিক সুখ দুঃখ এখন আর তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। তিনি এখন মুক্ত-পুরুষ! সকল মায়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। তিনি এখন গৃহেও থাকেন, বাহিরেও থাকেন—কখন রুদ্রপুরে থাকেন--কখন নদীয়ায় অবস্থান করেন। সাধারণ লোকে এখন তাঁহাকে দেখিলে বা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিলে পাগল ব্যতীত আর কিছুই বলে না। নলিনাক্ষ দেশে আগমন করা অবধি জ্যোতিষপ্রসাদ আর তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে চাহেন না; তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দর্শনে তিনি নলিনাক্ষের বড়ই অনুগত ভক্ত হইয়াছেন; সদা সর্ব্বদাই কাছে কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা করেন, কিন্তু সেবা করিলে কি হইবে; নলিনাক্ষ এক্ষণে যে অবস্থায় অবস্থিত জ্যোতিষপ্রসাদ তাহা হইতে বহু নিম্নে পড়িয়া আছেন--কাযেই তাঁহার ভাব উপলব্ধি করা বা তাঁহার ক্রিয়াকলাপের বিষয় আলোচনা করা, তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তবে তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, নলিনাক্ষ এতদিনে মানুষ নামের যোগ্য হইয়াছেন। জগতে মনুষ্য জন্ম তাঁহারই সার্থক হইয়াছে। তাই তিনি অহরহঃ সঙ্গে থাকেন, যদি তাঁহার কোন প্রকার দয়া হয়। নিরুপমা স্বামীর সেবায়

প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন—তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন—পূর্ব্ব জন্মে কত তপস্যা করিয়াছিলাম, কত বার-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম—তাই এরূপ স্বামী লাভ করিয়াছি। মানুষ মৃত হইলেই তাহার সুখ দুঃখের ভাবনা থাকে না, কিন্তু যিনি জীবিত হইয়াও কোন প্রকার সুখ-দুঃখ, শারীরিক কোন প্রকার ব্যাধির যন্ত্রণা অনুভব করেন না, তিনি কি যে সে মানুষ!

নলিনাক্ষ এখন রুদ্রপুরেই থাকেন। রুদ্রপুর এখন পূর্ব্বের ন্যায় শোভা সম্পন্ন না হইলেও, পূর্ব্বের ন্যায় জমীদারগণের দোর্দ্দণ্ড প্রভাপে ইহা প্রতাপান্বিত না হইলেও, এখন বহু সাধকের পদার্পণে পুণ্যময় তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। বিশেতঃ নলিনাক্ষের ন্যায় মহাত্মা যে স্থানে অবস্থান করেন —তাহার ন্যায় পরম পবিত্র স্থান আর কোথায় আছে! ইহাঁর সংসর্গে যাঁহারা অবস্থান করেন—তাঁহারাও মহা পুণ্যবান —তাঁহাদের ভাগ্য যে সুপ্রসন্ন, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

নলিনাক্ষ প্রচ্ছন্ন যোগী। তাঁহাকে সহজে কেহ চিনিতে পারিবে না, তাঁহার কোন আড়ম্বর নাই। তাঁহাকে দেখিলে পাগল ভিন্ন আর কেহ কোনরূপ ভাব দেখিতে পাইবেন না, কিন্তু যিনি দেখিতে জানেন—যাঁহার বুঝিবার শক্তি জন্মিয়াছে —তিনি বুঝিতে পারিবেন—নলিনাক্ষ ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি অথবা মেঘাবৃত পূর্ণচন্দ্র ব্যতীত আর কিছুই নহেন। এক্ষণে নলিনাক্ষ অহরহঃ সমাধীস্থ হন বলিয়া—ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্ত হয় বলিয়া—নিরুপমা পতিকে আর কোথাও যাইতে দেন না।

এখন সময়ে সময়ে ভগবতীর দর্শন লাভ করিয়া আর তাঁহার তৃপ্তি হয় না; তাঁহার মন-মকরন্দ এখন অনবরত সেই অম্লান কুসুমের মধুপানে মত্ত থাকিতে ইচ্ছা করে—সে সুখ ব্যতীত আর কোন সুখ নাই বলিয়াই তাঁহার ধারণা, তাই নলিনাক্ষ এখন প্রায়ই সমাধিস্থ থাকেন। শয়নে স্বপনে কেবল মায়ের ছেলে মাকে পাইলেই সুখ বোধ করে। এখন তাঁহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, ভোগ-সুখ তাঁহার নিকট হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। জগতের সুখ এখন আর তাঁহার নিকট সুখ বলিয়া অনুভূত হয় না। তিনি যে সুখে সুখী হইয়াছেন, যে সুখের তরঙ্গ এখন তাঁহার হৃদয়কন্দরে প্রবহ-মান হইতেছে, কি ছার তাহার নিকট পার্থিব সুখ-সম্পদ, কি ছার তাহার নিকট স্বর্গ-সুখ। ইহা অপেক্ষা কি আর ত্রিজগতের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায়, না এ সুখভোগ সহজে কাহারও ভাগ্যে ঘটে?

নলিনাক্ষ সমাধিস্থ হইলে হয়ত দুই দিনই কাটিয়া যায়—সতী নিরুপমা ঠিক সমভাবেই অনাহারে পতির পদতলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অবস্থান করেন। ইহাতে তাঁহার কোন প্রকার কষ্ট অনুভব হয় না, তিনিও স্বামীর ন্যায় কষ্ট-সহিষ্ণু ও ত্যাগী হইয়াছেন। সংসারের সুখ দুঃখও আর তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। পুত্র শ্যামানন্দও পিতা মাতার অনু-সরণ করিয়াছেন। জীবন-প্রভাতে—এই অফুরন্ত বাল্যকালেই বালক যেরূপ ধর্ম্মপথগামী, ধর্ম্মের প্রতি তাহার যেরূপ ঐকান্তিক অনুরাগ, না জানি জীবন-মধ্যাহ্নে বা জীবন-সন্ধ্যায় এ বালকের ধর্ম্মভাব কিরূপ ভাবে উদ্দীপিত হইবে। পিতা

মাতার গুণ যে পুত্রে পূর্ণ-মূর্ত্তিতে বিরাজ করিবে—তাহা এই বালকের বাল্য-স্বভাব হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। পিতা মাতা ভাল হইলেই যে পুত্র কন্যা ভাল হইয়া থাকে, এক্ষণে শ্যামানন্দই তাহার নিদর্শন। শ্যামানন্দ পিতা মাতার নিকটও থাকে, আবার জ্যোতিষপ্রসাদের বাটীতেও কখন কখন খেলা করিতে যায়। সুকুমারী ও জ্যোতিষপ্রসাদ তাহাকে নিজ পুত্র অপেক্ষাও ভালবাসেন, সময়ে খাইতে দেন, লেখাপড়ারও সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। জ্যোতিষপ্রসাদ এখন আর অন্য শিক্ষার পক্ষপাতী নহেন। এখন তিনি নিজপুত্র ভবানন্দকে ও শ্যামানন্দকে হিন্দু ধর্ম্মের পবিত্র শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এইজন্য তিনি কাত্যায়নী-মঠের তত্ত্বাবধারক হইয়া অবধি একটী চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তথায় একজন শাস্ত্রপাঠী, ধর্ম্মজ্ঞ অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া পুত্রগণের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। আরও কয়েক জন ব্রাহ্মণকুমারও তথায় অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এই সকল বালকগণের মধ্যে শ্যামানন্দই সকলের প্রধান ও মেধা-শক্তি-সম্পন্ন, ভবানন্দও খুব ভাল ছেলে—কিন্তু শ্যামানন্দের মত নহে। শ্যামানন্দকে যে দেখে সেই তাহাকে কোন ঋষি-বালক বা শাপ-ভ্রষ্ট হইয়া সংসারে আসিয়া জন্মিয়াছে বলিয়া অনুমান করে। শ্যামানন্দ ও ভবানন্দের ধর্ম্মভাব ও শিক্ষা বিষয়ের উন্নতি দেখিয়া জ্যোতিষপ্রসাদ ও সুকুমারী বড়ই আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। শ্যামানন্দ যে উন্নতি করিবে—তাহাতে আর বিচিত্র কি! কিন্তু ভবানন্দ যে তাহার সঙ্গলাভ করিয়া

উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহা দেখিয়া কোন্ পিতা-মাতার হৃদয় না সুখসাগরে ভাসিতে থাকে।

পুত্রগণ উপনয়নের উপযুক্ত হইয়াছে, আর তাহাদিগকে উপনীত করিতে অমনোযোগী হওয়া উচিত নহে। বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহারা ত সংসারের আর কোন বিষয়ের তত্ত্ব গ্রহণ করেন না। সংসারে উদাসী যোগী যোগিনীর ত আর বাহ্যজ্ঞান নাই। এই জন্য জ্যোতিষপ্রসাদ একদিন সন্ধ্যাকালে নলিনাক্ষের স্বর্গতুল্য আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নলিনাক্ষের ও নিরুপমার সেই দিন দুই দিনের পর আহারাদির ইচ্ছা হইয়াছে, তাঁহাদের সমাধি ভঙ্গ হইয়াছে। পুত্র শ্যামানন্দ আশ্রমের মধ্যে খেলা করিয়া বেড়াইতেছিল। পিতামাতাকে সংজ্ঞাযুক্ত দেখিয়া নিকটে আসিল। পিতা পুত্রকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। এ দৃশ্য দেখিলে বোধ হয়, যেন কৈলাসেশ্বর মহাদেব গণপতিকে লইয়া আদর করিতেছেন, আর ভগবতী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা রহিয়াছেন। তাঁহাদের উপস্থিত অবস্থা দেখিলে ইহা ভিন্ন অন্যভাব কাহারও মনে উদয় হইবে না।

এই সময়ে জ্যোতিষপ্রসাদ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। স্বর্গীয় নীলরতনের সেই সুবৃহৎ অট্টালিকা আজকাল স্বর্গের শোভায় সুশোভিত; অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় গন্ধে সেই গৃহ পরিপুরিত—যাহা নাসিকারন্ধ্র মধ্য দিয়া অন্তর প্রবিষ্ট হইলে সকলেরই প্রাণ মাতিয়া উঠে, কি এক অভূত-পূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাবে মনপ্রাণ বিভোর হইয়া যায়। নলিনাক্ষ গৃহ-দেবতা নারায়ণের গৃহদ্বারে পুত্রক্রোড়ে উপবিষ্ট; নিরুপমা আহারাদি প্রস্তুত

করিতে ব্যস্ত। আজ কয়েক দিনের পর পুত্র পিতামাতার নিকট আসিয়াছে! জ্যোতিষপ্রসাদ জানিতে পারিয়াই আজ তাহাকে এখানে পাঠাইয়াছেন, নতুবা শ্যামানন্দ প্রায়ই তাঁহাদের নিকট অবস্থান করিয়া থাকে। জ্যোতিষ ও সুকুমারীই এই তাপস-দম্পতীর প্রকৃত বন্ধু।

জ্যোতিষপ্রসাদ প্রচ্ছন্নযোগী বন্ধুবর নলিনাক্ষকে মনে মনে সভক্তি নমস্কার করিয়া কাছে বসিলেন। নলিনাক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন "জ্যোতিষ! এ কয়দিন যে তুমি একবারও আস নাই; কেন, বাটীর খবর ভাল ত?"

জ্যোতিষ। ভাই! আমি প্রত্যহ আসিয়া তোমার আশ্রমের তত্ত্বাবধারণ করিয়া যাই। আমি কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করি না। তবে চতুষ্পাঠীর ভালরূপ বন্দোবস্ত ও কাত্যায়নী-মঠের অতিথিগণের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য আমি কয়েকদিন বড় ব্যস্ত আছি, তাই সময়ে আসিতে পারি না বটে, কিন্তু একদিনও অনুপস্থিত নাই।

নলিনাক্ষ বলিলেন—"ভাই! তুমি আছ বলিয়াই এখনও রুদ্রপুরের নাম বজায় আছে, এখনও অনেক সৎকীর্ত্তি এই স্থানে সমাহিত হয়। পুত্রগণের লেখাপড়া বেশ হইতেছে ত?"

জ্যোতিষ। হাঁ! অধ্যাপক মহাশয় বেশ উপযুক্ত ব্যক্তি, ধার্ম্মিক এবং নির্লোভ; তাঁহার দ্বারা ছাত্রগণের উন্নতি হওয়া সম্ভব। ভাল কথা ভাই! শ্যামানন্দ ও ভবানন্দের উপনয়নের সময় হইয়াছে; এই জন্য আজ তোমার নিকট আসিয়াছি।

নলিনাক্ষ। একটী শুভদিন দেখ।

জ্যোতিষ। দেখিয়াছি, আগামী মাঘমাসে উপনয়নের প্রশস্ত দিন আছে। তাহাও ত আগত-প্রায়।

"সেই দিনই হইবে।" এই বলিয়া নলিনাক্ষ একখানি পত্র লিখিয়া বলিলেন—"তুমি এই পত্রখানি কাশীধামে শ্রীধরের যে বাটী আছে, তথায় পাঠাইয়া দাও। প্রবোধ সস্ত্রীক তথায় এই সময় অবস্থান করিতেছেন। তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এই কার্য্যোপলক্ষে তিনি একবার জন্মভূমি দেখিয়া যাইবেন। তিনি সংবাদ পাইলে গুরুদেব প্রভৃতি সকলেই সংবাদ পাইয়া এস্থানে আসিয়া রুদ্রপুর পবিত্র করিবেন।" এই বলিয়া পত্রখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন এবং আর দিন নাই দেখিয়া তাঁহাকে সমস্ত আয়োজন করিতে বলিলেন; জ্যোতিষপ্রসাদ বহু সাধুসমাগমের কথা শুনিয়া সেদিন প্রফুল্ল চিত্তে বাটী গমন করিলেন এবং পত্রখানি যথাসময়ে লোক দ্বারা বারাণসীধামে পাঠাইয়া দিলেন।

যথাসময়ে পত্র কাশীধামে প্রবোধের হস্তগত হইল। প্রবোধ নলিনাক্ষের প্রতি বড়ই শ্রদ্ধাবান, তাঁহার পত্র পাইয়া তিনি বামদেব, যোগানন্দ, বিমলানন্দ প্রভৃতি গুরুগণের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, তাঁহারা প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ যথাসময়ে রুদ্রপুরে পদার্পণ করিলেন। প্রবোধও সস্ত্রীক নিজ জন্মভূমি দর্শনার্থ আগমন করিলেন। আজ রুদ্রপুরে বহু সাধকের সমাগম, মর্ত্তে আজ স্বর্গের অভিনয়, যে দেখিল, তাহারই নয়ন সার্থক হইল। প্রবোধকে এখন আর কেহ চিনিতে পারিল না। প্রবোধ আজ কাল সন্ন্যাসীর বেশে সজ্জিত; দণ্ড-কমণ্ডলুধারী, গৈরিক-বসন পরিহিত; সঙ্গে শক্তি-স্বরূপিণী

দিগম্বরী। প্রবোধ আজ বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। ঘোর তান্ত্রিক শ্রীধরের পবিত্রবংশ আজ প্রবোধের দ্বারা পুনঃ সম্মানিত হইল। মাতঃ কাত্যায়নি! আজ তোমারই সতীত্বগুণে তোমারই অসীম ধর্ম্মপ্রভাবে তোমার প্রাণের প্রবোধ আজ কিরূপ ধর্ম্মপথগামী হইয়াছে; পবিত্রকুলের কন্যাকে নিজশক্তি-রূপে গ্রহণ করিয়া কিরূপ শক্তিমান, কিরূপ জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে। মা! একবার স্বর্গ হইতে দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক কর। প্রবোধ এখন নিজ গুণে জ্ঞানানন্দ হইয়াছেন। জ্যোতিষ-প্রসাদ পুরাতন গ্রামবাসীগণকে তাহার পরিচয় দিতে লাগিলেন। সকলেই সেই পবিত্র সাধক-বংশের পূর্ব্বস্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া "যে বংশের সন্তান সেই বংশের উপযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া" ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে আসিয়া তাঁহাদের চরণে প্রণত হইলেন। প্রবোধ সকলকেই যোড়করে অভিবাদন করিয়া নম্রতা স্বীকার করিলেন। সকলেই দিগম্বরীর জ্যোতি-পূর্ণ যৌবন কান্তি দেখিয়া ভগবতীর অংশ-সম্ভূতা বলিয়া জ্ঞান করিল। প্রবোধ জননীর স্মৃতি-সৌধ কাত্যায়নী-মঠের সুব্যবস্থা দেখিয়া জ্যোতিষপ্রসাদকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। চতুষ্পাঠীতে গিয়া কিয়ৎক্ষণ ছাত্রগণের অধ্যয়ন প্রবৃত্তি দেখিয়া হিন্দুর কত কথাই হৃদয়ে গাঁথিয়া লইলেন। তার পর মাতুলানীর নিকট গমন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। মাতুল-পুত্রগণকে স্নেহ সম্ভাষণ জানাইলেন। এইরূপে রুদ্রপুরে স্বর্গীয় আনন্দের তুফান বহিতে লাগিল।

শুভদিনে শুভক্ষণে শ্যামানন্দ ও ভবানন্দের উপনয়ন কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। স্বয়ং বিমলানন্দ, শিষ্যগণ সহ উপনয়ন

কার্য্যের সমাপন করিলেন। এ উপনয়নে যে শুভ ফল ফলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বহু দীনদরিদ্র এ উৎসবে আগমন করিয়া তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া লইল। এ কয় দিন রুদ্রপুরে কাহারও কোনরূপ অভাব রহিল না। মা ভগবতী স্বয়ং অন্নপূর্ণা রূপে নিরুপমার অন্তরে অধিষ্ঠিতা হইয়া সকলকে পান ভোজনে পরিতৃপ্ত করিলেন। সুকুমারী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এ উৎসবের সঙ্কুলান করিতে লাগিলেন। আর দিগম্বরী পাকশালায় বসিয়া পাকাদি করিতে লাগিলেন। দেশ দেশান্তর হইতে অভুক্ত দরিদ্রগণ আসিয়া পক্ষব্যাপী এই মহাসমারোহে উদর পূর্ণ করিল এবং যে বিদায় প্রাপ্ত হইল, তাহাতেও কিছুদিন চলিবে—এইরূপ আনন্দে দীনদরিদ্রের হৃদয় আনন্দময় হইয়া উঠিল।

ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার লোকের সমষ্টিতেই সমাজ গঠিত হইয়া থাকে। কতকগুলি মন্দ লোক ঈর্ষা-পরতন্ত্র হইয়া সে উৎসবে যোগদান করে নাই। তাহারা প্রচার করিল—"নলিনাক্ষ এতদিন কোথায় ছিল, কিরূপ অনাচার করিয়াছে, জ্যোতিষ-প্রসাদ তাহার সহিত একত্রে আহার করে, প্রবোধ কাহার কন্যা বিবাহ করিয়াছে—তাহার স্থিরতা নাই; অতএব এ ক্ষেত্রে আমরা তাহার বাটীতে আহার করিতে পারি না," বলিয়া কতকগুলি পরশ্রীকাতর, ধর্ম্মদ্রোহী ব্রাহ্মণকুলকলঙ্ক, এই আনন্দভোজের ভোজন ব্যাপারে যোগদান করে নাই, কিন্তু তাহারা তামাসা দেখিবার জন্য প্রত্যহই ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইত। অদ্য উৎসবের শেষ দিন। আজ লোক সমাগম এরূপ হইয়াছে যে, সমস্ত দিবস রন্ধন-কার্য্যের ও পরিবেশন-কার্য্যের

বিশ্রাম নাই! জ্যোতিষপ্রসাদ ও প্রবোধ অধ্যাপক-মণ্ডলীকে এবং দীন দুঃখীগণকে আহারান্তে পাথেয় ও বিদায় প্রদান করিয়া সে রাত্রের মত থাকিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি দুইটার সময় সমস্ত শেষ হইল; সুকুমারী ও দিগম্বরী গাত্রাদি ধৌত করিয়া নারায়ণের পূজা-গৃহে প্রবেশ করিয়া নিত্য-কর্ম্ম সমাধা করিতে লাগিলেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে। নিরুপমা পরিচারক-বর্গকে এবং স্বামী, গুরু, গুরুর—গুরু প্রভু যোগানন্দ, প্রবোধ ও জ্যোতিষ প্রভৃতিকে একটী স্থানে বসাইয়া আহার করাইতে লাগিলেন।

বিমলানন্দ বলিলেন—"মা! বহুদিবস হইল লোকালয়ে অন্ন গ্রহণ করি নাই, আজ তোমার হস্তে আত্মার তৃপ্তিসাধন করিব।" এই বলিয়া সকলে একত্র আহারে বসিলেন। জ্যোতিষপ্রসাদ আজ নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। সকলেই আহারে বসিলেন, বিপক্ষ সকলে এখনও বিদায় গ্রহণ করে নাই। তাহারা গবাক্ষের মধ্য দিয়া সেই সাধু-ভোজন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। নিরুপমা সকলকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আজ দুই দিন অনাহার, তথাপি নিরুপমা যেন একাই এক সহস্র। নিরুপমা পরিবেশন করিতেছেন। তাঁহার পরিবেশনে আজ কেহ অভুক্ত নাই। নৈশপবন, যে এতক্ষণ কোথায় ছিল তাহার স্থিরতা নাই। শীতের আভাস সত্ত্বেও এখানকার লোক সকল সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া গলদ্ঘর্ম্ম হইতেছিল। এইবার নৈশবাতাসে যেন একটু একটু শীতল হইতে লাগিল। বাতাস

এটা ওটা সেটা নাড়িল, ভোজনের কদলীপত্র উড়াইবার চেষ্টা করিল। তাহাতে বিফল মনোরথ হইয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল, সকল দ্রব্যের আস্বাদ গ্রহণ করিল, তাহাতেও তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া, নিরুপমার পরিশ্রান্ত দেহে একটু নিজ প্রভাব প্রকাশ করিল। নিরুপমা গৃহ হইতে গৃহান্তরে পরিবেশন করিতেছেন, এ সময় বায়ুর প্রভাবে তাঁহার মস্তকের অর্দ্ধাবগুণ্ঠন-বস্ত্র শ্লথ হইয়া পড়িল। তিনি লজ্জায় যেমন সেই বস্ত্র অপরিষ্কৃত হস্তে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে যাইবেন! অমনি নলিনাক্ষ বলিলেন—"কর কি ?"

বামদেব বলিলেন—"মা! তোমার কি দুইটী বই হস্ত নাই ?"

বিমলানন্দ বলিলেন—"মা! তাহারই দ্বারা অবগুণ্ঠন প্রদান কর; ওরূপ শশব্যস্ত হইবার আবশ্যক কি ?"

যোগানন্দ বলিলেন—"মা! তাই দাও।"

এই সময় দর্শকমণ্ডলী সকলে দেখিল অপর দুইটী পরিষ্কৃত হস্ত পৃষ্ঠদেশ হইতে বাহির হইয়া নিরুপমার মস্তকে বস্ত্র প্রদান করিয়া দিল। এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে সকলেই যুগপৎ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া গেল। যোগবলের অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া তখন কাহারও মুখে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে একটা গগনভেদী কোলাহল উত্থিত হইল—"প্রসাদ দাও!" বিপক্ষ পক্ষীয় সকলে গললগ্নী-কৃতবাসে আশ্রমের ভিতর প্রবেশ করিয়া করযোড়ে বলিল—"প্রভুগণ! আমরা সহস্র অপরাধে অপরাধী। আমরা নলিনাক্ষ প্রভৃতি আপনাদের চিনিতে পারি নাই। মূঢ় আমরা, না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি; ক্ষমাশীল আপনারা পাপী ভৃত্যগণের প্রতি

দয়া করিয়া প্রসাদ-বিতরণে কৃতার্থ করুন।” নলিনাক্ষ ও জ্যোতিষপ্রসাদের এ বিষয় কিছুমাত্র মনে নাই, তাহার জন্য তাঁহারা হৃদয়ে কোন প্রকার রোষের ভাবও ধারণ করেন নাই।

এক্ষণে জন-সঙ্ঘের কাতর প্রার্থনায় দ্রবীভূত হইয়া সাক্ষাৎ দয়ার প্রতিমূর্ত্তি বিমলানন্দ বলিলেন—“মা! অন্নদে! এদের অন্ন দে, ইহারা চির পরিতৃপ্ত হউক।” দেবী নিরুপমা তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন।

যাহারা নলিনাক্ষ ও তাহার বন্ধু জ্যোতিষপ্রসাদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছিল; তাহারা রুদ্রপুরের লোক নহে। তাহারা ক্ষমা স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিয়াছিল। রুদ্রপুর জনশূন্য হওয়ায় ভিন্ন সমাজেরও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল—নতুবা ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না। সামাজিক ব্যাপার মহা সমারোহে সম্পন্ন হইলেই একটা না একটা গোলমাল প্রথমে হইয়া থাকে, এখানেও সামাজিকতা বর্ত্তমান ছিল—গোলমাল হইবার বিচিত্রতা কি? তখন এরূপ পবিত্র স্থলেও আহারের জন্য লোকে ইতস্ততঃ করিত। আর এখন আমরা হোটেলের খানায় পরিতৃপ্ত হইতেছি, জাতিবিচার খাদ্যাখাদ্য বিচার আদৌ নাই। আহারের কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নাই বলিয়াই, এখন আমরা নানা প্রকার পীড়াগ্রস্ত হইয়া অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছি।

সে দিন দূরদেশাগত অনেক অতিথি রুদ্রপুরে অবস্থান করিয়াছিল বলিয়া, সে দিনকার রজনী জন-কোলাহলেই কাটিয়া গেল। কত অতুর অনাথা এই উৎসবে আসিয়াছিল।

—পরদিন প্রত্যুষে জ্যোতিষপ্রসাদ ও নলিনাক্ষ প্রবোধের সহিত সকলকে পাথেয় দিয়া বিদায় করিতে লাগিলেন। সেই জনতার মধ্যে দেখিলেন দুইজন ব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুক মৃত্যুমুখে পতিত, সকলেই তাহাদের সেবায় বিব্রত হইলেন। কিন্তু সেবায় কিছুই হইল না। তাহাদের সময় হইয়াছে—মৃত্যু তাহা-দের সন্নিকট; মৃত্যুর দারুণ পীড়নে তাহারা অস্থির। এ জীবনে সুখের জন্য তাহারা অনেক চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু সুখ কই, কোথা সুখ; পাপের প্রলোভনে তাহারা প্রকৃত সুখের মুখ দেখিতে পাইল না। আজ তাহারা দুইদিন উপবাসী, তার পর এই মহোৎসবের কথা শুনিয়া তাহারা এখানে আসিয়াছে। আহারের পর পীড়াগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। গাত্রের ভয়ানক দুর্গন্ধে তাহাদের নিকট যাওয়া ভার। তথাপি নলিনাক্ষ প্রভৃতি সকলেই তাহাদের নিকট অগ্রসর হইয়া সেবা করিতে লাগিলেন—মৃত্যু সময়ে তাহাদের এক জন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ভাই প্রবোধ! আমার জন্যই তোমার প্রথম জীবন বৃথা নষ্ট হইয়াছে; আমাকে ক্ষমা কর। জ্যোতিষ-প্রসাদ! তোমারই বন্দুকের আঘাতে আমি ভূতলশায়ী হই। জীবনে কত কুকার্য্যই করিয়াছি—আমায় ক্ষমা। নলিনাক্ষ! আমি তোমার মত নিষ্পাপ সাধু ব্যক্তির চরিত্রেও দোষারোপ করিয়াছিলাম—আমি রমেশ। আর ঐ রাক্ষসীই আমার মা! আমার সর্ব্বনাশের মূল কারণ। আমাদের পাপের প্রতিফল যথেষ্ট হইয়াছে। পুণ্যের জ্যোতিঃ যে চাপিয়া রাখিতে পারা যায় না, তাহা নলিনাক্ষ ও প্রবোধের চরিত্রেই পরীক্ষা হইল। আমি কত চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহারা ঠিক সময়ে সত্য পথে

ফিরিয়া পড়িল, আর আমি ফিরিতে পারিলাম না। হা অদৃষ্ট!" বলিয়া কপালে করাঘাত করিয়া ইহজীবনের লীলা-খেলা শেষ করিল। হতভাগিনী ইতিপূর্ব্বেই নরকগত হইয়াছে। সকলে ইহাদের পরিণাম দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। যাহারা একদিন জীবিত থাকিয়া কত প্রকার অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে,—কারা-যন্ত্রণা, উৎপীড়ন, শেষে আহারাভাবে লোকের উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত উদরস্থ করিয়াছে, এতদিন পরে তাহাদের কষ্টের অবসান হইল। পাঠক! পাপের পরিণাম দেখিয়া সাবধান হউন। সংসার-মোহে আত্মহারা হইয়া কেবল কামিনী-কাঞ্চনের চেষ্টায় এ দুর্লভ জন্ম অপব্যয়িত করিলে, শেষে মানুষকে এইরূপ যন্ত্রণাই ভোগ করিতে হয়! শ্যামার মা ও রমেশ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্থল। দুর্লভ মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া তাহারা কোন পাপ-কার্য্যই করিতে পশ্চাৎ-পদ হয় নাই; যদি তাহাতে কামিনী ও কাঞ্চন লাভ হয়, কিন্তু এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম, এত লাঞ্ছনা—সমস্তই ব্যর্থ হইল। অদৃষ্টে সুখ না থাকিলে, কেবল পাপানুষ্ঠান করিয়া ভাগ্য পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে তাহার পরিণাম এইরূপই ভয়াবহ হইয়া থাকে। সুখ হউক আর দুঃখই হউক, বরং পুণ্য-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ইহকালে না হউক, পরকালে সুখভোগ অবশ্যম্ভাবী।

আগন্তুক দরিদ্রগণকে নানাপ্রকারে সন্তুষ্ট করতঃ বিদায় দিয়া রমেশ ও শ্যামার মার সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া সকলে রুদ্রপুর পরিত্যাগ করিলেন। নলিনাক্ষ সেই মহা-পুরুষগণের সহিত কিছুদিনের জন্য নদীয়ায় গমন করিলেন। কেবল

জ্যোতিষপ্রসাদ এইস্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই মায়াপ্রপঞ্চে মহামায়ার মায়া-মুগ্ধ জীব সহজে মায়ার হস্ত অতিক্রম করিতে পারে না। সংসারের মায়া পরিত্যাগ করা জীবের পক্ষে সহজ-সাধ্য নহে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্যামানন্দের ভক্তিবল।

রুদ্রপুরের শোভা সম্পদ, যাহা এই কয়দিনের জন্য লোকের মনে প্রভূত আনন্দ প্রদান করিতেছিল, এতদিন পরে তাহার অবসান হইল। তবে দেবী নিরুপমার অবস্থানে রুদ্রপুরের স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের আবাস ভবন "শান্তিনিকেতন" নাম ধারণ করিয়া পাপ-তাপ-দগ্ধ মানবের আশ্রয়স্থল রূপে পরিণত হইল। মানুষ যখন সংসার-দাবানলে দগ্ধ হইয়া জীবন দুর্ব্বহ বোধ করিত, তখন এই আশ্রমে আসিয়া নিরুপমার কোকিলকণ্ঠ বিনিন্দিত কণ্ঠে ভগবতীর স্তব পাঠ শুনিয়া সকল পাপতাপের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিত। নিরুপমা প্রত্যহই শিবপূজায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করিতেন, মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া ভগবতীর স্তোত্র পাঠ করিতেন। গৃহ-দেবতা নারায়ণের চরণামৃত পান করিতেন। নলিনাক্ষ বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেশত্যাগী হইলে জ্যোতিষপ্রসাদ প্রত্যহ ইহাঁদের গৃহদেবতার পূজা, আরতী, ভোগ প্রভৃতি সমাধা করিতেন। তার পর নলিনাক্ষ প্রত্যাগত হইলে অনেক দিন তিনি আর একার্য্য করেন নাই। নলিনাক্ষ নিজেই ব্রাহ্মণের এই নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া ভাবাবেশে সমাধিস্থ হইতেন। তিনি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করতঃ দেব দেবীর স্তবপাঠ করিয়া তাঁহাদের কৃপা ভিক্ষা করিতেন।

এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলে যে মানব দীর্ঘ-জীবন লাভ করিতে পারে এই জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসীগণ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বিমলানন্দ ও যোগানন্দের বয়স যে কত হইয়াছে তাহা কেহই স্থির করিতে পারে না। জ্ঞানানন্দ (প্রবোধ) ও নলিনাক্ষ নিরোগ শরীরে দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে মানুষ যে বেশীদিন জীবিত থাকিত, এই যোগ-সাধনা ও ধর্ম্ম-বলই তাহার প্রধান কারণ।

জ্যোতিষপ্রসাদ যদিও গৃহত্যাগী নহেন, তথাপি তাঁহার ও তদীয় পত্নীর ধর্ম্মভাব এত প্রগাঢ় যে অনেক গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীও তাঁহাদের ন্যায়, পবিত্রচিত্ত ও সাধু প্রকৃতি হইতে পারে না। ধর্ম্মের বাসস্থান বনে নহে; সেই পরম পবিত্র বস্তু মনেই সতত বিহার করে; মন অপবিত্র হইলে কেবল বনে বনে ঘুরিলে কি হইবে। বনগমন না করিয়া বরং এই আশ্রম-শ্রেষ্ঠ সংসারে অবস্থান করিলে, এই কলুষিত চিত্ত নির্ম্মল করতঃ ভগবানে তদ্গতচিত্ত হইতে পারিলে সহজে কার্য্যসিদ্ধি হয়। সংসারে থাকিয়া সংসারীর প্রথা সকল প্রতি-পালন করিয়া নিজের গন্তব্য-পথে ধাবিত হইতে পারিলেই যথার্থ সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে পারা যায়। এই মমতা, এত বাধা বিঘ্ন, এত মহা প্রলোভন অগ্রাহ্য করিয়াও যিনি মোক্ষপথের পথিক হইতে পারেন—তিনি যথার্থ বীর-সাধক, তাঁহারই সাধনা প্রশংসার্হ।

শ্যামানন্দ উপনয়নের পর হইতে ধর্ম্ম কর্ম্মে বড়ই মনো-নিবেশ করিয়াছে। নবম বর্ষীয় বালক, এখন তাদৃশ জ্ঞান-বান হয় নাই। তথাপি তাহার ক্রিয়াকলাপ দেখিলে সকল-

কেই মোহিত হইতে হয়। পাঠের সময় মনোযোগসহ পাঠাভ্যাস করা তাহার নিত্য কার্য্য; এই পাঠাভ্যাস করিতে তাহার তাদৃশ কষ্ট হয় না—অল্প সময়ের মধ্যে তাহার সমস্ত আয়ত্ত হইয়া যায়। ছাত্র-জীবনে অধ্যয়নই তপ, এ সময় তাহাদের অন্য তপস্যা নাই, তাই শ্যামানন্দ অগ্রে দৈনিক পাঠ কণ্ঠস্থ করিয়া, তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া মায়ের নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতেন। ধর্ম্ম কথা কহিতে কহিতে মাও কাঁদিতেন, পুত্রও কাঁদিয়া আকুল হইত। নিরুপমা পুত্রের ভাব দেখিয়া বাস্তবিক প্রাণে প্রভূত আনন্দলাভ করিতেন।

স্বামী কিয়দ্দিনের জন্য গুরুদেবসহ নদীয়ায় গিয়াছেন। নিরুপমা নিজেই আশ্রমের কার্য্য করিতেছেন। সেদিন ভক্তগণের যোগবলের প্রভাব তাঁহাতেই প্রতিফলিত হইয়াছিল। স্বামী তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া যদি অপর দুই হস্তের কথা—দৃঢ়তা সহকারে না বলিতেন এবং মুক্তযোগী বিমলানন্দ ও যোগানন্দ যদি তাঁহার বাক্যের সমর্থন না করিতেন—তাহা হইলে তিনি চকিতের ন্যায় চারিহস্ত-বিশিষ্টা হইয়া দর্শকমণ্ডলীর বিস্ময়োৎপাদন করিতে পারিতেন না। এই জন্য বলিতে হয়—মানুষ কি না করিতে পারে! যোগবলে মানুষ যাহা করিতে পারে—তাহা দেবগণের অসাধ্য। এ সকল বিষয় আমরা পূর্ব্বে কত প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম। কিন্তু হায়! এমন দিন পড়িয়াছে, প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যগণের অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছে, এখন তাহারা এত অধঃপাতে গিয়াছে যে, এ সকল অমানুষিক কার্য্য সমাধা করা ত পরের কথা, একমুষ্টি অন্নের সংস্থান করিতেও আজ তাহাদিগকে

অন্ধকার দেখিতে হইতেছে। হায় রে কাল-মাহাত্ম্য! জ্যোতিষপ্রসাদ ও সুকুমারী প্রত্যহ আসিয়া সই নিরুপমার প্রিয়-কার্য্য সকল সম্পাদন করেন। তাঁহাদের মধ্যে সেই পূর্ব্ব ভাবই এখনও সমভাবে বর্ত্তমান—তাহার কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য হয় নাই। জ্যোতিষপ্রসাদ প্রবোধের অতুল বিষয় সম্পত্তির একমাত্র তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হইয়া, পরের দাসত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মভাবে শ্রীধরের বিষয় বৈভবের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন। পরোপকারে তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি, দেশের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ। কে কোথায় কষ্টে পড়িয়াছে, কোন্ সংসারের অর্থাভাব হইয়াছে, অথচ কাহারও দ্বারস্থ হইয়া মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেছে না—জ্যোতিষপ্রসাদ গুপ্তভাবে সন্ধান লইয়া সেই সকল অভাব মোচন করিতেন। দীন দরিদ্র হইলে তাহাদিগকে "কাত্যায়নী মঠে" থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। দেশের শিল্প বাণিজ্য যাহাতে ভালরূপে চলিতে পারে, যাহাতে সেই সকল কার্য্যে লোকের জীবিকা অর্জ্জন হয়, জ্যোতিষপ্রসাদ অহরহঃ সেই কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। তাহাতে অর্থ উপার্জ্জনের পন্থাও সুগম হইত। পত্নী সুকুমারী অন্নদানে কাতর নহেন—তিনি অভুক্ত দেখিলেই ডাকিয়া, তাহাকে আহার করাইয়া পরিতোষ করিতেন—ইহাতে তাঁহার যে আনন্দ হইত, রাজ্য বিনিময়েও মানুষের তাহা হওয়া সম্ভব নহে। এমন দিন গিয়াছে—যে দিন সুকুমারী নিজের ক্রোড়ের অন্ন, মুখের গ্রাস একজন অভুক্ত, ক্ষুধায় কাতর, দারস্থ ভিক্ষুককে অম্লানবদনে প্রদান করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন। পূর্ব্বে দেশে

এরূপ লোক ছিল বলিয়াই, এই দেশ আদর্শ মহাদেশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিয়াছিল।

পিতা কল্য গুরুদেব সহ চলিয়া গিয়াছেন। বালক শ্যামানন্দ পুষ্পাদি চয়ন করিল। বিদ্যালয়ে যাইবার বেলা হইতেছে; অদ্য গুরুর আদেশে তাহাকে একটু সকাল সকাল চতুষ্পাঠীতে যাইতে হইবে। শ্যামানন্দ স্নান করিয়া আসিলে. জননী বলিলেন—"বাবা! আজ তিনিও ঘরে নাই, ভবানন্দের পিতাও কোন বিশেষ কাযের জন্য গ্রামান্তরে গিয়াছেন—আসিতে কত বেলা হইবে—বলিতে পারি না। আমি অন্নাদি প্রস্তুত করিয়াছি, তুমি নারায়ণের পূজা কর, তার পর আহারাদি করিয়া বিদ্যালয়ে যাইবে।"

শ্যামানন্দ। মা! আমি ত এখন পূজা-পদ্ধতি ভালরূপ জানি না, কেমন করিয়া পূজা করিব?

মা। বাবা! কেন, তুমি ত সেদিন কর্ত্তার কাছে নারায়ণের ধ্যানের বেশ ব্যাখ্যা করিতেছিলে; তিনি তোমাকে আরও কত নিয়ম প্রণালী শিখাইয়া দিলেন।

শ্যামানন্দ। মা! তাহা এখনও ভালরূপ আয়ত্ত হয় নাই।

মা। বাবা! গৃহ-দেবতার নিকট ভক্তিভাবে তুমি যাহা করিবে—তাহাতেই কার্য্য হইবে - তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। ভগবানের নিকট আমরা আড়ম্বর কি করিব। ভক্তি থাকিলেই ভগবানের পূজা ভাল হয়।

জনক জননীর তুল্য গুরু ত্রিজগতে আর নাই। তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ করা উচিত নহে। পিতামাতার কথা শিরোধার্য্য করাই সন্তানের কর্ত্তব্য। বালক শ্যামানন্দ শুদ্ধচিত্তে

পূজা-গৃহে প্রবেশ করিল। প্রত্যহ নারায়ণ পূজাই ব্রাহ্মণের নিত্য কর্ম্ম—ইহা না করিলে, গায়ত্রী জপ না করিয়া অন্নগ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণকে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়—আর্য্যশাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। কিন্তু আজকাল কয়জন ব্রাহ্মণ এই অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম প্রতিপালন করেন? হরিভক্তি যাঁহার হৃদয়ে নাই—তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও চণ্ডাল ভিন্ন আর কিছুই নহেন—এইজন্য শাস্ত্র বলিতেছেন—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরি ভক্তি-পরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শপচাধমঃ॥"

শ্যামানন্দ ভক্তি-প্রাবল্যে নিজের বুদ্ধি অনুসারে নারায়ণের পূজা করিলেন। নিরুপমা ভোগের অন্ন আনিয়া ঠাকুর ঘরে রাখিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। পূজা শেষ হইলে পুত্রকে আহার করাইয়া নিজে জপে বসিবেন। সামাজিক নিয়মানুসারে স্ত্রীলোককে নারায়ণ পূজা করিতে নাই। এইজন্য নিরুপমা শিবপূজা করিতেন, নারায়ণের ধ্যান ধারণা মনে মনে করিতেন। শ্যামানন্দ পূজা শেষ করিয়া মাতৃপ্রদত্ত অন্ন ভগবানে অর্পণ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। ঠাকুরের ভোজন হইলে, সে প্রসাদ পাইয়া বিদ্যালয়ে গমন করিবে। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিল—কিন্তু কই! ঠাকুরত আহার করিতেছেন না; তবে কি তাঁহার রাগ হইয়াছে! পিতার মত পূজা হয় নাই বলিয়া কি নারায়ণ রাগ করিয়া অন্নগ্রহণ করিতেছেন না! বালকের ধারণা নারায়ণকে অন্ন নিবেদন করিয়া দিলে, তিনি মানুষের মত আহার করেন। সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বালক করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—

"ঠাকুর! বাবা বাটীতে নাই, আমি তাঁর মত পূজা করিতে পারি নাই বলিয়া কি তুমি রাগ করিয়া, আহার করিতেছ না? ঠাকুর! ক্ষমা কর, আমার প্রতি রাগ করিও না।" তথাপি ঠাকুর খাইলেন না। এদিকে বিদ্যালয়ের বেলা হইতে লাগিল। ঠিক সময়ে যাইতে না পারিলে গুরুদেবের নিকট তিরস্কৃত হইতে হইবে। বালক বড়ই বিব্রতে পড়িল! সে ঠাকুরকে প্রসন্ন করিবার জন্য ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল এবং ভক্তিভরে নয়ননীরে ভাসিয়া বলিতে লাগিল—"ঠাকুর! তুমি রাগ করিলে আমরা আর কাহার কাছে দাঁড়াইব? তুমিইত গৃহ-দেবতা—আমাদের রক্ষা-কর্ত্তা; রক্ষা কর, ক্ষমা কর, বেলা অনেক হয়েছে আহার কর। ভক্তের সেই ভক্তি-বিমিশ্রিত আহ্বানে ভক্তাধীন ভগবান কি আর থাকিতে পারেন! তখন তিনি গোপাল মূর্ত্তিতে সিংহাসন হইতে হস্তপ্রসারণ করিয়া আহার করিতে লাগিলেন। পাঠক! ভক্ত, ভক্তিবলে অসাধ্য-সাধন করিতে পারে না কি? ত্রিলোকেশ্বর ভগবান আজ অবোধ বালক শ্যামানন্দের কাতর আহ্বানে মুগ্ধ হইয়া তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন। তাহার বিশ্বাস, যখন নারায়ণকে অন্নপ্রদানের ব্যবস্থা আছে, তখন তিনি নিশ্চয়ই মানবের ন্যায় আহার করিয়া থাকেন। নতুবা মানুষ এইরূপ আত্মবৎ সেবা করিবে কেন? এই সরল বিশ্বাস ও ভক্তিবলে শ্যামানন্দ ভগবানকে আহার করাইলেন। পরে তাঁহার আচমনাদি ক্রিয়া সমাধা করাইয়া যথাস্থানে শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং বাহিরে আসিয়া জননীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিরুপমা আসিয়া বলিলেন—"বাবা! পূজা হইয়া গিয়াছে কি?"

* ভক্তের সেই ভক্তি মিশ্রিত আহ্বানে ভক্তাধীন ভগবান কি আর থাকিতে পারেন। তখন তিনি গোপাল মূর্ত্তিতে আহার করিতে লাগিলেন।

[৫৮৪ পৃঃ]